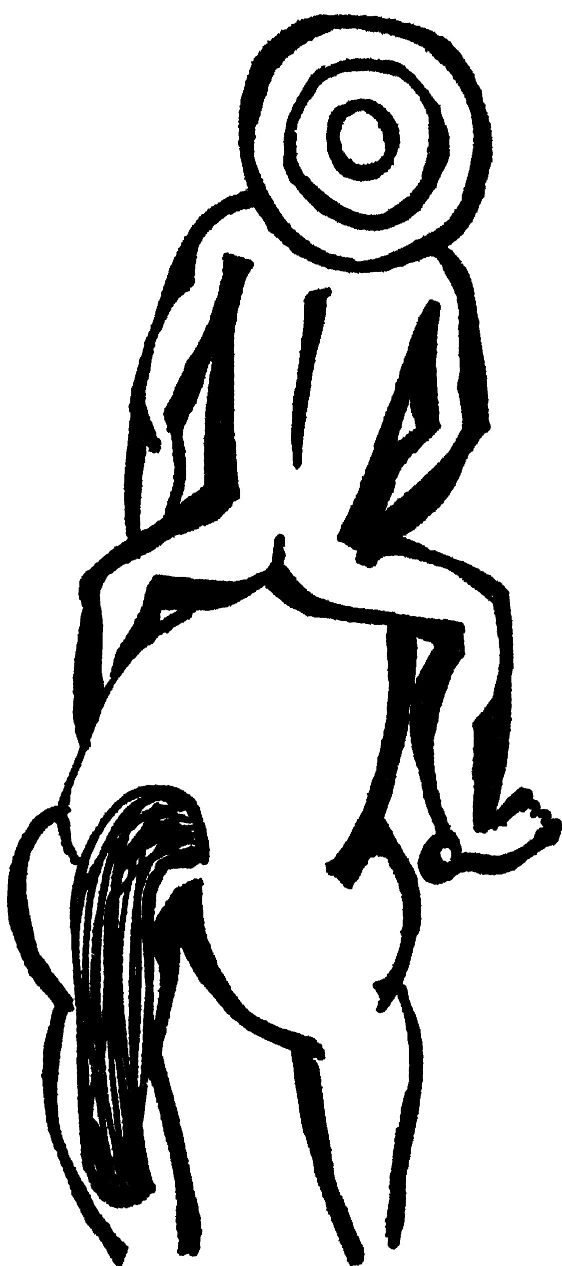
প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৬৭
বইমেলা ১৯৬০

প্রকাশক :
সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী
৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ
কলকাতা ৭০০০১৭

মুদ্রক :
রূপলেখা
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট.
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচি



পেদ্রো পারামো

আমি যে কোমালা এসেছি, কারণ আমাকে বলা হয়েছিলো যে আমার বাবা, জনৈক পেদ্রো পারামো, এখানে থাকেন। আমার মা আমাকে এ-কথা বলেছিলেন, আর আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম যে মা মারা যাবামাত্র আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবো। আমি যে কথা রাখবো মা যেন সেটা বুঝতে পারেন এই জন্যে আমি তাঁর হাতে একটু চাপ দিয়েছিলাম ; তিনি তো মরতে বসেছেন, তাই তখন আমি তাঁকে যা-খুশি কথা দিতে পারতাম। 'ঠিক যাস কিন্তু, গিয়ে দেখা করিস ওর সঙ্গে,' মা আমায় বলেছিলেন, 'আমি জানি তোকে দেখলে ও খুশি হবে।' কাজেই মাকে বারে-বারে 'যাবো যাবো যাবো' বলা ছাড়া আমার কিছুই করার ছিলো না, আর আমি তা বলতেই থাকি যতক্ষণ-না তাঁর মরা আঙুলগুলো থেকে হ্যাঁচকা ছিনিয়ে নিয়ে আসি আমার হাত।

তার আগে তিনি আমায় বলেছিলেন, 'যা আমাদের নয়, তা ছাড়া ওর কাছে আর-কিছুই চাইবি না। আমাকে ওর যা দেবার কথা ছিলো অথচ দেয়নি শুধু তা-ই চাইবি কিন্তু। যেভাবে ও আমাদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে তার জন্যে উপযুক্ত মাশুল দিতে বাধ্য করবি।'

'ঠিক আছে, মা।'

কথা রাখার উদ্দেশ্য অবশ্য আমার ছিলো না। কিন্তু তার পরে মা কী-কী বলেছেন সব আমার মনে প'ড়ে যেতে লাগলো, শেষটায় এ নিয়ে ভাবনা আর থামাতে পারি না, এমনকী এ নিয়ে স্বপ্নও দেখতে শুরু ক'রে দিয়েছিলাম, পেদ্রো পারামোকে ঘিরে আস্ত একটা জগৎ বানিয়ে তুলেছিলাম আমি। সেই জন্যেই আমি কোমালা এসেছি।

কুকুরখ্যাপানো এক দিন সেটা, যখন তপ্ত অগস্ট হাওয়া বিষিয়ে যায় সাপোনারিয়ার পচা ঝিম গন্ধে, আর রাস্তা শুধু ওপরে ওঠে আর নিচে নামে, ওপরে ওঠে আর নিচে নামে। ওরা বলে রাস্তা কখন ওপরে ওঠে কখন নিচে নামে সেটা নির্ভর করে তুমি আসছো না যাচ্ছো তার ওপর। যদি তুমি চ'লে যেতে চাও তবে এটা চড়াই, ফিরে যখন আসো তখন সেটা উৎরাই।

'নিচের ঐ গ্রামটার নাম কী?'

'কোমালা, সেনিওর।'

'ঠিক জানো কোমালা ?'

'হ্যাঁ, সেনিওর।'

'এমন মরা দেখাচ্ছে কেন গাঁটাকে ?'

'ওদের ভারি দুঃসময় গেছে, সেনিওর।'

মায়ের স্মৃতিতে যেমন ছিলো গ্রামটাকে হুবহু তেমনি দেখতে পাবো ব'লেই আমি আশা করেছিলাম। সবসময় কোমালার জন্যে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, সারাক্ষণ ভুগতেন বাড়ির পিছুটানে, চাইতেন ফিরে আসতে, কিন্তু কোনোদিনই আসেননি। এখন তাঁর জায়গায় আমি ফিরে আসছি কোমালায়, আর আমার মনে প'ড়ে গেলো তিনি আমাকে কী-কী বলতেন : 'লোস্ কোলিমোতেস্ এ পৌঁছে চমৎকার একটা দৃশ্য দেখতে পাবি তুই। দেখতে পাবি সবুজ এক সমভূমি···ভুট্টা যখন পাকে তখন হলুদ হ'য়ে যায়। সেখান থেকে কোমালা দেখতে পাবি তুই। বাড়িগুলো সব শাদা, আর রাত্তিরে সব আলোয় ঝলমল ক'রে ওঠে।' চুপি-চুপি নরম স্বর তাঁর, প্রায় যেন কানে-কানে বলছেন ফিশফিশ, যেন কথা বলছেন নিজের সঙ্গে।

'আপনি কোমালা যাচ্ছেন কেন ?' শুনলাম সে আমায় জিগেশ করছে।

'আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে।'

'ওহ্ !' সে বলেছিলো।

আমরা আবার চুপ ক'রে গিয়েছিলাম।

আমরা উৎরাই ভেঙে নামছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম একটানা গাধার দুলকি চাল। চোখ আমাদের ছিলো আধোবোজা, সেই অগস্টের গরমে এত ক্লান্ত লাগছিলো যে ঝিমুনি আসছিলো আমাদের।

'দারুণ একটা আসর বসাবে ওরা আপনার জন্যে,' সে বলেছিলো, 'আবার কাউকে দেখতে পেয়ে ওরা বেজায় খুশি হবে। সে যে কত বছর পর আবার কেউ এখানে এলো।'

তারপর সে যোগ করেছিলো : 'আপনি আসছেন তো, আপনাকে দেখে ওরা খুব খুশি হবে।'

টলটলে একটা হ্রদের মতো উত্তাপ কাঁপছিলো উপত্যকায়। উপত্যকা ছাড়িয়ে ওপাশে পাহাড়ের সার, তার ওপাশে দূর ছাড়া আর কিছুই নেই।

'কেমন দেখতে আপনার বাবাকে ?'

আমি বলেছিলাম, 'আমি জানি না। আমি শুধু জানি যে তাঁর নাম পেদ্রো পারামো।'

'ওহ্ !'

কিন্তু কথাটা সে এমনভাবে বলেছিলো যেন সে খাবি খাচ্ছে। আমি বলেছিলাম, 'অন্তত ওরা আমাকে বলেছে যে এটাই ওঁর নাম।'

তাকে আবার 'ওহ্ !' বলতে শুনেছিলাম আমি।

তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো লোস্ এন্‌কুয়েন্‌ত্রোসে, তিন-চারটে রাস্তা এসে যেখানে মিলেছে। আমি শুধু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম সেখানে, শেষকালে সে তাঁর গাধাগুলো নিয়ে হাজির হয়েছিলো।

তাকে জিগেশ করেছিলাম, 'কোথায় যাচ্ছো ?'

'ঐ দিকে, সেনিওর,' সে আঙুল তুলে দেখিয়েছিলো।

'কোমালা কোথায় জানো ?'

'আমি ওখানেই যাচ্ছি।'

তাই আমি তার অনুসরণ করেছিলাম। তার চলার সঙ্গে তাল রেখে পেছন-পেছন হেঁটে আসছিলাম আমি, শেষটায় সে যখন বুঝতে পেরেছিলো যে আমি তার পেছন-পেছন আসছি সে তার চলার গতি কমিয়েছিলো একটু। তারপর আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম, প্রায় কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে।

সে বলেছিলো, 'পেদ্রো পারামো আমারও বাবা।'

ফাঁকা আকাশটা দিয়ে কা-কা-কা ক'রে একঝাঁক কাক উড়ে গিয়েছিলো।

পাহাড়শিরা পেরিয়ে আবার আমরা উৎরাই ভাঙতে শুরু করেছিলাম। গরম হাওয়াকে পেছনে ওপরে ফেলে রেখে আমরা নেমে এসেছিলাম নির্ভেজাল উত্তাপের মধ্যে হাওয়ার কোনো নিশ্বাস নেই যেখানে। সবকিছুকে দেখাচ্ছিলো যেন কিসের বা কারু প্রতীক্ষায় হাঁ ক'রে আছে।

'কী গরম এখানে,' আমি বলেছিলাম।

'এ তো কিছুই না। রোসো একটু, কোমালা গেলে দেখবে যে সে আরো আরো গরম। ঐ শহরটা পৃথিবীর সবচেয়ে গরম জায়গা। ওরা বলে যে কোমালায় কেউ যখন মারা যায় তখন নরকে পৌঁছে সে তার কম্বল আনতে ফিরে আসে আবার।'

'তুমি পেদ্রো পারামোকে চেনো ?' আমি তাকে জিগেশ করেছিলাম।

তাকে যে এত প্রশ্ন করবার সাহস হচ্ছিলো আমার তার কারণ আমার মনে হয়েছিলো আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি।

'কে উনি?' আমি জিগেশ করেছিলাম।

'মূর্তিমান ঘৃণা! শুধু খাঁটি একতাল ঘৃণার পিণ্ড!'

দরকার না-থাকলেও সে চাবুক কশিয়েছিলো তার গাধাগুলোকে; গাধাগুলো আমাদের আগে-আগেই ঢাল বেয়ে নামছিলো।

আমার জামার পকেটে আমার মায়ের ছবি ছিলো, টের পাচ্ছিলাম সে আমার বুক গরম ক'রে দিচ্ছে, যেন মাও আসছেন সঙ্গে-সঙ্গে। পুরোনো ছবি একটা, কিনারগুলো খ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু শুধু এটার কথাই আমি জানি; রান্নাঘরে একটা ঝুড়িভর্তি লতাপাতামশলার মধ্যে এটাকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম। আর সেই থেকে সবসময় এটা আমি সঙ্গে রেখেছি। ছবি তোলানোতে বেজায় আপত্তি ছিলো আমার মায়ের। বলতেন ছবি লাগে ঝাড়ফুঁক তুকতাকে, আর হয়তো ঠিকই ভাবতেন তিনি, কারণ ছবিটার জায়গায়-জায়গায় ফোঁড়, যেন ছুঁচ দিয়ে বিঁধেছে কেউ। হৃৎপিণ্ডের কাছে এত বড়ো একটা ছ্যাঁদা যে তোমার আস্ত মধ্যমাটাই তাতে যেন ঢুকে যাবে।

আমার সঙ্গে এখন সেই একই ছবি। আশা করেছিলাম, যখন তিনি জানতে পাবেন আমি কে, ছবিটা হয়তো পেদ্রো পারামোর সঙ্গে কোনো সমঝোতায় আসতে আমায় সাহায্য করবে।

'ছাখো-ছাখো,' সে বলেছিলো, থেমে। 'দেখছো পাহাড়টা, ঐ যেটা শুওরের হিশির থলির মতো দেখতে? বেশ। এবার ওদিকটায় তাকাও। ওর পাহাড়শিরাটা দেখছো? ঐ পুরো তল্লাটটাই হ'লো মেদিয়া লুনা, যা-কিছু দেখতে পাচ্ছো, সব। আর পুরো মহালটারই মালিক পেদ্রো পারামো। উনি আমাদের বাবা, অথচ আমরা জন্মেছিলাম মেঝেয়, চাটাইয়ের ওপর। আর আসল রসিকতাটা হ'লো যে তিনি আমাদের সবাইকেই নিয়ে গিয়েছিলেন বাপ্তিস্মতে। তোমাকেও নিয়েছিলেন তো, ঠিক কি না?'

'জানি না।'

'গোল্লায় যাও।'

'কী বললে?'

'বললাম যে আমরা প্রায় এসে পড়েছি, সেনিওর।'

'জানি। কিন্তু গ্রামের এমন হাল কেন? মনে হয় কেউ যেন থাকে না, পোড়ো গাঁ।'

'সে-রকম একে দেখায় না। তবে পোড়ো গাঁ-ই। কেউই আর থাকে না এখানে।'

'আর পেদ্রো পারামো?'

'পেদ্রো পারামো মারা গেছেন অনেক কাল আগে।'

...

এটা দিনের সেই সময় যখন সব গাঁয়েরই পথে-ঘাটে বাচ্চারা খেলা করে, বিকেলটা ভ'রে দেয় তাদের হইচইতে। যখন দেয়ালগুলো তখনও ছড়িয়ে দেয় রৌদ্রের হলুদ।

অন্তত তা-ই আমি দেখেছিলাম কাল সাইয়ুলাতে এই একই সময়ে। আরো দেখেছিলাম নিথর হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে কবুতরেরা। তারা পাক খেয়েছিলো হাওয়ায় তারপর চালগুলোর ওপর দিয়ে উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো আর বাচ্চাদের হট্টগোলও উড়ে যাচ্ছিলো পাখিদের মতো।

এখন আমি এইখানে এই স্তব্ধ গ্রামটায়। শুনতে পাচ্ছি রাস্তার খোয়ার ওপর আমারই পায়ের শব্দ। ফাঁকা একটা আওয়াজ, দেয়ালে ঘা খেয়ে-খেয়ে ফিরে আসছে।

বড়ো রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছি আমি। পেরিয়ে যাচ্ছি ফাঁকা-ফাঁকা সব ঘর-বাড়ি, ভাঙা সব দরজার পাল্লা আর আগাছা। এই আগাছাকে—ঐ-যে-কী-যেন-ওর-নাম—কী বলেছিলো? 'কাপিতানের বউ, সেনিওর। এই বদমাশ আগাছাগুলো ওঁৎ পেতে থাকে কখন ঘরবাড়ি ফাঁকা হ'য়ে যায়, তারপর ধেয়ে আসে। নিজেই দেখতে পাবেন কেমন ধুরন্ধর।'

একটা মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম গায়ে রেবোসো (মাফলার) জড়ানো এক মেয়ে, কিন্তু সে এমনভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো যেন তার কোনো অস্তিত্বই নেই। আমি হেঁটেই চলেছি, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছি হাট ক'রে খোলা দরজাগুলো দিয়ে। হঠাৎ মেয়েটি আমার সামনে রাস্তা পেরুলো।

'বুয়েনোস তার্দেস (শুভ সন্ধে),' বললে মেয়েটি।

আমি আমার চোখ দুটি দিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। চেঁচিয়ে জিগেস করলাম, 'দোনিয়া এদুভিহেস কোথায় থাকেন?'

আর সে হাত তুলে দেখালো, 'ঐ-যে, সাঁকোটার পাশের বাড়িটায়।'

জ্যান্ত মানুষের গলা তার। তার মুখে দাঁত আছে, যখন কথা বলে তখন তার জিভ নড়ে। পৃথিবীতে সকলেরই যেমন চোখ থাকে তারও তেমনি দুই চোখ। সব জানি আমি।

অন্ধকার হ'য়ে আসছিলো।

মেয়েটি আমায় চেঁচিয়ে জানালে, 'বুয়েনোস নোচেস (শুভ রাত্রি)।' কোথাও কোনো ছেলেমেয়ে খেলা করছে না, পায়রাগুলোও নেই কোথাও, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো গ্রামটা যেন এখনও বেঁচে আছে, আর স্তব্ধতা ছাড়া আর-কিছুই যদি আমি শুনে না-থাকি, তবে তার কারণ তো এটাই যে আমি স্তব্ধতায় তেমন অভ্যস্ত নই, বিশেষ যখন এখনও কত-কত শব্দ আর স্বরে আমার মাথাটা ভর্তি।

বিশেষত গলার স্বর। আর এখানে, যেখানে হাওয়া এমন মরা, গলার স্বর শোনায় আরো সশব্দ। আমার মনে প'ড়ে গেলো আমার মা আমায় কী বলেছিলেন। 'ওখানে তুই আরো ভালো ক'রে শুনতে পাবি আমায়, এখানকার চেয়ে অনেক ভালো ক'রে। ওখানে আমি তোর আরো আছে থাকবো।' আমার মা···সজীব।

তাঁকে বলতে ইচ্ছে করলো, 'তুমি ভুল করেছিলে, মা, তুমি আমায় ঠিকঠাক রাস্তা ব'লে দাওনি। তুমি শুধু বলেছিলে এটা কোথায় সেটা কোথায়, আর এখন আমি এসে পৌঁছেছি মরা একটা গাঁয়ে, যার খোঁজ করছি সে এখন আর বেঁচেও নেই।'

নদীর শব্দ ধ'রে এগিয়ে গিয়ে সাঁকোর পাশের বাড়িটা খুঁজে পেলাম আমি, দরজায় টোকা দিলাম। কিংবা টোকা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার হাত শুধু টোকা দিলে ফাঁকা হাওয়ায়, যেন বাতাস দরজা খুলে দিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক স্ত্রীলোক। সে বললে ; 'ভেতরে এসো।'

আর আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

•••

আমি কোমালায় থেকে গিয়েছিলাম। আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবার আগে সেই গাধাওয়ালা লোকটা বলেছিলো : 'আমি আরো দূরে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার বাড়ি ঐখানে—যেখানে পাহাড়গুলো এসে মিলেছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে

আসতে চাও, আসতে পারো, অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না। তবে তুমি যদি এখানে থাকতে চাও, এগিয়ে গিয়ে ঘুরে-ঘুরে ছাখো, অন্তত একবার গ্রামটায় চোখ বুলিয়ে নিতে পারবে। হয়তো এমন-কাউকে পেয়েও যাবে যে এখনও বেঁচে আছে।'

আমি থেকে গিয়েছিলাম। থাকতেই তো এসেছি।

তাকে ডেকে জিগেশ করেছিলাম, 'থাকার আস্তানা মিলবে কোথায়?' আমাকে প্রায় চেঁচিয়ে জিগেশ করতে হয়েছিলো।

'দোনিয়া এডুভিহেসের খোঁজ কোরো, যদি এখনও বেঁচে থাকেন। ওঁকে বোলো আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।'

'তোমার নাম কী?'

'আবুন্দিয়ো…' কিন্তু তার পদবিটা আর আমি শুনতে পাইনি।

'আমি এডুভিহেস দিয়াদা। ভেতরে এসো।'

দেখে মনে হ'লো সে যেন আমারই অপেক্ষা করছিলো। সে জানালে সব-কিছু তৈরি আছে, আর আমি তার পেছন-পেছন অন্ধকার সব কালো-কালো ঘরের একটা লম্বা সারি পেরিয়ে এলাম। প্রথমে ঘরগুলোকে ফাঁকা ব'লেই মনে হচ্ছিলো, কিন্তু পরে যখন আমি অন্ধকারে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলাম, আর আমাদের অনুসরণ ক'রে সরু একটা আলোর ফালি এলো পেছন-পেছন, আমি দু-ধারে দেখতে পাচ্ছিলাম ছায়াদের। আমার মনে হচ্ছিলো আমরা বুঝি ডাঁই ক'রে রাখা পুঁটুলিগুলোর মাঝখানে সরু পথটুকু দিয়ে হাঁটছি।

'কী আছে এখানে?' আমি জিগেশ করলাম।

'জঞ্জাল,' সে বললে, 'পুরো বাড়িটাই জঞ্জালে ভর্তি। সবাই যারা চ'লে গিয়েছে, তারা তাদের আশবাবপত্র লেপতোশক রাখবার জন্যে এই বাড়িটাকেই বেছে নিয়েছে—জিনিশগুলো ফিরিয়ে নিতে আর ফিরেও আসেনি। তবে তোমার জন্যে যে-ঘরটা আমি ঠিক ক'রে রেখেছি সেটা পেছন দিকে। সে-ঘর থেকে সবসময় আমি জঞ্জাল সরিয়ে সাফসুতরো ক'রে রাখি, যদি কেউ কখনও ফিরে আসে। তা, তুমি, তাহ'লে, ওর ছেলে?'

'কার?'

'দোলোরিতার।'

'হ্যাঁ···কিন্তু আপনি জানলেন কেমন ক'রে?'

'ও আমায় বলেছিলো তুমি আসছো। বলেছিলো তুমি আজ আসবে।'

'কে? আমার মা?'

'হ্যাঁ।'

কী যে ভাবা উচিত, বুঝতে পারলাম না, আর সেও কিছু ব্যাখ্যা করলো না।

'এই যে তোমার ঘর,' সে বললে।

কোনো দরজা নেই কোথাও, কেবল একটা খোলা মুখ; সে মোমবাতি জ্বালতেই দেখতে পেলাম ঘরটা ফাঁকা।

'কোনো বিছানা নেই যে,' তাকে আমি বললাম।

'সে নিয়ে ভেবো না। তুমি ক্লান্ত হ'য়ে আছো, আর ক্লান্তিই জাজিম হিশেবে যথেষ্ট। তুমি মেঝেয় শুতে পারো, কাল আমি তোমার বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দেবো। তোমার এটা জানা উচিত যে হুট ক'রে বলবামাত্রই কোনো ঘর গুছিয়ে রাখা যায় না। আগে থেকে জানতে হয়, আর আজকের আগে তোমার মা আমাকে কিছুই জানায়নি।'

'আমার মা···আমার মা তো মারা গেছেন।'

'ও, তাই ওর গলা এমন মৃদু শোনাচ্ছিলো। যেন ও অনেক দূরে কোথাও আছে। এখন ব্যাপারটা বুঝলাম; তা, কবে মারা গেছে?'

'সাতদিন আগে।'

'বেচারা দোলোরেস। নিশ্চয়ই ওর ভারি একা-একা লাগছিলো, পরিত্যক্ত। আমরা দুজনে দুজনকে কথা দিয়েছিলাম যে আমরা একসঙ্গে মরবো। যাতে দরকার হ'লে রাস্তায় পরস্পরকে সাহস দিতে পারি। যদি রাস্তায় কোনো গোলমাল হয়। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা। আমার কথা ও কখনও বলেনি তোমায়?'

'না তো, কখনও না।'

'আশ্চর্য। পরস্পরকে যখন আমরা কথা দিই, আমরা দুজনেই ছিলাম কিশোরী। ও বিয়ে করার ঠিক পরে-পরেই। আমাদের দুজনের মধ্যে গলাগলি ভাব ছিলো। এত সুন্দরী ছিলো তোমার মা, এত...হ্যাঁ, বলা যাক, মিষ্টি, ওকে ভালো না-বেসে কোনো উপায় ছিলো না। তবে ঠিক জানি শিগ্‌গিরই ওর নাগাল ধ'রে নিতে পারবো। স্বর্গ কত দূরে তা আমি ঠিকই জানি, তবে আমি

শর্ট কাটও জানি। শুধু ম'রে যেতে হবে তোমায়, যদি ভগবান চান, যখন তুমি মরতে চাও—যখন উনি ব্যবস্থা করেন তখন নয়। কিংবা চাইলে ওঁকে আগেই ব্যবস্থা করতে বলতে পারো। তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছি ব'লে কিছু মনে কোরো না, তোমাকে আমার নিজের ছেলের মতোই লাগছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, কতবার বলেছি, "দোলোরেসের ছেলের আসলে আমারই ছেলে হওয়া উচিত ছিলো।" কেন, সেটা তোমায় পরে বলবো। এখন তোমায় শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে স্বর্গের রাস্তায় আমি ঠিক ওর নাগাল ধ'রে ফেলবো।'

স্ত্রীলোকটির নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, আমার মনে হ'লো। তারপরে আমার আর কিছুই মনে হ'লো না—শুধু কেমন-একটা ধারণা হ'লো যে আমি যেন অন্য-কোনো জগতে এসে পৌঁছেছি। আমার শরীরটা যেন হাওয়ায় ভাসছে, এতটা অসাড় লাগছে—খেলা করা যায় যেন তাকে নিয়ে, যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুল।

'ক্লান্ত লাগছে,' আমি বললাম।

'প্রথমে কিছু-একটা খেয়ে নাও এসে। অল্পকিছু।'

'খাবো। তবে পরে।'

চালের টালি থেকে ঝ'রে-পড়া জল পাতিওর (দাওয়ার) বালিতে একটা গর্ত বানিয়ে দিচ্ছিলো। টপ-টপ-টপ ক'রে জল পড়ছিলো লরেল পাতায়, আর পাতাটা নুয়ে প'ড়েই আবার টুপ ক'রে খাড়া হ'য়ে উঠছিলো। এর মধ্যেই তুফান কেটে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে, হাওয়া যখন ডালিমগাছের ডালপালাগুলো নাড়ছিলো গাছের তলায় ঝ'রে পড়ছিলো ছোটো পশলা বৃষ্টি; ঝকঝকে ফোঁটা মাটিতে ছাপ ফেলছিলো তারপর মাটিতে শুষে গিয়ে ঝাপশা হ'য়ে যাচ্ছিলো। তুফানের সময় মুরগিগুলো গুটিশুটি মেরে কুঁকড়ে গিয়েছিলো, যেন ঘুমোচ্ছে। এখন তারা ডানা ছড়িয়ে পাতিওতে বেরিয়ে এলো, বৃষ্টি যে-কেন্নোগুলো মাটির ভেতর থেকে বার ক'রে এনেছিলো খপখপ করে তাদের গিলে খেতে লাগলো। রৌদ্র ঝকমক করছিলো নুড়িপাথরে, পাতাদের সঙ্গে খেলা করছিলো যে উজ্জ্বল হাওয়া তাদের সঙ্গে খুনশুটি করছিলো।

'এতক্ষণ ধরে পায়খানায় কী করছিস?'

'কিছু না, মা।'

'ওখানে অতক্ষণ থাকলে সাপ এসে তোকে ছোবলাবে।

'হ্যাঁ মা।'

আমি তোমার কথা ভাবছিলাম, সুসানা। শ্যামল পাহাড়গুলোয়। যখন আমরা ঘুড়ি ওড়াতাম হাওয়ার মরশুমে। আমরা যখন ওপরে, টিলার চুড়োয়, শুনতে পেতাম নিচে থেকে গাঁয়ের সব আওয়াজ ভেসে আসছে, আর হাওয়া হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে সুতো। 'সাহায্য করো, সুসানা।' আর কোমল হাতগুলো চেপে ধরতো আমার হাত। 'আর-একটু সুতো ছেড়ে দাও।'

হাওয়া আমাদের হাসিয়ে দিতো ; ঘুরে-ঘুরে সুতো যখন বেরিয়ে যাচ্ছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আমাদের চাউনি মিলে গেলো ; তারপরেই সুতো ছিঁড়ে গেলো, আস্তে, নরম, যেন পাখির ডানায় ঘা লেগেছে। আর ওপরে কাগজের পাখি ডিগবাজি খেতে-খেতে পড়তে লাগলো, পেছনে টেনে আনলো তার ন্যাকড়ার ল্যাজ, তারপর মিলিয়ে গেলো মাটির সবুজে।

তোমার ঠোঁটগুলো ভেজা ছিলো, যেন তারা শিশির চুমু খাচ্ছিলো এতক্ষণ।

'বলছি না পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসতে।'

'হ্যাঁ, মা, এক্ষুনি আসছি।'

আমি তোমাকে মনে করছি। যখন তুমি তাকিয়েছিলে আমার দিকে তোমার সিন্ধুসবুজ চোখে।

সে তাকিয়ে দেখলে তার মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়।

'এতক্ষণ নিচ্ছিলি কেন ? কী করছিলি তুই ?'

'ভাবছিলাম।'

'অন্যকোথাও গিয়ে ভাবতে পারিস না ? পায়খানায় অতক্ষণ সময় কাটানো কারু পক্ষেই ভালো না। তাছাড়া, তোর তো এখন কিছু-একটা করার কথা। দিদার ওখানে গিয়ে ভুট্টা মাড়াইতে লাগছিস না কেন ?'

'ঠিক আছে, মা। এক্ষুনি যাচ্ছি।'

'দিদা, আমি ভুট্টা মাড়াইতে লাগবো।'

'আমরা তো সব কাজ সেরে ফেলেছি রে···এবার অবশ্য চকোলেট বানাবো। তুই কোথায় ছিলিস এতক্ষণ? ঝড়তুফানের সময় সারাক্ষণ তোকে পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজেছিলাম আমরা।'

'অন্য পাতিওটায় ছিলাম।'

'কী করছিলি? জপ করছিলি?'

'না, আবুয়েলা (দিদা)। বৃষ্টিপড়া দেখছিলাম।'

তার দিদা তার দিকে তাঁর ঐ আধাহলুদ আধাধূসর চোখে তাকালেন— তাঁর চোখদুটো মনে হয় মানুষের একেবারে ভেতরে গিয়ে ছাখে, ভেতরের সব কথা প'ড়ে ফ্যালে।

'বেশ, তা'হলে যা, গিয়ে মাড়াইকল সাফ করগে।'

> সুসানা, তুমি মাইল-মাইল দূরে আছো, সব মেঘের ওপরে, দূরে সবকিছুর ওপরে। তাঁর বিশাল অসীমে লুকিয়ে, আর দৈবী করুণার আড়ালে, যেখানে কখনও তোমায় আমি খুঁজে পাবো না বা দেখতেও পাবো না। যেখানে আমার কথারা কখনও তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছুবে না।

'আবুয়েলা, মাড়াইকলটা ভেঙে গিয়েছে যে!'

'নিশ্চয়ই ঐ মিকায়েলা হতচ্ছাড়া ভেঙেছে ওটা। বাড়ির সবকিছু ও ভেঙে ফাঁক ক'রে দিলো, কিছুতেই কিছু শিখ্‌লো না। কিন্তু তার আর চাড়া কী?'

'তুমি নতুন একটা কিনে নাও না কেন? পুরোনোটা সারিয়ে কোনো লাভ নেই।'

'তুই বোধহয় ঠিকই বলেছিস। কিন্তু তোর দাদুর সৎকারে এত খরচ হ'য়ে গেলো, তারপর চার্চে অত-সব প্রণামী দিতে হ'লো, মনে হয় না বাড়িতে আর কানাকড়িও আছে। ঠিক আছে, নিজেদের সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নতুন-একটা কিনতে হবে আর কি। যা, গিয়ে দোনিয়া ইনেস ভিয়ালপান্দোকে বল ধারে একটা দিতে, ফসল উঠলে অক্টোবরে সব ধার শোধ ক'রে দেবো।'

'হ্যাঁ, আবুয়েলা।'

'আর যাচ্ছিসই যখন, তখন গিয়ে বল একটা চালনি আর কাস্তেও ধারে দিতে। যেভাবে এই আগাছাগুলো গজাচ্ছে তাতে মনে হয় শিগ্‌গিরই ঝোপ-ঝাড় বেঁধে এসে আমাদেরই পথে বার ক'রে দেবে। যদি এখনও বড়ো বাড়িটা থাকতো, পেছনের জমি সমেত, তাহ'লে এমন ঘ্যান-ঘ্যান করতে হ'তো না। কিন্তু এখানে আসার সময় তোর দাদু সব বেচে দিলো যে। ভগবান জানেন, লোকে যেভাবে চায় সেভাবে কখনও কিছু হয় না। দোনিয়া ইনেসকে বলিস ওর কাছে যত ধার আছে সব ফসল উঠলে শোধ ক'রে দেবো।'

'হ্যাঁ, আবুয়েলা।'

পাতিওতে এসেছিলো মৌটুশকি পাখি। বছরের এটা সেই সময়। জুঁই ফুলের ফাঁকে-ফাঁকে তারা গুনগুন করছিলো।

দিব্য হৃদয়ের দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে দেখতে পেলে চব্বিশ সেন্‌তাভো। চার সেন্‌তাভো রেখে সে কুড়িটা নিয়ে নিলে।

যাবার আগে তার মা তাকে ডেকে জিগেশ করেছিলেন; 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'দোনিয়া ইনেস ভিয়ালপান্দোর কাছে, নতুন একটা মাড়াইকল কিনতে। পুরোনোটা ভেঙে গিয়েছে।'

'ওকে বলিস এক গজ কালো তাফ্‌তা দিতে, খাতায় লিখে রাখতে।'

'ঠিক আছে, মা।'

'ফেরার পথে আমার জন্যে ক-টা অ্যাসপিরিন কিনিস তো। সদর দরজার কাছে ফুলের টবে কিছু পয়সা আছে।'

সে একটা পেসো দেখতে পেলে। তার কুড়ি সেন্‌তাভো রেখে সে পেসোটা তুলে নিলে।

'এখন,' মনে-মনে সে ভাবলে, 'যা-ই ঘটুক না কেন, ভাবনা নেই—আমার এখন অনেক টাকা।'

'পেদ্রো!' ওরা তাকে দেখে হাঁক দিলে। 'পেদ্রো!'

কিন্তু সে তাদের ডাক শুনতে পেলো না। সে তখন অনেক দূরে।

রাত্তিরে আবার বৃষ্টি পড়েছিলো। অনেকক্ষণ ধ'রে বৃষ্টির ঝমঝম শুনতে-

শুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, জেগে উঠে সে শুনতে পেলে শান্ত গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির ফিশফিশ। জানলার কাচ জলে চকচক করছে, আর ভারি-ভারি ফোঁটাগুলো চোখের জলের মতো কাচ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

> বিদ্যুতের ঝিলিকে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে পড়তে দেখেছিলাম আমি, সুসানা, আর যতবার শ্বাস ফেলেছিলাম সব ছিলো দীর্ঘশ্বাস, আর ভাবনার সবাই ছিলো শুধু তোমারই কথা, সুসানা।

বৃষ্টি বদলে গেলো একটানা হাওয়ায়, সে শুনতে পেলে : '…আমাদের সব পাপের ক্ষমা আর শরীরের পুনরুত্থান। আমেন।' সেটা ভেতরে, যেখানে মেয়েরা সবাই শেষ করছে মালা জপ। তারা উঠে দাঁড়ালো, খিল লাগালো দরজায়, আলো নিভিয়ে দিলো।

'তুই এলি না কেন জপের সময়? তোর দাদুর জন্যে প্রার্থনা করছিলাম আমরা, সে-কথা তো তুই জানতিস।'

তার মা দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে ছায়ায়, চৌকাঠের কাছে, হাতে একটা মোমবাতি। তাঁর ছায়া কাঁপছিলো সিলিঙে। লম্বা, ছড়িয়ে-পড়া ছায়া, কড়িকাঠগুলো ছায়াকে টুকরো-টুকরো ক'রে দিয়েছিলো।

সে বললে : 'আমার শরীর ভালো লাগছিলো না।'

মা চ'লে গেলেন। নিভিয়ে দিলেন মোমবাতি। যখন তিনি দরজা ভেজিয়ে চ'লে গেলেন এলো চাপা কান্না, বৃষ্টির ফোঁপানির সঙ্গে মিশে-যাওয়া।

চার্চের ঘড়ি প্রহর হাঁকলো, একের পর এক, একটার পর আরেকটা, যেন সময় কেমন ক'রে যেন কুঁচকে গুটি পাকিয়ে গিয়েছে।

'যা বলছিলাম, প্রায় তোর মা-ই ছিলাম আমি। দোলোরেস বুঝি তোকে এ-সম্বন্ধে কিছু বলেনি?'

'না। এ-রকম কিছুই তো বলেননি। আপনার কথা আমি শুনেছি আবুন্‌দিয়ো ব'লে একজনের কাছে। তার পদবিটা শুনতে পাইনি আমি, তবে সে গাধা নিয়ে যাচ্ছিলো।'

'আবুন্দিয়ো! নিশ্চয়ই। আমাকে তা'হলে তার এখনও মনে আছে! বাড়িতে যত লোক এনে তুলতো তাদের প্রত্যেকের বাবদ তাকে আমি বকশিশ

দিতাম। এখন সবকিছুই অন্যরকম। গাঁটা এমন গরিব যে কেউ কখনও এখানে আর আসেও না। বলছিস সেই তোকে আমার কথা সুপারিশ করেছে ?'

'বলেছিলো অবশ্যই যেন তোমার খোঁজ করি।'

'তার কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ না-ক'রে পারি না। ভালো লোক এই আবুন্ দিয়ো। ভারি নির্ভরযোগ্য, জানিস। আগে সে ডাক ব'য়ে নিয়ে যেতো, কালা হ'য়ে যাবার পরেও। এখনও মনে আছে যেদিন ও কালা হ'য়ে গেলো: আমরা সকলেই ওর জন্যে কষ্ট পেয়েছিলাম, কারণ ওকে ভারি পছন্দ করতাম; ও ডাক বিলি করতে যেতো, বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সব এসে আমাদের বলতো। মনে হয় এখানে কী হয় না-হয় বাইরে গিয়ে সে তারও গল্প ফেঁদে বসতো। কথা বলতে পারলে ওকে আর পায় কে ? তারপর একদিন দুম ক'রে কথা বলা থামিয়ে দিলো, হঠাৎ। বললো কী বলছো তা-ই যদি শুনতে না-পাও তবে প্যাঁচাল পেড়ে কী লাভ। হয়েছিলো কী, একটা তুবড়ি, ঐ যেগুলো ব্যাঙের মতো লাফায় আর বেজায় আওয়াজ ক'রে ফেটে যায়, ঠিক ওর মাথার ওপর প'ড়ে ফেটে গিয়েছিলো। তারপর থেকে সে আর কথাটি কয় না—যদিও এখনও কিন্তু দিব্যি কথা বলতে পারে। তবে লোকটা ভালো, এই আবুন্ দিয়ো, সব সত্ত্বেও।'

'আমি যার কথা বলছি সে কিন্তু কালা নয়।'

'নয় ? তাহ'লে এক লোক নয় নিশ্চয়ই। তাছাড়া, আবুন্দিয়ো তো মারা গেছে, ঠিক জানি, নির্ঘাৎ ম'রে গিয়েছে। ও বলেনি কিছু তোকে ? নিশ্চয়ই এক লোক নয়।'

সে তার মাথা নাড়লো।

'তা তোর মায়ের কথাই বলি,' বললে স্ত্রীলোকটি, 'আমি তোকে বলতে যাচ্ছিলাম যে…'

আমি শুনতে-শুনতে তাকে ভালো ক'রে দেখতে লাগলাম। মনে হ'লো জীবনে কখনও অনেক শোকতাপ পেয়েছে। মুখটা এমন ফ্যাকাশে, যে দেখে মনে হয় তার শরীরে যেন কোনো রক্ত নেই, আর তার হাত দুটি কেমন শুকিয়ে কুঁচকে গিয়েছে। চোখ দুটো অবশ্য তুমি দেখতে পাবে না। অনেক লেসের কাজ-করা পুরোনো একটা শাদা জামা পরনে, একটুকরো টোন সুতো দিয়ে কুমারী মাতার এক পদক গলায় ঝোলানো, তাতে লেখা পাপী-তাপীর আশ্রয়।

…'যা বলছিলাম, সে মেদিয়া লুনায় ঘোড়া বশ মানাতো। তার নাম ছিলো ইনোসেন্‌সিয়ো ওসোরিয়ো, তবে সব্বাই ওকে ডাকতো লাফান্দাজ, কারণ খুবই হালকা পায়ে সে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতো যেন মাটিতেই পা পড়ছে না। পেদ্রো বলতো ও নাকি কোল্‌ট ঘোড়াকে বাগে আনতে দারুণ পোক্ত, তবে ও আরো-কিছুতেও বেশ পোক্ত ছিলো, আর তা মোটেই ঘোড়া বশ করা নয়, তাতিয়ে উশকে দেয়া—ও উশকে দিতো স্বপ্ন, আর সেটাই খাঁটি কথা। তোর মায়ের সঙ্গে একসময় মাখামাখি ছিলো ওর, আরো অনেকের সঙ্গেও ছিলো। আমার সঙ্গেও। একবার যখন আমার অসুখ করেছিলো, ও বাড়ি চ'লে এসেছিলো, বলেছিলো, "রোসো, আমি তোমায় পরীক্ষা ক'রে দেখছি, দেখবে চট ক'রে সেরে যাবে।" এ-কথা যখন ও বলতো সবসময় তার মানে হ'তো যে ও তোমার সারা গায়ে আদর করবে, প্রথমে শুধু আঙুলের ডগা, তারপর ড'লে দেবে তোমার হাত, তারপর ড্যানা, শেষটায় গিয়ে পৌঁছুতো পায়ে, ডলতে-ডলতে, ফলে একটু আগে তোমার যদি শীত-শীত করছিলো তো এর-মধ্যেই তুমি গরম হ'য়ে উঠেছো। আর সবসময় ও তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ ব'লে দিচ্ছে। কী-রকম একটা ঘোরের মধ্যে গিয়ে পড়তো যেন, বেদেদের মতো চোখ গোল-গোল ক'রে ঘোরাতো, মাঝে-মাঝে একেবারে উদোম ন্যাংটো হ'য়ে যেতো, বলতো যে আমরা নাকি আসলে তাই চাই। মাঝে-মাঝে অবশ্য ঠিকই বলতো, সব বারই তো ওর ধারণা ভুল হ'তো না।

'তবে তোকে যা বলতে চাচ্ছিলাম তা হ'লো এই ওসোরিয়ো যখন তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতো, তাকে গিয়ে বলতো যে সে-রাত্তিরে কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে কিছু করা নাকি ঠিক হবে না, কারণ চাঁদ নাকি সে-রাতে বেজায় অলুক্ষুণে।

'তো দোলোরেস আমায় এসে বলতো কী করা উচিত তা তার মাথায় ঢুকছে না। বলতো পেদ্রো পারামোর সঙ্গে সে শুতে পারবে না, বিয়ের রাত হ'লেও না। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, ধুর, ওসোরিয়োর কথায় কান দেয়া মোটেই ঠিক হবে না, সে তো না-হক একঝুড়ি ঝুট বলে।

' "আমি পারবো না," দোলোরেস বলেছিলো, "তুই বরং আমার জায়গায় যা। ও কখনও তফাৎ টের পাবে না।"

'আমি ওর চেয়ে বেশ কচিই ছিলাম, আর গায়ের রংও অত শ্যামলা ছিলো না, কিন্তু অন্ধকারে সে টেরই পাবে না।

'"আমি পারবো না, দোলোরিতা। তোকে গিয়েই ওর সঙ্গে শুতে হবে।"

"শোন, শুধু এই একবার কৃপা কর। আমি না-হয় তোর হ'য়ে অন্যদের সঙ্গে শোধ ক'রে দেবো।"

'তখন তোর মা ছিলো কিশোরী, মৃদু কোমল চোখ দুটো। কিছু যদি তার সত্যি সুন্দর থেকে থাকে তো সে শুধু তার চোখ। আর ও জানতো কেমন ক'রে কথা দিয়ে ভুলিয়ে কারু কাছ থেকে কাজ আদায় ক'রে নিতে হয়।

' "যা না আমার জায়গায়, দয়া ক'রে, দোহাই তোর," ও বলেছিলো।

'আর আমি গিয়েছিলাম।'

'অন্ধকার আমায় সাহায্য করেছিলো, আর তোর মা আরো একটা জিনিশও জানতো না, সেটা এই যে আমিও পেদ্রো পারামোকে পছন্দ করতাম।

'তার সঙ্গে আমি বিছানায় গেলাম, প্রেমে গদগদ, জড়িয়ে ধরলাম বুকে, কিন্তু আগের দিন ও হুল্লোড়ে বেরিয়েছিলো, ফুর্তি লুঠতে, দারুণ ক্লান্ত। কেশে-কেশে সারা, শুধু আমার দু-ঠ্যাঙের মধ্যে নিজের ঠ্যাং রাখা ছাড়া আর-কিছুই করেনি।

'ভোর হবার আগেই আমি দোলোরেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বলেছিলাম : "এবার তুই যা। এটা তো অন্য দিন।"

'ও জিগেশ করেছিলো : "কী করেছে রে তোর সঙ্গে?"

' "এখনও বুঝে উঠতে পারিনি কী," আমি বলেছিলাম।

'পরের বছর তুই জন্মালি। আমি তোর মা নই ঠিক, তবে প্রায় হ'য়ে যাচ্ছিলাম।

'এ-সব কথা তোকে বলতে তোর মা-র বোধহয় লজ্জা করছিলো।'

আমার মা।...'সবুজ সব মাঠ। দেখতে পাবি দিগন্ত উঠছে নামছে যখন হাওয়া দুলিয়ে যায় গম, কিংবা যখন বৃষ্টি বিকেলবেলায় এলোমেলো ক'রে দিয়ে যায় তাকে। মাটির রং, তেফলা পাতার গন্ধ আর রুটি। টাটকা মধুর মতো সৌরভ ছিটোয় এমন-এক গ্রাম...'

'পেদ্রো পারামোকে ও সবসময় ঘেন্না করতো। "দোলোরিতাস! আমার ছোটোহাজরি দিতে বলেছো ওদের?" আর তোর মা ভোর হবার আগেই উঠে পড়তো উনুন ধরাতে। বেড়ালগুলো ঘুম ভেঙে জাগতো, ওর পেছন-পেছন যেতো, একটা আস্ত দঙ্গলের মিছিল। "দোনিয়া দোলোরিতাস!"

'কত-কতবার তোর মা শুনেছে এ-কথা। "দোনিয়া দোলোরিতাস ! এ আমি খেতে পারবো না—ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে !" কতবার—কত ! আর যদিও সব চেয়ে খারাপ ব্যাপারে ও অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো তবু ক্রমেই ওর ঐ নরম চোখ দুটি কঠিন হ'য়ে উঠতে শুরু করলো।'

'…আর মরুভূমি উষ্ণতার মধ্যে সবকিছুরই গন্ধ ছিলো যেন নারঙ্গি মুকুলের…'

'শেষটায় ও খালি দীর্ঘশ্বাস ফেলতো।

' "দীর্ঘশ্বাস ফেলছো কেন, দোলোরিতাস ?"

'সেদিন বিকেলে আমি ছিলাম ওদের সঙ্গে। আমরা ছিলাম বাইরে, দেখছিলাম কেমনভাবে ছোটো পাখির ঝাঁক উড়ে যায়, আর একটা শকুনও চক্কর দিয়ে ঘুরছিলো আকাশে।

"দীর্ঘশ্বাস ফেলছো কেন, দোলোরিতাস ?"

' "ও-রকম একটা শকুন হ'তে চাই আমি, তাহ'লে আমি উড়ে চ'লে যেতে পারতাম যেখানে আমার দিদি থাকে।"

' "ঠিক আছে, দোনিয়া দোলোরিতাস। এক্ষুনি গিয়ে তুমি দেখা করতে পারো ওর সঙ্গে, আজকেই। চলো, বাড়ি ফিরে যাই, যাতে তুমি তোমার তোরঙ্গ গুছিয়ে নিতে পারো।"

'আর তোর মা চ'লে গেলো।

' "বিদায়, দোন পেদ্রো।"

' "বিদায়, দোলোরিতাস।"

'ও চিরকালের মতো মেদিয়া লুনা ছেড়ে চ'লে গেলো। মাস কয়েক পরে পেদ্রো পারামোকে আমি ওর কথা জিগেশ করেছিলাম।

' "ও ওর দিদিকেই আমার চেয়ে বেশি পছন্দ করে। হয়তো সুখেই আছে এখন। তাছাড়া, আমিও এমনিতেই ওকে নিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছিলাম। আমি ওর খোঁজই নেবো না, যদি তুমি তাই ভেবে থাকো।"

' "কিন্তু ওরা খাবে-পরবে কী ক'রে ?"

' "ভগবানই না-হয় ওদের দেখবেন।" '

'…আমাদের এভাবে ত্যাগ করার জন্যে ওকে গুনাগার দিতে বাধ্য করিস…'

'আর এই অব্দি—যতক্ষণ-না ও এসে আমায় বললো যে তুই 'আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছিস—ওর কোনো খবরই আমরা পাইনি।'

'আমরা কোলিমাতে হেরক্রদি মাসির ওখানে থাকতে গিয়েছিলাম,' আমি

দোনিয়া এত্বুভিহেসকে বললাম। 'মাসি বলতো আমরা ওর ঘাড়ে একটা বোঝার মতো চেপেছি। "তোর বরের কাছে ফিরে যাস না কেন?" মাসি মাকে বলতো।

' "ও কি আমার কোনো খোঁজ নিয়েছে? নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছে? না, আমার জন্যে লোক না-পাঠালে আমি ওর কাছে ফিরে যাবো না। আমি এখানে এসেছি, কারণ আমি তোকে দেখতে চাচ্ছিলাম। তুই আমার দিদি, তা-ই।"

' "তা জানি। তবে এখন তোর ফিরে-যাওয়া উচিত…" '

আমি ভেবেছিলাম দোনিয়া এত্বুভিহেস বুঝি আমার কথা শুনছে। কিন্তু সে এমনভাবে ঘাড় কাৎ ক'রে রেখেছিলো যেন সে কোনো দূরের মর্মর শুনছে। তারপর সে বললে :

…'জিরিয়ে নিবি না একটু? কখন?'

যখন তুমি চ'লে গিয়েছিলে, আমি জানতাম, আমি তোমাকে আর দেখতে পাবো না। অস্তসূর্যের রক্তরাঙা আলোয় তোমার মুখখানি কালো হ'য়ে ছিলো। তুমি মৃদু হাসছিলে। তুমি পেছনে ফেলে রেখে গিয়েছিলে গ্রামটা, আর সে যে কতবার তুমি আমায় বলেছিলে : 'এ-গ্রামটাকে আমি ভালোবাসি শুধু তোমার জন্যেই, অন্যসবকিছুর জন্যে গ্রামটাকে আমি ঘৃণা করি। এমনকী এখানে জন্মাবার জন্যেও।' আমি ভেবেছিলাম : 'ও আর ফিরে আসবে না।' আর নিজেকে আমি সে যে কতবার বলেছি : 'সুসানা আর ফিরে আসবে না। সুসানা আর-কখনও ফিরে আসবে না।'

'কী করছিস এখানে?'

'না, দিদা। রোহেলিয়ো চায় আমি বাচ্চার দেখাশুনো করি, আমি ওকে হাঁটতে নিয়ে যাচ্ছি। টেলিগ্রাফ আর বাচ্চা এই দুয়ের একসঙ্গে দেখাশুনো করা ভারি কঠিন—বিশেষ রোহেলিয়ো যখন বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে বিয়ার টানছে। তাছাড়া, ও আমায় কোনো মজুরিও দেয় না।'

'এখানে তোর মাইনে পাবার কথা না—কাজ শেখার কথা। একআধটু

কাজ শিখে নেবার পরেই মাইনের কথা তুলতে পারবি। এখন তো তুই নিছকই নবীশ। কাল-পরশু হয়তো তুইই মালিক হ'য়ে বসবি। তবে তার জন্যে ধৈর্য চাই, কেমন ক'রে হুকুম তামিল করতে হয় জানতে হয়। যদি তোকে বাচ্চাটাকে নিয়ে হাঁটতে যেতে বলে তাহ'লে তা-ই করবি, দোহাই তোর। নিজেকে পুরোপুরি সঁ'পে দিতে হবে তোকে।'

'অন্য লোকের বেলায় সে-সব চলতে পারে, দিদা, তবে ও-সব আমার জন্যে নয়।'

'তুই আর তোর যত খেয়াল। তোর জন্যে ভয় হয়, পেদ্রো পারামো, মন্দ লোক হ'য়ে যাবি তুই একদিন।'

...

.. 'কী হয়েছে, দোনিয়া এদুভিহেস ?'

সে এমনভাবে মাথা নাড়লে যেন কোনো স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠছে। 'মিগেল পারামোর ঘোড়াটা! মেদিয়া লুনার রাস্তা থেকে আসছে!'

'তাহ'লে সত্যি বুঝি কেউ থাকে মেদিয়া লুনায় ?'

'না। কেউ থাকে না ওখানে।'

'তবে ?'

'এ শুধু তার ঐ ঘোড়াটা, ইচ্ছেমতো আসে যায়। গলাগলি ভাব ছিলো দুটোয়—কক্‌খনো আলাদা করা যেতো না। সবখানে ঘোড়াটা ওর খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, আর খালি-খালি এমন সময় এসে হাজির হয় রোজ। বেচারা হয়তো শোকটা ভুলতে পারছে না। কোনো কুকর্ম ক'রে ফেলার পর জানোয়ার-গুলোও যেন তা টের পেয়ে যায়!'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। কই, আমি তো কোনো ঘোড়ার আওয়াজ শুনিনি।'

'শুনিসনি? তাহ'লে এ বোধহয় আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ভগবান আমাকে ঐ ক্ষমতাটা দিয়েছেন…ক্ষমতা, কিংবা কোনো সাজাই হবে বুঝি। তুই বুঝতে পারবি না এর জন্য আমায় কতটা ভুগতে হয়েছে।

আমি তাতে কিছুই বলিনি; একটু পরে সে আবার যোগ করলে: 'গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়েছিলো আমার ধর্মপুত্র মিগেল পারামোর সঙ্গে। ও যে-রাত্তে মারা গিয়েছিলো শুধু আমিই জানতাম আসলে কী হয়েছিলো। আমি তখন

শুয়ে পড়েছি, এমন সময় হঠাৎ শুনি মেদিয়া লুনা থেকে তার ঘোড়াটা ছুটে আসছে। অবাকই হয়েছিলাম আমি—এমন সময়ে তো ও সাধারণত ফিরে আসে না, সবসময় আসে ভোরবেলায়। কোন্‌ৎলা গাঁয়ে তার মেয়েবন্ধুর সঙ্গে গিয়ে ও দেখা করতো। এবার কিন্তু ও আর ফিরে আসেনি।…এবারে শুনতে পাচ্ছিস আওয়াজটা? ভালো ক'রে শোন।'

'আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!'

'তাহ'লে আবারও এ হয়তো আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়। তা, যে-কথা বলছিলাম, ওরা তো ভেবেছিলো এইবারে ও আর ফিরে আসেনি, কিন্তু ও ফিরে এসেছিলো। তার ঘোড়াটা পাশ দিয়ে পুরোপুরি ছুটে যেতে-না যেতেই আমি জানলায় কার টোকা শুনতে পেয়েছিলাম। তুই নিজেই বুঝতে পারবি সবটা নিছকই আমার কল্পনা কিনা। আসল কথাটা হ'লো কিছু-একটা আওয়াজ শুনে আমি জানলায় গিয়েছিলাম—কে, দেখতে। দেখি, মিগেল পারামো। দেখে আমি মোটেই অবাক হইনি, কারণ একসময় ও এখানে রাত কাটাতো, আমার সঙ্গে শুতো, যদ্দিন-না ঐ মেয়েটির সঙ্গে ওর দেখা হয়, যে ওকে পাগল ক'রে দিয়েছিলো।

' "কী হয়েছে?" মিগেল পারামোকে জিগেশ করেছিলাম। "মেয়েটা বুঝি তোমায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিয়েছে?"

' "না, সে এখনও আমায় ভালোবাসে। তবে মুশকিল হয়েছে এই যে তাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এমনকী গ্রামটাই আর খুঁজে পাচ্ছি না আমি। অনেকটা ধোঁয়া না কুয়াশা বা ঐ মতো কিছু ছিলো, কিন্তু সে জন্যে নয়। কোন্‌ৎলার কোনো অস্তিত্বই নেই আর। সবখানে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলাম, কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না। তাই তোমার কাছে আমি সব বলতে এলাম কারণ শুধু তুমিই আমায় বুঝতে পারো। কোমালায় অন্য-কাউকে যদি বলতাম, তবে তারা শুধু বলতো যে আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছি—অবশ্য এমনিতেই ওরা আমায় পাগল বলে।"

' "না। তুমি মোটেই পাগল নও, মিগেল, তুমি ম'রে গিয়েছো। মনে নেই, ওরা কী বলেছিলো, একদিন তোমার ঐ ঘোড়াটাই তোমাকে মেরে ফেলবে। মিগেল পারামো, তুমি অনেক উলটোপালটা পাগলামি করেছো, কিন্তু এই ব্যাপারটা তাদের চাইতে আলাদা।"

' "কিছুদিন আগে বাবা ওদের দিয়ে যে পাথরের দেয়ালটা বানিয়েছিলেন আমি শুধু সেটা লাফিয়ে টপকে যেতে চেয়েছিলাম। এল কোলোরাদোকে

লাফাতে উঁশকে দিয়েছিলাম, যাতে রাস্তায় নামবার আগে অতটা ঘুরে যেতে না-হয়। তা লাফিয়ে ডিঙিয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই, সমানে ছুটেছিলাম সামনে, কিন্তু ধোঁয়া ধোঁয়া আর ধোঁয়া ছাড়া আর-কিছুই চোখে পড়লো না।"

' "তোমার বাবা ব্যাপারটা শুনলে দারুণ কষ্ট পাবেন। ও'র জন্যে আমার দুঃখ হয়। এখন যাও, মিগেল, শান্তিতে বিশ্রাম করো গিয়ে। তুমি যে এসে আমায় জাগিয়েছো সেজন্যে আমি খুশি হয়েছি।"

'আর আমি জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। ভোর হবার আগেই মেদিয়া লুনা থেকে এক কামলা এসেছিলো, বলেছিলো, "দোন পেদ্রো তোমার খোঁজ করছেন। দোন মিগেল মারা গেছেন। তিনি চান যে তুমি তাঁর সঙ্গে থাকো।"

' "হ্যাঁ, আমি জানি," আমি বলেছিলাম, "ওরা তোমায় শোক করতে বলেনি?"

' "হ্যাঁ, দোন ফুলহোর আমায় বলেছেন শোকপালন করা উচিত।"

' "ঠিকই বলেছেন। দোন পেদ্রোকে গিয়ে বলো যে আমি আসছি। কতক্ষণ আগে ওরা লাশটা নিয়ে এসেছে?"

' "মাত্র আধঘণ্টা আগে। একটু আগে দেখতে পেলে তাঁকে হয়তো বাঁচানো যেতো…যদিও ডাক্তার বলেছেন অনেকক্ষণ আগেই নাকি মারা গেছেন। কিছু-একটা যে হয়েছে তা আমরা টের পেয়েছিলাম, কারণ এল কোলোরাদো একাই ফিরে এসেছিলো, এমন দাপাদাপি শোরগোল শুরু করেছিলো যে কেউ ঘুমোতে পারেনি। জানেনই তো, মিগেল আর ঘোড়াটি কেমন ভালোবাসতো একে-আরকে। আমার তো প্রায় মনেই হচ্ছে দোন পেদ্রোর চাইতেও ঘোড়াটাই বেশি কষ্ট পাচ্ছে। খাবে না, ঘুমোবে না, কেবল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, যেন টের পেয়ে গেছে। যেন ভেতরে-ভেতরে টের পেয়ে গেছে ভাঙনটা!"

' "যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যেতে ভুলো না।" আমি বলেছিলাম, আর মেদিয়া লুনার কামলাটি চ'লে গিয়েছিলো।

'কখনও তুমি কোনো মরা মানুষের গুমরানি শুনেছো?' আমাকে সে জিগেশ করলে।

'না, দোনিয়া এদুভিহেস।'

'তুমি অনেক ভালো আছো।'

…

…দ্রোণীটা থেকে এক এক ক'রে ফোঁটাগুলো ঝ'রে পড়ছিলো, টপটপ। পাথরের কানা থেকে জলের চৌবাচ্চায় টলটলে জল ঝ'রে-পড়ার আওয়াজটা তুমি শুনতে পেতে। শুনতে পেতে সব মর্মর, গুঞ্জন, মাটিতে পা হিঁচড়ে চলার আওয়াজ, হাঁটছে পা—আসছে যাচ্ছে। ফোঁটাগুলো পড়ছিলো তো পড়ছিলোই। চৌবাচ্চাটা কানায়-কানায় ভ'রে গিয়ে ভিজে মাটিতে জল ছড়িয়ে পড়ছিলো।

'জাগো!'

গলাটা চেনা শোনালো। কার গলা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে সে, কিন্তু তার শরীরটা ঢিলে হ'য়ে গেলো, আবার সে ঢুলে পড়লো, ঘুমের ভারে গুঁড়িয়ে গেলো। হাত ছুটে এলো ঢাকাটা ধরতে, আর তার গরম শরীরটা উৎসুক শান্তির মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

'জাগো!'

গলাটা তাকে কাঁধ ধ'রে ঝাঁকালো, তার শরীরটা টান-টান হ'য়ে গেলো। আধেক খুললো সে চোখ। দ্রোণীটা থেকে চৌবাচ্চায় ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তুমি শুনতে পেতে পা টেনে-টেনে চলার শব্দ…আর কান্না। সে কান্না শুনতে পেলে। আর সেটাই তাকে জাগিয়ে দিলে। সেই নরম, মিহি বিলাপের শব্দ, এত মিহি যে সে যেন গ'লে যেতে পারে ঘুমের গোলকধাঁধায়, যেখানে বাসা বেঁধে থাকে ভয়।

আস্তে-আস্তে সে উঠে পড়লো। দেখতে পেলো দরজার কাঠামোয় দাঁড়িয়ে-থাকা স্ত্রীলোকটির মুখ, অন্ধকারে ছায়ায় ঢাকা এখনও, চাপা স্বরে কাঁদছে। মেঝেয় পা ফেলবামাত্র সে তাকে চিনতে পারলো।

'তুমি কাঁদছো কেন, মা?'

'তোর বাবা মারা গেছেন।'

আর ঠিক তখন, যেন তাঁর শোকের কুণ্ডলিপাকানো স্প্রিঙটা ছিটকে খুলে গেলো, একই কথা বললেন তিনি আবার, আবার, বারে-বারে, যতক্ষণ-না হাতগুলো তাঁর কাঁধ চেপে ধরলো, থামালো তার কাঁপন।

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা দিচ্ছে দিনের আলো। কোনো তারা নেই, শুধু শিশের মতো আকাশ, এখনও ভোরের রোদে স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠেনি; শুধু এক আঁধার আলো, যেন দিন আর আসবে না, যেন রাত নেমে পড়ছে আবার।

বাইরে পাতিওতে পায়ের শব্দ আনাগোনা করছে, আনাগোনা করছে, আর

চাপা স্বর, শোর। তার এখানে, সেই স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে ছায়ায়, শরীরটা দিয়ে যেন আটকে রাখছে দিন, তার হাতের ফাঁক দিয়ে চিলতে আকাশটাকে উঁকি দিতে দিচ্ছে শুধু, আর তার পায়ের কাছে আলোর ফোঁটা ঝ'রে পড়ছে, যেন-তার পায়ের তলার মাটিতে চোখের জল ছেটানো। আর আবার বিলাপ, নরম, কিন্তু ধারালো, আর শুধু দুঃখ—যেটা তার শরীরটা দোমড়াচ্ছে।

'ওরা তোর বাবাকে মেরে ফেলেছে!'

'আর তোমাকে কে মেরেছে, মা?'

...

'আছে হাওয়া, আছে রোদ। আছে হালকা শাদা মেঘ। আছে নীল এক আকাশ, আর হয়তো গানও আছে তার ওপাশে, আর মধুরতর গলার স্বর... এক কথায়, আশা আছে। আশা আছে আমাদের দুঃখশোকে।

'কিন্তু তা তোমার জন্যে নয়, মিগেল পারামো। তুমি মরেছো পাপ ক'রে, পাপের মধ্যে, আর কখনও তুমি ঈশ্বরের করুণা পাবে না।'

পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া লাশটার পাশ থেকে ফিরে মৃতের সৎকারের আচারকথা বললেন। তাড়াহুড়ো ক'রে শেষ করলেন সব, যাতে গির্জের যারা আসছে তাদের খ্রীস্টপ্রসাদ না-দিয়েই চ'লে যেতে পারেন।

'পাদ্রে, আমরা চাই আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন।'

'না।' তিনি মাথা নাড়লেন। 'আমি তা করবো না। ও পাপী ছিলো। ও স্বর্গধামে যেতে পারবে না, যদি আমি ওর হ'য়ে কথা কইতে যাই তবে ঈশ্বর আমারই ওপর রুষ্ট হবেন।'

এ-কথা যখন বলছেন, তখন দু-হাত জোড় ক'রে রেখেছেন তিনি, যাতে তাদের কাঁপুনি দেখা না-যায়।

তবু দেখা যাচ্ছিলো।

মৃতদেহটা ভারি হ'য়ে চেপে বসেছিলো সমবেত সকলের আত্মায়। গির্জের ঠিক মাঝখানে পাটাতনটার ওপর সেটা শোয়ানো, ফুল আর নতুন মোমে ঘেরা। কাছে, একা-একা, তার বাবা, অপেক্ষা করছেন কখন শেষ হয় অন্ত্যেষ্টি।

পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া পেদ্রো পারামোর কাছ ঘেঁষে গেলেন, সন্তর্পণে, যাতে তার কাঁধের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি না-হয়। দিব্য জল তুলে তিনি মসৃণ ভঙ্গিতে ওপর-

নিচে ছিটিয়ে দিলেন, যখন তার মুখ দিয়ে গুনগুন স্বর বেরিয়ে আসছিলো তা প্রার্থনাও হ'তে পারতো। তারপর বসলেন হাঁটু গেড়ে, আর তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই হাঁটু গেড়ে বসলো।

'প্রভু, তোমার দাসের প্রতি কৃপা কোরো।

'যেন সে শান্তিতে বিশ্রাম করে, আমেন।' সাড়া দিলে অন্যসব স্বর।

যখন সে বুঝতে পারলে যে তার রাগটা আবার ফুঁসে উঠেছে, সে দেখতে পেলে যে মিগেল পারামোর দেহ নিয়ে সবাই গির্জে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।

পেদ্রো পারামো তাঁর কাছে এসে তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। 'আমি জানি আপনি ওকে ঘৃণা করতেন, পাদ্রে। সেজন্যে আমি আপনাকে দোষ দিই না। ওরা বলে আমার ছেলেই নাকি আপনার ভাইকে খুন করেছিলো। আপনার বিশ্বাস সে-ই হয়তো আপনার ভাইঝির কৌমার্য হরণ করেছিলো। আর মাঝে-মাঝে সে অসম্মানও করতো আপনাকে, এমনকী তাতিয়েও দিতো। যে-কেউ স্বীকার করবে যে এ-সবই যোগ্য কারণ। কিন্তু এখন ও-সমস্তই ভুলে যান, পাদ্রে। ক্ষমা করুন ওকে—ঈশ্বর হয়তো এর মধ্যেই ওকে ক্ষমা করেছেন।'

একমুঠো সোনার মুদ্রা বেঞ্চে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। 'গির্জের জন্যে নিবেদন হিশেবে একে গ্রহণ করুন।'

গির্জের ভেতরটা ফাঁকা। দরজার পাশে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পেদ্রো পারামোর জন্যে। সে তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে, একসঙ্গে সবাই অনুসরণ করলো কফিনটা, মেদিয়া লুনার চারজন লোকের কাঁধে চাপানো।

পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া একটা-একটা ক'রে মুদ্রাগুলো তুলে নিলেন, তারপর বেদির দিকে এগিয়ে গেলেন।

'এগুলো তোমার,' তিনি বললেন। 'মুক্তি কিনে নেবার মতো অর্থ ওর আছে, আর তুমিই জানো এ তার ঠিক দাম কি না। তবে আমার কথা যদি ধরো, প্রভু, আমি এখানে তোমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছি ন্যায়বিচারের আবেদন নিয়ে—ন্যায়বিচার কিংবা অপবিচার—যেহেতু আমাদের দায় শুধু প্রার্থনা করাই…

'আমার কথা যদি শোনো, প্রভু, ওকে তুমি জাহান্নমে পাঠিয়ে দাও।' গির্জের পোশাক পাত্র ইত্যাদি রাখার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি, ব'সে পড়লেন এককোণায়, লজ্জায় অপমানে দুঃখে অধোবদন, বিলাপময়। যতক্ষণ-না তাঁর সব অশ্রু শেষ হ'য়ে গেলো।

'ভালোই হলো, প্রভু···তোমারই জিত,' তিনি বললেন

···

রাত্রে খাবার সময় অভ্যাসমতো তিনি তাঁর চকোলেট পান করলেন। এখন তাঁর ভেতরটা শান্ত লাগছে।

'জানো, আনা, জানো আজ কাকে গোর দেয়া হ'লো?'

'না, কাকা।'

'মিগেল পারামোকে তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, কাকা।'

'ঐ মিগেলকে।'

আনা তার মাথা নোয়ালো।

'ঠিক জানো, আনা, সে-ই তোমাকে···'

'ঠিক জানি না, কাকা···আমি তার মুখ দেখিনি। সে রাত্রে এসেছিলো।'

'তাহ'লে জানলে কী ক'রে যে মিগেল পারামোই ছিলো—'

'কারণ ও বলেছিলো, "আমি মিগেল পারামো, আনা। ভয় পেয়ো না।" শুধু এই কথাই ও বলেছিলো।'

'কিন্তু তুমি তো জানতে সে তোমার বাবাকে খুন করেছিলো, জানতে না?'

'জানতাম, কাকা।'

'তাহ'লে ওর কাছ থেকে স'রে যাবার জন্যে তুমি কী করেছিলে?'

'কিছুই করিনি।'

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ, শুনতে পেলেন উষ্ণ হাওয়া মার্টল পাতাকে সরসর ক'রে দোলাচ্ছে।

'ও বলেছিলো ও আমার কাছে ক্ষমা চাইতেই শুধু এসেছে। বিছানা ছেড়ে না-উঠেই আমি বলেছিলাম, "জানলা খোলা আছে।" আর সে ভেতরে এসেছিলো।

'তারপর ও আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো, যেন ও যা করেছে তার জন্যে এইভাবেই ওকে ক্ষমা করবো। মৃদু হেসেছিলাম আমি, কারণ আমার মনে প'ড়ে গিয়েছিলো তুমি আমাকে কী শিখিয়েছিলে। যে আমরা যেন কাউকেই ঘৃণা না-করি। আমি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিলাম, যাতে সে তা জানতে পায়, কিন্তু তখনই আমার মনে প'ড়ে গিয়েছিলো যে অন্ধকারে ও আমায় দেখতেই

পাবে না—আমি যেমন তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি শুধু তাকে টের পাচ্ছিলাম আমার ওপর, আর তারপর ও আমার সঙ্গে খারাপ কাজগুলো করতে শুরু করলো।

'ভেবেছিলাম ও বুঝি আমায় মেরেই ফেলবে।' আমি শুধু তাই ভেবেছিলাম, কাকা। ও আমাকে খুন করবার আগেই আমি ম'রে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি—আর সেও সাহস পায়নি ব'লেই মনে হয়। এটা জানতে পেলাম যখন আমি চোখ খুলে দেখলাম খোলা জানলা দিয়ে রোদ এসে ঢুকছে। তার আগে, ভেবেছিলাম, আমি বুঝি ম'রে গিয়েছি।'

'কিন্তু তোমায় তো ঠিক ক'রে জানতে হবে। ওর গলা…ওর গলা শুনে তুমি চিনতে পারোনি?'

'আমি ওকে কিছু থেকেই চিনতাম না। শুধু জানতাম যে ও আমার বাবাকে খুন করেছে। এর আগে আমি ওকে কখনও চোখেই দেখিনি, কাকা, পরেও আর-কখনও দেখিনি।'

'কিন্তু ও কে তুমি জানতে?'

'হ্যাঁ। যদি ও-ই হ'য়ে থাকে, তবে সে এখন নরকের অধমতম কুণ্ডে আছে। তাই যাতে থাকে সেই জন্যে আমি আমার সারা প্রাণমন দিয়ে সন্তদের কাছে এই শাস্তিটা ভিক্ষা করেছিলাম।'

'অতটা নিশ্চিত হ'য়ো না, বাছা। তুমি তো জানো না কত লোকে ওর জন্যে প্রার্থনা করছে, আর তুমি তো একা শুধু…হাজার লোকের বিরুদ্ধে তোমার একার প্রার্থনা। আর তাদের কেউ-কেউ তোমার চেয়ে শক্তিমান, যেমন ওর বাপটা।'

তিনি তাকে বলতে চাচ্ছিলেন, 'তাছাড়া, এর মধ্যেই আমি ওকে ক্ষমা করেছি।' কিন্তু তিনি শুধু মনে-মনেই ভেবেছিলেন কথাটা। তার ভাঙাচোরা আত্মাটাকে আর জখম করতে চাননি তিনি। বরং, তার হাত ধ'রে তিনি বললেন, 'যে-পৃথিবীতে ও এত অনিষ্ট ঘটিয়েছে সেখান থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, এসো, ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ দিই। ও যদি স্বর্গে এখন প্রভুর সঙ্গেও থাকে তাতে কিছুই এসে যায় না।'

চৌরাস্তা পেরিয়ে গেলো একটা ঘোড়া জোরকদম, যেখানে বড়ো রাস্তাটা

গিয়ে পড়েছে কোন্‌ৎলার রাস্তায়। কেউ তাকে ছাখেনি। তবু, এক স্ত্রীলোক, মুসে অপেক্ষা করছিলো শহরের কিনারটায়, এসে জানালে যে সে দেখেছে ঘোড়াটা তার পাগুলো এমনভাবে জুড়ে দুমড়ে ছুটছিলো যে মনে হচ্ছিলো বুঝি এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়বে। মিগেল পারামোর পাটকিলে রঙের ফুটফুট ঘোড়া ব'লে সে চিনতে পেরেছিলো ঘোড়াটাকে, ভেবেছিলো: 'জানোয়ারটা মাথার খুলি ফাটিয়ে মরবে এক্ষুনি।' তারপরেই সে দেখেছিলো ঘোড়াটা সটান খাড়া হ'য়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে ছুটছে—যেন বিষম ভয় পেয়েছিলো রাস্তায়, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে এমন পড়িমরি ছুটছে।

তার গল্প গিয়ে মেদিয়া লুনায় পৌঁছুলো অন্ত্যেষ্টির দিন রাত্রে, লোকে যখন কবরখানা থেকে দীর্ঘপথটা পেরিয়ে এসে বিশ্রাম করছে। তারা তখন নানা কথা বলাবলি করছিলো, ঘুমোতে যাবার আগে লোকে যেমনভাবে এ-কথা সে-কথা আলোচনা করে।

'এই মৃত্যুটা আমাকে সত্যি জখম ক'রে গিয়েছে,' তেরেন্‌সিয়ো লুবিয়ানেস বললে, 'এখনও কাঁধে ব্যথা করছে।'

'আমারও,' তার ভাই উবিইয়াদো বললে। 'আর আমার পায়ের কড়াটা এখন আগের চাইতে দু-গুণ বড়ো। কিন্তু কর্তা আমাদের জুতো পরতে বাধ্য করলেন···আর এ কিনা ছুটির দিনও নয়। ঠিক বলছি না, তোরিবিয়ো?'

'কে কী বলে তার তোয়াক্কা করি না, ঠিক সময়েই মরেছে ও।'

একটু পরে, শেষ ওয়াগনের সঙ্গে, কোন্‌ৎলা থেকে আরো খবর এসে পৌঁছুলো।

'ওরা বলছে ওর ভূত নাকি এখনও ওখানে ঘোরাঘুরি করছে। ঐ যে কী মাসি, দেখেছে তার জানলায় গিয়ে নাকি টোকা দিচ্ছে। হুবহু ওর মতো দেখতে, আঁচিল জড়ুল এবং সবকিছু সমেত, অবিকল একরকম।'

'কী মনে হয়? দোন পেদ্রো ও'র ছেলেটাকে বেশ্যাগুলোর পেছনে ছুটতে দেবেন? ও'র ঐ মেজাজ নিয়ে নয়। খবর পেলে কী বলবেন তা আমি ঠিক নিজের কানে শুনতে পাচ্ছি: বলবেন, "ছাখো, এখন তুমি ম'রে গিয়েছো। কাজেই কবরই তোমার জায়গা, ওখানেই থাকো, এ-সব কাজকারবার আমাদের হাতেই ছেড়ে দাও।" আর যদি তাকে জ্যান্ত ঘোরাফেরা করতে ছাখেন, তবে সটান তাকে আবার কবরে পাঠিয়ে দেবেন।'

'ঠিক বলেছো, ইসাইয়াস। বুড়ো ভাম কোনো লটরপটর সইবে না।'

তারা খ'সে পড়ছিলো। এমনভাবে, যেন আকাশ আগুন ঝরাচ্ছে।

'দ্যাখো-দ্যাখো,' তেরেনসিয়ো বললে, 'কী দারুণ আতশবাজি!'

'কারণ ওরা মিগেলের জন্যে মচ্ছব করছে,' বললে হেমুস।

'এ কোনো খারাপ লক্ষণ নয়।'

'কেন?'

'হয়তো তোমার বোন চাচ্ছে ও আবার ফিরে আসুক।'

'কার সঙ্গে কথা বলছো, শুনি?'

'তোমার।'

'চলো, চলো। বেজায় খেটেছি সবাই, প্রায় তো ভোর হ'য়ে এলো।'

আর তারা ছায়ার মতো মিলিয়ে গেলো।

তবু কে-একজন চেঁচিয়ে বললে: 'তোর বোনকে বলিস না-কাঁদতে—আমি তো আছি, সবসময়।'

'তোর বোনকেও আমার আহ্লাদ জানাস।'

সত্যি, তারা খ'সে পড়ছিলো। এক-এক ক'রে কোন্‌ৎলার আলো নিভে যেতেই আকাশ রাত্রির দখল নিয়ে নিলে।

পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া তাঁর বিছানায় পাশ ফিরলেন, কিছুতেই ঘুমোতে পারছেন না। যা-কিছু হ'লো, সব আমারই দোষ—নিজেকে তিনি বললেন। ধনীদের চটাতে ভয় পাই। কারণ তারাই আমার রুজিরোজগারের উপায়। গরিবদের কাছ থেকে কখনও কিছু পাই না। আর জপতপ কখনও তোমার পেট ভরায় না। এইভাবেই চলে এসেছে অ্যাদ্দিন। আর এ-সব এখন তারই ফল। আমারই দোষ। আমাকে যারা ভালোবাসে তাদের কারুই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখিনি, অথচ ওরা এখনও আমায় বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের কাছে তাদের মধ্যস্থ হ'য়ে কথা বলতে বলে। কিন্তু এই বিশ্বাসের বদলে তারা কী পেলো? স্বর্গের চাবি? আত্মার নিষ্কাশ? কেনই বা তারা আত্মাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করবে যদি শেষ মুহূর্তে…এখনও আমি মারিয়া দিয়াদাকে দেখতে পাই, যখন সে এসে জিগেশ করেছিলো তার বোন এদুভিহেসকে আমি বাঁচাবো কি না:

'সবসময়েই ও অন্য মানুষের সেবা ক'রে চলেছে। নিজের যা-কিছু আছে সব সে ওদের দিয়ে দিয়েছে। তাদের ও ছেলে দিয়েছে এমনকী, তাদের সবাইকে। ও তাদের দেখিয়েছে বাচ্চাদের নিজের ছেলেদের যাতে তারা

নিজেদের ছেলে ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়, কিন্তু তারা স্বীকারই করবে না। নিজের ছেলেপুলেকে বলেছে, "সেক্ষেত্রে আমি তোদের বাপও, যদিও আমি তোদের মা।" সবাই তার সুযোগ নিয়েছে, যেহেতু ও মানুষ ভালো, যেহেতু কাউকে চটাতে বা কারু সঙ্গে ঝগড়া করতে ও চায় না।'

'কিন্তু ও আত্মহত্যা করেছে। সেটা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।'

'আর-কিছুই তার করার ছিলো না···আর সে যে আত্মহত্যা করেছে তারও কারণ সে মানুষটা ভালো ছিলো।

' "শেষ মুহূর্তে তুমি হেরে গেলে," আমি তাকে বলেছি, "একেবারে শেষ মুহূর্তে।" মোক্ষের জন্যে অত-সব ভালো-ভালো কাজ জমিয়ে রেখেছিলে—আর শেষটায় সব কিনা ছুঁড়ে ফেলে দিলে!"

'কিন্তু ও তো ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। সে মরেছিলো দুঃখেতাপে জরোজরো। আর শোক···তুমি আমাদের শোক সম্বন্ধে বেশকিছু কথা বলেছো, পাদ্রে, তবে সব কথা আমার ম'নে নেই। ঐ ভাবেই ও মরেছে, রক্ত ওর দমবন্ধ ক'রে দিয়েছে—খাবি খাইয়েছে। এখনও তার মুখচোখের ভাব আমি দেখতে পাই। এমন হতাশ হায়-হায় মুখের ভাব আর কোনো মানুষের কোনোদিনও ছিলো না।

'হয়তো অনেক প্রার্থনা করলে···পাদ্রে, এসো, আমরা অনেক প্রার্থনা করি। আমি বলেছি "হয়তো"। হয়তো গ্রেগরীয় খ্রীস্টযাগের ব্যবস্থা করলে আমরা···তবে তার জন্যে অনেক সহায়-সাবুদ চাই, পুরুৎদের ডেকে পাঠাতে হবে—তাতে বিস্তর খরচ।'

ঐ যে, ওখানে, আমার চোখের সামনে, মারিয়া দিয়াদা, অনেক ছেলেপুলের মা।

'আমার কোনো পয়সাকড়ি নেই। আপনি তা জানেন, পাদ্রে।'

'যা যেমন আছে তেমনি থাকুক। বরং ঈশ্বরেই আস্থা রাখি আমরা।'

'হ্যাঁ, পাদ্রে।'

কী খরচ হ'তো ক্ষমা মঞ্জুর করলে, যখন দু-একটা কথা বিড়বিড় ক'রে বকা যেতো অনায়াসেই, কিংবা একশো কথাই, যদি কোনো আত্মার মুক্তির জন্যে তা জরুরি হয়? স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে, সত্যি, কীই বা জানেন তিনি? তবু, তিনি জানেন, স্বর্গে যাবার যোগ্য দাবিদার কে। এক নামহারা গ্রামে হারিয়ে গেছেন তিনি, তবু তিনি জানেন। তাঁর এক ফর্দ আছে। ক্যাথলিক ধর্মমতের যাবতীয়

সন্তদের নামগুলো আউড়ে যেতে লাগলেন তিনি, জপ শুরু করলেন সেদিনকার সন্তদের নাম গোড়ায় ক'রে নিয়ে : 'সান্তা স্থনিলোনা, কুমারী ও শহিদ ; সান্তাস সালোমে, বিধবা, আলোদিয়া—কিংবা এলোদিয়া, আর মুলিনা, সবাই কুমারী ; কোর্বুলা আর দোনাতো।' জপ ক'রেই চললেন তিনি। বিছানার একপাশে ব'সে থেকে-থেকে তাঁর ঢুলুনি এলো। 'সন্তদের নাম শুনছি আমি, যেন শুনে যাচ্ছি ভেড়ার পাল।'

বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি, আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশে তারা বৃষ্টি হচ্ছে। মন খারাপ হ'য়ে গেলো তাঁর। কারণ তিনি শান্ত এক আকাশ দেখতে চেয়েছিলেন। শুনতে পেলেন মোরগের ডাক, অমুভব করলেন রাত্রির কাফন পৃথিবী ঢেকে দিচ্ছে।

পৃথিবী, 'অশ্রুর এই উপত্যকা'।

...

'তুমি অনেক ভালো আছো, বাছা,' এন্থভিহেস দিয়াদা আমায় বললে, 'অনেক ভালো আছো।'

এতক্ষণে অনেক রাত হয়েছে। কোণার বাতিটা মিইয়ে আসছে ক্রমেই, তারপর একসময় দপ-দপ ক'রে নিভে গেলো।

শুনতে পেলাম সে উঠে পড়লো, ভেবেছিলাম বুঝি আরেকটা বাতি নিয়ে আসতে যাচ্ছে। শুনতে পেলাম তার পায়ের শব্দ দূরে চ'লে যাচ্ছে। তার জন্যে আমি অপেক্ষা ক'রে রইলাম।

সে ফিরে এলো না ; একটু পরে আমিও উঠে পড়লাম। আস্তে-আস্তে খাটো-খাটো পা ফেলে হাঁটলাম, অন্ধকারে রাস্তা চিনে ফিরে এলাম আমার ঘরে। মেঝেয় ব'সে পড়লাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ঘুম আসে।

ঘুমোলাম আমি, তবে ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুম।

এই রকমই এক আধো-জাগায় আমি শুনতে পেলাম হাঁকটা। কোনো মাতাল এমনভাবে হাঁক দেয় : 'যাক, গোল্লায় যাক বাঁচন !'

আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম, কারণ আওয়াজটা এতই জোর হ'লো যেন আমারই কানের মধ্যে। হাঁকটা রাস্তা থেকেও আসতে পারে, তবে আমি টের পেলাম ভেতর থেকে আওয়াজ উঠছে, আমার ঘরের দেয়ালটার পাশেই। কিন্তু

তারপরেই আর-কিছু না, শুধু এক পতঙ্গের চঞ্চল দাপাদাপি আর স্তব্ধতার মর্মরধ্বনি।

ঐ হাঁকটা যে কত গভীর স্তব্ধতা সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে, তা আন্দাজ করাই মুশকিল ছিলো। যেন হাওয়া বার ক'রে দেয়া হয়েছে পৃথিবী থেকে। কোনো শব্দ নেই, না আমার নিশ্বাসের শব্দ, না আমার বুকের ধ্বক-ধ্বক। আর যখন মুহূর্তটা কেটে গেলো, আমি যখন শান্ত হবো-হবো, হাঁকটা ফিরে এলো আবার, আর অনেকক্ষণ রইলো তার রেশ: 'লাথি মারতে দাও আমায়! তুমি আমার গলায় দড়ি দিতে পারো, তবু আমায় লাথি মারতে দাও!'

আচমকা দরজাটা খুলে গেলো।

'দোনিয়া এহুভিহেস নাকি?' আমি জিগেশ করলাম, 'কী হচ্ছে বলুন তো? ভয় পেয়েছেন?'

'আমার নাম এহুভিহেস নয়, আমি দামিয়ানা। জানতাম তুমি এখানে আছো, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তোমাকে আমার বাড়িতে শুতে যাবার নেমন্তন্ন করতে এসেছি আমি। ওখানে তুমি অনেক ভালো ঘুমোতে পারবে।'

'দামিয়ানা সিস্‌নেরোস? আপনি মেদিয়া লুনায় থাকতেন না?'

'সেখানেই তো থাকি। সেইজন্যেই তো এখানে আসতে অতক্ষণ লাগলো।'

'মা একজন দামিয়ানার কথা বলেছিলেন আমায়, যখন বাচ্চা ছিলাম আমার দেখাশুনো করতেন। আপনিই কি ...'

'হ্যাঁ, আমিই। তোমার প্রথম চোখ ফোটার সময় থেকে তোমাকে আমি চিনি।'

'আপনার সঙ্গেই আমি যাবো। এত হাঁকডাকের মধ্যে এখানে আমার ঘুম আসছে না। শোনেননি কী-সব হচ্ছে এখানে, দাপাদাপি? যেন ওরা কাউকে খুন করছে।'

'হয়তো কোনো প্রতিধ্বনি হবে, এখানে তালাবন্ধ হ'য়ে ছিলো। ওরা তোরিবিয়ো আল্‌দ্রেতেকে এই ঘরেই ফাঁসি দিয়েছিলো, অনেক দিন আগে। তারপর তারা ঘরদোর বন্ধ ক'রে চ'লে যায়। শুকিয়ে যেতে দেয় ওর শরীর, যাতে কোনোদিনই আর বিশ্রাম না পায়। তুমি কেমন ক'রে এ-ঘরে ঢুকলে বুঝতে পারছি না—এই দরজার তো কোনো চাবিই নেই।'

'দোনিয়া এহুভিহেস দরজা খুলে দিলেন। বললেন, শুধু এ-ঘরটাই আমায় উনি দিতে পারেন।'

'এস্থভিহেস দিয়াদা ?'

'হ্যা।'

'বেচারি এস্থভিহেস। তাহ'লে সে নিশ্চয়ই এখনও খুব কষ্ট পাচ্ছে।'

…

'আমি, ফুলহোর সেদানো. বয়েস ৫৪, অবিবাহিত, পেশা নায়েবি, মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা ও চালাইবার অধিকার আছে, নিম্নোক্ত অভিযোগ দায়ের ও সপ্রমাণ করিতেছি…'

তোরিবিয়ো আল্‌দ্রেতের বিরুদ্ধে দাবি পেশ করার সময় এই কথাই সে বলেছিলো। আর শেষ করেছিলো এই ব'লে: 'অভিযোগের মূল বিষয় হইল উপস্বত্বভোগের অধিকার।'

'কেউ বলতে পারবে না আপনি সাচ্চা লোক নন, দোন ফুলহোর। আমি জানি আপনি যা দাবি করছেন. তাই আদায় ক'রে নিতে পারবেন। তা শুধু এইজন্যে নয় যে আপনার পেছনে কর্তৃপক্ষ আছেন। কারণ আপনি সাচ্চা লোক, সত্যিকার মরদ, পুরুষমানুষ, তাই।'

দোন ফুলহোর সায় দিলে। নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবার পর সেটা নিয়ে ফুর্তি ক'রে উৎসব করার জন্যে তারা যখন মাতাল হ'য়ে যেতে শুরু করেছে, প্রথম যে-কথাটা আল্‌দ্রেতে তাকে বললে, তা এই: 'এই কাগজটা দিয়েই আমরা রক্ষাকবচ পেলাম দোন ফুলহোর, কারণ অন্যকিছুর বেলায় এটা কোনো কাজেই লাগবে না। আপনি সেটা জানেন। আপনাকে যে-কাজ করতে পাঠানো হয়েছিলো, আপনি সেটা পালন করেছেন, ব্যস, আর-কিছুর সঙ্গে আপনার কোনো যোগ নেই… আর আপনি আমাকে ফ্যাসাদটা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। গোড়ায় অবশ্য আপনি আমায় ভাবিয়েই তুলেছিলেন। এখন যখন আমি জানি মোদ্দা ব্যাপারটা কী, আমার হাসি পাচ্ছে। বলছে, "উপস্বত্বভোগ।" অতটা অশিক্ষিত ও হাবাগোবা আপনার কর্তা যে তার লজ্জিত হওয়া উচিত।'

দোন ফুলহোর সায় দিলে। তারা ছিলো এস্থভিহেস দিয়াদার মেসবাড়িতে, আর সে তাকে শুধোলে: 'শোনো, ভিহেস, তোমার কোণার ঘরটা আমায় ব্যবহার করতে দেবে?'

'যে-ঘর চান, দোন ফুলহোর। ইচ্ছে করলে সব ক-টা ঘরই ব্যবহার করতে পারেন। আপনার লোকজনেরা আজ রাত্তিরে এখানে ঘুমোবে বুঝি?'

'না, শুধু একজন। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমাদের নিয়ে ভেবো না। শুধু চাবিটা রেখে যেয়ো।'

'কাজেই আপনাকে আমি সেই কথাই বলছি, দোন ফুলহোর,' তোরিবিয়ো আল্‌ব্রেতে বললে: 'কেউ বলতে পারবে না আপনি সাচ্চা আদমি নন। কিন্তু ঐ যে বাঙ্কোৎটা আপনার কর্তা, তাকে আমি মোটেই সইতে পারি না।'

দোন ফুলহোর সায় দিলে। তাকে শুধু শেষবার এই অর্থপূর্ণ বাক্যটা বলতে শুনেছিলো সে, কারণ পরে তোরিবিয়ো ভীরু কাপুরুষের মতো ব্যবহার করেছিলো, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার। তাকে সে বললে: 'যে-কর্তৃত্বভার আমার ওপর দেয়া হয়েছে, এঃ? বেশ, তাহ'লে, এখন!'

তার চাবুকের বাঁটটা দিয়ে সে পেদ্রো পারামোর বাড়ির দরজায় ঘা দিলে। মনে প'ড়ে গেলো প্রথম যখন এ-দরজায় ঘা দিয়েছিলো, দু-হপ্তা আগে। বেশ-কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো তাকে, ঠিক যেমন তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো প্রথমবার। আবারও দেখতে পেলো দরজার ওপর কালো কাপড়টা ঝুলছে। কিন্তু আগে সে বিড়বিড় করেছিলো আপনার মনে, 'হুম, ওরা আরেকটা কাপড় টাঙিয়েছে। প্রথমটা তো প্রায় রং-চটা, ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছে। নতুনটা দেখি রেশমের মতো ঝিলিক দিচ্ছে...যদিও এটা নেহাৎই রং-করা একটা তেনা।'

প্রথমবার, তাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিলো যে ভেবেছিলো বাড়িতে বুঝি কেউ নেই। যেই সে ফিরে যাবে ব'লে পা বাড়িয়েছে, ঠিক তখনই পেদ্রো পারামো স্ব-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলো।

এই দ্বিতীয়বার সে তাকে দেখছে। প্রথমবার পেদ্রো ছিলো নেহাৎই বাচ্চা। এখন, এইবার। প্রায় বলতে পারো এটাই প্রথমবার। ফল হ'লো এই যে তার সঙ্গে সে এমন ভাবে কথা বললে যেন তারা সমান-সমান। লম্বা-লম্বা পা ফেলে তার পেছন-পেছন সে বলতে-বলতে গেলো: 'কী যে কী, তা চট ক'রেই টের পেয়ে যাবেন। বুঝবেন, আমি কেন এখানে এসেছি।'

'বসুন, ফুলহোর। এখানে আমরা নিরুপদ্রবে আলাপ করতে পারবো।'

পেছনের উঠোনে এসে পড়েছিলো। পেদ্রো পারামো একটা বাক্সের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। 'বসছেন না কেন আপনি?'

'আমি বরং দাঁড়িয়েই থাকি, পেদ্রো।'

'যা আপনার ইচ্ছে। তবে "দোন" বলতে ভুলবেন না।'

এই ছোকরা কে বটে যে তার সঙ্গে এমন চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলছে? এর বাপ, দোন লুকাস পারামো, কখনও তাকে এভাবে অপমান করেনি, আর এখন এই চ্যাংড়া, পেদ্রো, মেদিয়া লুনা সম্বন্ধে বিলকুল কোনো জ্ঞান যার নেই, কেমন-ভাবে তার কাজকারবার চলে সে-সম্বন্ধে যার কোনো ধারণাই নেই, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন সে কোনো চাষাভুষো, তার জমিতে কাজ করে।

'কেমন চলছে সব?'

সে ভাবলে এতক্ষণে সুযোগ এসেছে। 'এবার আমার পালা,' নিজেকে সে বললে।

'খারাপ, খুব খারাপ। কিছুই আর বাকি নেই। শেষ পশুটাকে অব্দি আমরা বেচে দিয়েছি।'

পকেট থেকে কাগজপত্র বার ক'রে তাকে সে যেই বলতে যাবে দেনার পরিমাণ কত, যেই বলবে, 'এই হ'লো আমাদের দেনা,' পেদ্রো পারামো তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে:

'কার কাছে আমাদের অত ধার? কত জানতে চাই না, শুধু কার কাছে?'

সে নামের ফর্দ দেখে-দেখে নামগুলো আওড়ালো। 'দেনা শোধবার মতো কিছুই আমাদের নেই। সেটাই হয়েছে ঝামেলা।'

'কেন?'

'কারণ আপনার বাড়ির লোক সব খরচ ক'রে ফেলেছে। তারা শুধু নিয়েছে, শুধুই নিয়েছে, ফিরিয়ে দেয়নি কিছুই। নিজেকে আমি বলতাম, "একদিন এরা সবশুদ্ধু নিয়ে নেবে।" তা নিয়ে নিয়েছে বৈ কি। যদিও অনেকেই জমিটা নিয়ে নিতে রাজি, তারা দেবে-থোবেও ভালো, ভালোই দাম দেবে, সে-টাকায় দেনাও শোধ করা যাবে, তারপরেও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যাবে—অবশ্য বেশি কিছু নয়।'

'আপনি কিনছেন না তো?'

'আমি কিনবো কী ক'রে? তা কি সম্ভব নাকি?'

'কাল থেকে আমরা কাজে লেগে যাবো। প্রথমে প্রেসিয়াদো। বললেন না তাদের কাছেই আমরা সবচেয়ে বেশি ধারি?'

'হ্যাঁ। আর তাদেরই আমরা সবচেয়ে কম টাকা শোধ দিয়েছি। আপনার বাবা সবসময় ভাবতেন তাদেরই সবচেয়ে শেষে টাকা দেবেন। ওদের কে-একজন, বোধহয় মাতিল্‌দে, শহরে থাকতে গেছে, ঠিক কোথায়—গুয়াদালাহারা

না কোলিমা তা জানি না। আর লোলা—মানে দেনিয়া দোলোরেস...এখন সবকিছুর মালিক। জানেন তো এনমেদিও খামারটা। তাকেই আমাদের টাকা শুধতে হবে।'

'কাল লোলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়বেন।'

'সে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। আমি বুড়ো থুরথুরে।'

'আমার হ'য়ে প্রস্তাব করবেন। বলবেন যে আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি আর যখন সে-কথা বলতে যাবেন, পাদ্রে রেন্‌তেরিয়াকে বলবেন বিয়ের উদ্‌যোগ ক'রে রাখতে। কত টাকা আছে আপনার তহবিলে?'

'কিছুই নেই, দোন পেদ্রো।'

'তাহ'লে প্রতিশ্রুতি দেবেন। বলবেন টাকাটা পরে শোধ ক'রে দেয়া হবে। কোনো ঝামেলা হবে ব'লে মনে হয় না। কালকেই সব করুন।'

'আর তোরিবিয়ো আল্‌দ্রেতের কী হবে?'

'তার আবার কী হবে? আপনি তো প্রেসিয়াদো, ফ্রেহোসোস আর গুস্‌মানদের কথাই বললেন। আল্‌দ্রেতের ব্যাপারটা তাহ'লে কী?'

'জমির সীমা নিয়ে মামলা। ও বেড়া দিচ্ছে। আমাদেরও বেড়া দিতে বলছে—যাতে দুই জমি ভাগ ক'রে নেয়া যায়।'

'সেটা পরে করবেন···আর, সীমা নিয়ে ভাববেন না। কোনো বেড়া দেবার দরকার হবে না। আপনি পুরো ব্যাপারটা না-বুঝলেও, এটা মনে রাখবেন, ফুলহোর, জমি ভাগ হবে না। এখন এই লোলার ব্যাপারটা আগে ফয়সালা করুন। বসবেন না?'

'ধন্যবাদ, দোন পেদ্রো, বসবো। আপনার সঙ্গে কাজ করতে সত্যি ভালো লাগছে।'

'লোলাকে এ-কথা বলুন, সে-কথা বলুন, যা-খুশি বলুন, তবে বলুন যে আমি তাকে ভালোবাসি। সেটা জরুরি। আর এ-কথা সত্যিও বটে, সেদানো, আমি তাকে ভালোবাসি। তার ঐ চোখ দুটির জন্যে, জানেন। তো এই ব্যাপারটা কালকেই সারুন। নায়েব হিশেবে আপনার কাজের ভার আমি কমিয়ে দেবো। মেদিয়া লুনার ঝামেলাটা ভুলে যান।'

'ছোকরা এত-সব ধান্দাবাজি কোন শয়তানের কাছ থেকে শিখেছে?'

মেদিয়া লুনায় হেঁটে ফিরতে-ফিরতে নিজেকে শুধোচ্ছিলো ফুলহোর সেদানো। 'ছোঁড়ার কাছ থেকে কিছুই আশা করিনি আমি। "একেবারে অকম্মার ধাড়ি", ওর বাপ দোন লুকাস বলেছিলেন, "কুঁড়ের বাদশা।" আমিও বলেছিলাম যে ঠিকই বলছেন। "আমি মারা গেলে অন্য-কোথাও চাকরির খোঁজ কোরো, ফুলহোর।" "হ্যাঁ, দোন লুকাস।" "তোমাকে খোলাখুলি বলি, ফুলহোর, ওকে আমি সেমিনারিতে পাঠাবার কথা ভাবছিলাম—আমি মারা গেলে অন্তত তার গর্ভধারিণীর ভারটা যাতে নিতে পারে। কিন্তু এমনকী তাও ওর ধাতে সয়নি।" "আমার কপালে এত ঝুটঝামেলা থাকার কথা ছিলো না, দোন লুকাস।" "কিছুর জন্যেই ওর ওপর নির্ভর কোরো না। আমি বুড়ো হ'য়ে পড়ছি—হতভাগা তার নিজের বাপকেও কোনো সাহায্য করতে চায় না! আমাকে ও হতাশ করেছে, ফুলহোর।" "এ এক বিষম ব্যাপার, দোন লুকাস।" '

আর এখন কি না এই। মেদিয়া লুনার সঙ্গে আগে দোন পেদ্রোর কোনো মাথামাথি ছিলো না, চাক্ষুষ একবার দেখতেও যায়নি সম্পত্তিটা, অথচ এখন তার প্রতি কী দরদ, দিব্যি মেদিয়া লুনাকে ভালোবাসছে, বিলকুল, আস্ত মেদিয়া লুনাকেই। ঐ-সব ফাঁকা টিলাপাহাড় অ্যাদ্দিন ধ'রে চাষ করা হচ্ছে, অথচ এখনও অত ফসল ফলে। 'আবার তাহ'লে দিন ফিরলো,' নিজেকে বললে ফুলহোর, আসিয়েন্দের মস্ত ফটকটা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে চাবুকটা দিয়ে নিজের পা চাপড়ালে ফুলহোর।

দোলোরেসের মনে দাগ-কাটা ছিলো ভারি সহজ কাজ। তার চোখ দুটো চকচক ক'রে উঠেছিলো, সারা মুখে ফুটে উঠেছিলো উত্তেজনা।

'লজ্জায় রাঙা হবার জন্যে ক্ষমা করবেন, দোন ফুলহোর। দোন পেদ্রো কখনও আমায় খেয়াল ক'রে দেখেছেন ব'লেই আমার মনে হয়নি।'

'তোমার কথা ভেবে-ভেবে তিনি ঘুমোতেই পারেন না।'

'তা ওঁর তো বেছে নেবার সুযোগ আছে। কোমালায় কত সুন্দরী-সুন্দরী মেয়ে আছে। জানতে পেলে তারা কী বলবে?'

'উনি কেবল তোমার কথাই ভাবেন, দোলোরেস। আর কারু কথা ওঁর মনেই পড়ে না।'

'আপনি আমার সারা গায়ে কেবল ঠাণ্ডা কাঁপুনি আর জর জাগিয়ে দিচ্ছেন, দোন ফুলহোর। আমি স্বপ্নেও কখনও এ-কথা ভাবিনি।'

'চাপা লোক। মনের ভাব সবসময় চেপে রাখেন। দোন লুকাস—তাঁর আত্মা শান্তি পাক—ওঁকে বলেছিলেন তুমি ওর যোগ্য নও, সেইজন্যেই অ্যাদ্দিন মনের ভাব লুকিয়ে রেখেছিলেন, বাধ্য ছেলের মতো। এখন বাবা মারা গেছেন, আর তো কোনো বাধা নেই। নিজে-নিজে এটাই উনি প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন —অথচ আমার এত কাজের চাপ যে ওঁর প্রস্তাবটা নিয়ে আসতে একটু দেরি ক'রে ফেলেছি। তাহ'লে পরশুই বিয়ের দিন ঠিক ক'রে ফেলা যাক। ঠিক তো?'

'বড্ড তাড়াহুড়ো হ'য়ে যাচ্ছে না? আমার তো কিছুই তৈরি নেই! বিয়ের পোশাক, তৈজসপত্র কিনতে হবে, দিদিকে চিঠি লিখতে হবে···না, বরং লোক পাঠানোই ভালো। যাই হোক, আটই এপ্রিলের আগে আমি তৈরি হ'তে পারবো না। আজ হ'লো গিয়ে পয়লা। হ্যাঁ, আটই নাগাদ। ওঁকে বলুন আমাকে আরো ক-টা দিন হাতে দিতে।'

'উনি চাচ্ছিলেন বিয়েটা আজকেই হ'য়ে যাক। তুমি বিয়ের পোশাক-আশাক তৈজসের কথা ভাবছো? আমরাই সে-সব জোগাড় ক'রে দেবো। দোন পেদ্রোর স্বর্গগতা মা ভেবেছিলেন তাঁর ছেলের বৌ তাঁরই বিয়ের পোশাক পরবে। ওটাই ওঁদের বাড়ির দস্তুর।'

'কিন্তু তা ছাড়াও অন্য-সব ব্যাপার আছে। মেয়েলি ব্যাপার, জানেনই তো। আপনাকে সব কথা বলতে আমার লজ্জা করছে, দোন ফুলহোর। দেখুন, কেমন রাঙা হ'য়ে যাচ্ছি। এটা···এটা···মাসের সেই সময়···'

'তো কী? বিয়ে তো মাসের ক-টা তারিখ মাত্র নয়। এ হ'লো গিয়ে ভালোবাসার ব্যাপার। সবকিছুর চাইতেই অনেক বেশি জরুরি।'

'আপনি ঠিক বুঝছেন না, দোন ফুলহোর।'

'খুব বুঝছি। পরশুই বিয়ে হবে।'

আর ফুলহোর তাকে রেখে এলো হাত জোড় ক'রে অনুনয় করতে—অন্তত একটা হপ্তা সবুর করুন, মোটে একটা হপ্তাই সময় চাই।

'দোন পেদ্রোকে মনে করিয়ে দিতে ভুললে চলবে না···কী ধূর্ত এই পেদ্রো ছোঁড়া! জজকে বলেছে সবই ওর নামে হবে। "ওকে কালকেই জানিয়ে দিতে ভুলো না, ফুলহোর।"'

দোলোরেস জলের কলসি নিয়ে রান্নাঘরে ছুটলো জল গরম করতে। 'আজকেই যাতে বন্ধ হ'য়ে যায় তার চেষ্টা করবো। পারলে, আজ রাতেই। কিন্তু তা তো আর হবে না—তিন দিন ধ'রে চলবে। তার আর কোনো ছাড়ান নেই। হে ভগবান, কী সুখী লাগছে আমার! দোন পেদ্রোকে আমায় দেবার জন্যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, ভগবান!'

তারপর সে যোগ করলে: 'এমনকী পরে যদি আমাতে তার ক্লান্তি আসে, তবু।'

...

'আমি জিগেশ করেছি ওকে—ও তো এককথায় রাজি। অশৌচের দরুন বিয়েতে পুরুতের আপত্তি আছে, সেটা ভুলে যাবার জন্যে পুরুৎ ঘাট পেসো চাচ্ছে। আমি তাকে বলেছি যথাসময়ে তার দক্ষিণা দেয়া হবে। আরো বলে কি না বেদি সাজাবার জন্যেও টাকা লাগবে। আমি বলেছি, ঠিক আছে। তার খাবার টেবিলটা নাকি এত নড়বোড়ে যে-কোনো সময় ভেঙে পড়বে। আমি বলেছি, আমরা একটা নতুন টেবিল পাঠিয়ে দেবো। আরো বলে, আপনি নাকি কখনও খ্রিস্টযাগে যান না। আমি কথা দিয়েছি যে এখন থেকে যাবেন। শেষটায় বলে আপনার ঠাকুমা মারা যাবার পর থেকে আপনি নাকি গির্জেয় কোনো প্রণামী দেননি। আমি তাকে ও নিয়ে ভাবতে বারণ করেছি। ও কোনো সমস্যা হবে না।'

'দোলোরেসকে তুমি কিছু আগাম দিতে বলেছিলে?'

'না, পাত্রোন। ঠিক সাহস হয়নি। তাকে এত খুশি লাগছিলো যে আমি সব নষ্ট ক'রে দিতে চাইনি।'

''ফুলহোর, তুমি নেহাৎই ছেলেমানুষ।'

> ছেলেমানুষ? ধেৎ! বলে কী! আমার বয়েস পঞ্চান্ন। ছোঁড়া এখনও বাঁচতেই শুরু করেনি, আর আমি তো কবর থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে।

'তার খুশি নষ্ট ক'রে দিতে চাইনি আমি।'

'তাহ'লেও, তুমি ছেলেমানুষ আছো।'

'তা হবে, পাত্রোন।'

'এর পরে আল্‌দ্রেতের পালা। ওকে বলো যে ও ওর সীমানা পেরিয়েছে, মেদিয়া লুনার জমি দখল ক'রে বসেছে।'

'কিন্তু ও খুব সাবধানে সব জরিপ করেছে। আমার মনে হয় ও-ই ঠিক।'

'বলো যে ও ভুল করেছে, ঠিকমতো জরিপ করেনি। দরকার হ'লে বেড়া ক-টা উপড়ে ফ্যালো।'

'আর আইন?'

'কোন আইন, ফুলহোর? এখন থেকে আমরাই আইন তৈরি করবো। মেদিয়া লুনায় হট্টাকট্টা জোয়ান লোক আছে, যাদের বিশ্বাস করা যায়?'

'হ্যাঁ, তা আছে কয়েকজন।'

'আল্‌দ্রেতের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেয়ো। উপস্বত্বভোগ নিয়ে ওজর-আপত্তি তুলো, নালিশ কোরো, কিংবা যা-খুশি তোমার মনে হয় কোরো। আর মনে করিয়ে দিয়ো যে লুকাস পারামো এখন বেঁচে নেই। ওকে নতুন ক'রে আমার সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে।'

আকাশ এখনও নীল, কিছু হালকা মেঘ। ওপরে হাওয়া বইছে, কিন্তু নিচে শুধু খর উত্তাপ ছাড়া আর-কিছু নেই।

...

আবারও সে তার চাবুকের বাঁট দিয়ে দরজায় ঘা দিলে, শুধু জেদ দেখাবার জন্যে, এখন যখন সে জানে যে দোন পেদ্রোর মর্জি না-হ'লে ওরা দরজা খুলবে না। দরজার ওপরটায় তাকিয়ে আপন মনে সে বললে: 'কালো কাপড়টা চমৎকার মানিয়েছে—যা-ই হোক না কেন।'

সেই মুহূর্তে দরজা খুললো, আর সে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

'ফুলহোর, তোরিবিয়ো আল্‌দ্রেতের মামলাটা সামলেছো তো?'

'সব সামলানো হয়েছে, পাত্রোন।'

'এবার শুধু ফ্রেহোসোসদের মামলাটাই বাকি রইলো। তা সেটা একটু অপেক্ষা করতে পারে। এখন আমি আমার মধুচন্দ্রিকা নিয়ে দারুণ ব্যস্ত।'

...

গ্রামটা প্রতিধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে ভরা। হয়তো দেয়ালের ফাঁকে ফোকরে

কুলুঙ্গিতে বা পাথরের তলায় তারা ফাঁদে প'ড়ে গিয়েছে। রাস্তায় হাঁটার সময় তুমি অন্য পায়ের শব্দ শুনতে পাবে, শুনবে ফিশফিশ কথা, কাপড়ের খশখশ আর হাসি। পুরোনো সব হাসি, যেন অ্যাদ্দিনে তারা হাসতে-হাসতে ক্লান্ত হ'য়ে গিয়েছে। আর ব্যবহারে-ব্যবহারে জীর্ণ সব গলা। এই সমস্ত তুমি শুনতে পাবে। তবে মনে হয় একদিন সব আওয়াজ ম'রে যাবে।

এই কথাই আমাকে বলেছিলো দামিয়ানা সিস্‌নেরোস, যখন আমরা গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে এলাম।

'আমার সেই সময়টা মনে পড়ে যখন রাতের পর রাত আমি ফিয়েস্তার শোরগোল শুনতাম, এমনকী মেদিয়া লুনা থেকেও তা শুনতে পেতাম আমি। কী হচ্ছে দেখতে প্লাসায় চ'লে যেতাম, গিয়ে শুধু দেখতাম এখন যা দেখছি তাই, কিছুই না—একটা লোকও নেই কোথাও। রাস্তাগুলো সব ফাঁকা প'ড়ে আছে, ঠিক এখনকার মতো।

'তারপর সেইসব শব্দ কানে-আসা বন্ধ হ'লো একদিন। এমনকী সুখও একদিন ক্লান্ত হ'য়ে যায়। সেইজন্যেই আওয়াজ যখন বন্ধ হ'লো আমি মোটেই অবাক হইনি।

'হ্যাঁ, গ্রামটা প্রতিধ্বনিতে ভ'রে আছে। আর তা আমাকে ভয় পাওয়ায় না। শুনতে পাই কুকুর ডাকছে তেরিয়া—আমি তাদের ডাকতে দিই, কারণ আমি জানি আর-কোনো কুকুরই নেই এখানে। আর ঝড়ের দিনে শুনতে পাবে ঝোড়ো হাওয়া পাতা কাঁপাচ্ছে—কিন্তু তুমি খুব ভালো ক'রেই জানো যে আর কোনো গাছ নেই এখানে। এককালে এখানে নিশ্চয়ই অনেক গাছপালা ছিলো, নইলে পাতাগুলো আসবে কোত্থেকে?

'আর সবচেয়ে জঘন্য হ'লো যখন তুমি শোনো লোকজন কথা কইছে—যেন তাদের কথা ভেসে আসছে রাস্তার কোনো ফাটল দেয়ালের কোনো ফোকর থেকে—যদিও এত স্পষ্ট শোনাবে যে তুমি চিনতে পারবে কার গলা। এই-তো আজ রাতে আমি এক মৃতদেহের নিশিজাগরের মুখোমুখি পড়েছিলাম। তুকমন্তর বলবার জন্যে যখন থেমেছি আর যখন তা আওড়াচ্ছি, এক মেয়ে অন্যদের ছেড়ে আমার কাছে এসে বললে: "দামিয়ানা! আমার জন্যে প্রার্থনা কর, দামিয়ানা!"

'তার আলোয়ানটা খুললো সে, আর আমি দেখলাম আমার দিদি সিক্সতিনা!

' "তুই কী করছিস এখানে?" আমি তাকে শুধোলাম।

'অমনি সে অন্য মেয়েদের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

'তুমি জানবে না, তবে আমার দিদি সিক্সতিনা মারা গিয়েছিলো আমার বয়েস যখন বারো। ও-ই ছিলো সকলের বড়ো। সবশুদ্ধু ষোলো ভাইবোন আমরা—তবেই বুঝতে পারো কদ্দিন হ'লো ও মারা গিয়েছে। অথচ ছাখো, এখনও সে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই বলি, হুয়ান প্রেসিয়াদো, প্রতিধ্বনি, কথার রেশ এ সব শুনলে ভয় পেয়ো না।'

'আমার মা বুঝি তোমায় বলেছেন যে আমি আসছি?' আমি তাকে জিগেশ করলাম।

'না। কী হয়েছে তোর মায়ের?'

'মারা গেছেন,' আমি বললাম।

'ওঃ। কীসে?'

'জানি না ঠিক। হয়তো দুঃখে। সবসময় মা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।'

'খুব খারাপ। যতবার তুমি দীর্ঘশ্বাস ফ্যালো, ততবারই তোমার প্রাণ একটু-একটু ক'রে বেরিয়ে যায়। বেচারি বুঝি এইভাবেই মরলো?'

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম তুমি জানবে।'

'আমি জানবো কী ক'রে? সে যে কত বছর হ'লো আমি নতুন-কিছুই জানিনি।'

'তাহ'লে কী ক'রে জানলে যে আমি এখানে এসেছি?'

সে চুপ ক'রে রইলো।

'তুমি কি বেঁচে আছো, দামিয়ানা? আমাকে বলো, দামিয়ানা!'

হঠাৎ আমি আমাকে দেখতে পাই ঐ ফাঁকা রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িঘরের জানলা রাত্রির দিকে হাট ক'রে খোলা, ভেতর থেকে আগাছা উঁকি মারছে। দেয়ালগুলোর চলটা উঠে গেছে, এখানে দেখা যাচ্ছে পচা পোড়া ইট।

'দামিয়ানা! দামিয়ানা সিস্‌নেরোস!'

আর প্রতিধ্বনিরা আমার উত্তর দিলে: '...আনা···নেরোস!···আনা··· নেরোস!'

শুনতে পেলাম কুকুররা ঘেউ-ঘেউ করছে, যেন আমি তাদের জাগিয়ে দিয়েছি। দেখলাম একটা লোক হনহন ক'রে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে।

'এই-যে! শোনো!' আমি ডাক দিলাম।

'শোনো!' সে ফিরে ডাক দিলে। আমার নিজের গলায়।

আমি শুনতে পাচ্ছি চাপা গলায় মেয়েরা কেচ্ছা করছে, যেন তারা মোড়ের কাছেই আছে।

'ছাখো কে আসছে? ফিলোতেয়ো আরেচিসা না?'

'হ্যা। দেখিস, তোরা কী ভাবছিস তা ওকে টের পেতে দিস না।'

'চল, বাড়ি যাই। যদি আমাদের পেছন নেয়, তবে বুঝতে হবে আমাদের কাউকে ও চায়। কাকে চাচ্ছে রে?'

'তোকে।'

'আমার তো মনে হয় তোকে।'

'ছাখ-ছাখ, থেমে পড়লো। মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে এমনিই।'

'তাহ'লে আমাদের কারুই পেছন নেয়নি।'

'কী হ'তো রে যদি নিতো?'

'খামকা ফের কল্পনা করতে শুরু করিস না।'

'ওরা বলে যে ঐ-ই নাকি দোন পেদ্রোর জন্যে মেয়েছেলে জোগাড় ক'রে আনে।'

'ওর সঙ্গে বাপু আমি কোনো কাজকারবারে যেতে চাই না।'

'চল, যাই।'

'তাই ভালো, চল।'

রাত্রি। মধ্যরাত্রির অনেক পরে। আর গলার স্বরগুলো।

'...বলছি তো, এবার যদি ভালো ভুট্টা হয়, সব শোধ ক'রে দেবো। তা না-হ'লে একটু সবুর করতে হবে আর কি।'

'আমি তোকে চাপ দিচ্ছি না। জানিস তো আমার ধৈর্য কত। তবে জমি তো তোর নয়। তুই আর-কারু জমি চাষ করেছিস। আমার টাকা শোধ দিবি কী ক'রে?'

'কে বলে জমি আমার নয়?'

'লোকে বলছে যে তুই নাকি পেদ্রো পারামোকে জমি বেচে দিয়েছিস।'

'আমি কস্মিন কালেও ওর ধারে-কাছে যাইনি। জমি আমার।'

'তুই তা বলতে পারিস, তবে আমি শুনেছি যে জমি নাকি তারই।'

'বলুক না একবার আমার কাছে।'

'শোন, গালিলেও, তোকে খোলাখুলি বলি। তোকে আমার পছন্দই হয়। এক তো তুই আমার ভগ্নীপোত, আর আমি জানি বোনটার তুই ভালোই

দেখাশুনো করিস। তবে, দোহাই তোর, জমিটা যে বেচে দিয়েছিস, এ-কথাটা আর অস্বীকার করিস না।'

'বলছি তো তোমায়, জমি আমি কাউকেই বেচিনি।'

'কিন্তু জমি তো পেদ্রো পারামোর। সে নিশ্চয়ই জমিটা চেয়েছিলো। ফুলহোর তোর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি?'

'না।'

'তো, কাল নিশ্চয়ই এসে হাজির হবে। কিংবা পরশুদিন। ও এসে উদয় হবেই।'

'আসুক না। পারলে আমাকে না-হয় খুন করুক। তবে আমিও বাছাধনকে জবাই করবো।'

'শান্তিতে বিশ্রাম করুক; আমেন।'

'দেখবে, নিজের চোখেই দেখবে। আমাকে নিয়ে ভেবো না। মা মিছেই আমার পাছার চামড়া ঠেঙিয়ে সজুত করেনি—মোটেই কোনো কাপুরুষ বানায়নি আমায়।'

'বেশ, তা-ই হোক। ফেলিসিতাসকে বলিস রাতে আমি খেতে আসবো না। পরে আমি শুনতে চাই না যে "আমি সে-রাতে ওর সঙ্গে ছিলাম"।'

'ঠিক আছে। তবে তোমার জন্যে খানা রেখে দেবো একটু, যদি পরে তোমার মত পালটায়।'

পায়ের শব্দ। জুতোর নালের ঝমঝম। দূরে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে।

...

'...কাল আমরা ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়বো, চোনা। আমি খচ্চরগুলোর জিন পরিয়ে রেখেছি।'

'আর আমার বাপটা যদি রাগে ফেটে পড়ে? এত বুড়ো হয়েছে...আমার জন্যে তার যদি কিছু হয় তবে কোনোদিনও আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। আমিই তার দেখাশুনো করি—তার ভার নেবার মতো আর-কেউ নেই তো। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে অত তাড়া কেন তোমার? একটু সবুর করো। বেশিদিন তো আর বাঁচবে না।'

'একবছর আগেও তুমি ঠিক এই কথাই বলেছিলে। এমনকী আরো বলেছিলে আমি নাকি ঝুঁকি নিতে ভয় পাই, যেন তুমিই সবকিছুর জন্যে

তৈরি হ'য়ে আছো। আমি খচ্চরগুলোর জন্যে আগাম দিয়েছি। সব কিছু তৈরি। আমার সঙ্গে যাবে তো তুমি?'

'একটু ভাবতে দাও।'

'চোনা, জানো না তোমায় কত ভালোবাসি? আর আমি সবুর করতে পারছি না, চোনা। আমার সঙ্গে তোমায় যেতেই হবে।'

'একটু ভাববার সময় দাও। ওর মরা অব্দি আমায় সবুর করতে হবে। বেশি দিন লাগবে না। তখন তোমার সঙ্গে যাবো—আমাকে আর চুরি করতে হবে না তোমায়।'

'এ-কথাও তুমি একবছর আগে বলেছো।'

'আর?'

'কিন্তু আমায় তো খচ্চরগুলো ভাড়া করতে হয়েছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ওরা অপেক্ষা করছে। একাই থাকুন না তোমার বাবা! তুমি সুন্দরী, কচি বয়েস। উনি না-হয় বুড়িধাড়ি কাউকে দেখাশুনো করার জন্যে জুটিয়ে নেবেন। গাঁয়ে এখানে কত লোকের প্রাণে দয়ামায়া আছে।'

'আমি পারবো না।'

'হ্যাঁ, পারবে।'

'পারবো না। বুঝতে পারছো না, পারবো না। শত হ'লেও বাপ তো।'

'তাহ'লে আর বলার কী আছে। হুলিয়ানাকেই না-হয় দেখি গিয়ে। আমার জন্যে ও হাপিত্যেশ ক'রে আছে।'

'ঠিক আছে। আমার আর-কিছু বলার নেই।'

'কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না?'

'না। আর কোনোদিনই তোমার মুখ দেখতে চাই না।'

...

কোলাহল। গলার স্বর, পর-পর। ফিশফিশ গুঞ্জন। দূরাগত সব গানের কলি।

'রুমাল ছিলো যেন আমার ভালোবাসা
অশ্রু ছিলো যেন আঁচল...'

কৃত্রিম রিনরিনে গলায়, যেন যারা গাইছে তারা সব মেয়ে।

দেখতে পেলাম বলদে-টানা গাড়িগুলো চলেছে। বলদগুলো চলেছে আস্তে ঢিমে তালে। পাথরের ওপরে চাকা গড়িয়ে যাবার শব্দ। লোকেরা সব যেন ঘুমিয়ে আছে।

'…রোজ ভোরবেলায় গাঁ কেঁপে ওঠে বলদে-টানা গাড়ির গুমগুম শব্দে। চারদিক থেকে আসে তারা, শোয়া, দানাশস্য, খড়ে বোঝাই। চাকাগুলো অবিশ্রাম ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করে, ঝনঝন তোলে জানলার কাছে, জাগিয়ে দেয় গ্রাম। এই সেই সময় যখন উনুনের ঢাকা খোলা হয়, হাওয়া নতুন-সেঁকা রুটির গন্ধে ভ'রে ওঠে। হঠাৎ শব্দ ক'রে ওঠে বাজ, হয়তো, বৃষ্টি পড়তে থাকে ঝমঝম। হয়তো বসন্ত আসছে। বাছা, ওখানেই তুই জানতে পাবি 'হয়তো' কথাটার মানে কী…'

ফাঁকা গাড়িগুলো, রাস্তার স্তব্ধতা চুরমার ক'রে দিচ্ছে। রাস্তাগুলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে রাত্রির অন্ধকার। আর সব ছায়া। আর ছায়াদের প্রতিধ্বনি।

ফিরে যাবার কথা ভাবলাম আমি। আমি জানতাম একটা ফোকর আছে কোথাও, পাহাড়গুলোর কালিমার মাঝখানে খোলা ঘায়ের মতো, যার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি।

তখন কে যেন আমার কাঁধ ছোঁয়।

'এখানে তুমি কী করছো?'

'এখানে খুঁজতে এসেছি ' প্রায় ব'লে ফেলেছিলাম তাকে, কিন্তু কোনোক্রমে সামলে নিলাম। 'আমার বাবাকে খুঁজতে এসেছি।'

'ভেতরে আসছো না কেন?'

ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি। বাড়িটার আদ্ধেক ছাদ ভেঙে পড়েছে, মেঝেয় ছড়িয়ে আছে ছাতের টালি, মেঝের ওপরেই ছাত। অন্য আদ্ধেকটায় একজন পুরুষ একজন মেয়ে।

'তোমরা ম'রে গিয়েছো?' আমি তাদের শুধোই।

মেয়েটি হেসে ওঠে। লোকটা আমার দিকে তাকায়, গম্ভীর।

'মদ খেয়েছে,' সে বলে।

'না, ভয় পেয়ে গিয়েছে,' মেয়েটি বলে।

তেলের বাতি জ্বলছে, একটা অগোছালো নোংরা বিছানা, একটা চেয়ারে

মেয়েটির পোশাক প'ড়ে আছে। কারণ ঈশ্বর তাকে যেমন স্যাংটো পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীতে, তেমনি স্যাংটো হ'য়ে আছে সে। লোকটাও তাই।

'আমরা শুনলাম কে যেন কাৎরাচ্ছে, দরজায় মাথা ঠুকছে। দেখি, তুমি। কী হয়েছে?'

'এখন তোমাদের বলতে পারবো না। আমি ঘুমোতে চাই।'

'আমরা ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।'

'এসো, তাহ'লে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।'

...

ভোর আমার স্মৃতিগুলোকে মিইয়ে দিয়েছে।

মাঝে-মাঝে শুনছি কথার আওয়াজ, আর বুঝতে পারছি তফাৎটা। এতক্ষণ ধ'রে যত কথা আমি শুনেছি তাদের কারু কোনো আওয়াজ ছিলো না, সে-সব ছিলো শব্দহীন কথা যা অনুভব করা যায় কিন্তু শোনা যায় না, ঠিক যেমন ঘটে স্বপ্নে।

'ও কে?' স্ত্রীলোকটি জিগেশ করলে।

'কে জানে।'

'এখানে এসেছে কেন?'

'কে জানে।'

'ওর বাবা সম্বন্ধে কী যেন বলছিলো শুনলাম।'

'আমিও শুনেছি।'

'তোমার কি মনে হয় ও হারিয়ে গেছে? মনে আছে, সেই যারা হারিয়ে গেলে এখানে আসতো? তারা তোমায় বলতো তারা লোস্ কোন্‌ফিনেস ব'লে একটা জায়গা খুঁজছে। তুমি বলতে জায়গাটা কোথায় তুমি জানো না।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। তবে এখন আমায় ঘুমোতে দাও। এখনও দিনের আলো ফোটেনি।'

'শিগগিরই আলো হবে। সেই জন্যেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, যাতে তুমি জেগে থাকতে পারো। কাল রাতে তুমি আমায় বলেছিলে ভোর হবার আগে তোমায় জাগিয়ে দিতে। তাই। উঠে পড়ো।'

'আমাকে ওঠাতে চাও কেন?'

'জানি না। তুমিই তো বলেছিলে তোমায় জাগিয়ে দিতে। কেন, তা তো তুমি বলোনি।'

'সেক্ষেত্রে, দোহাই, আমায় ঘুমোতে দাও। শোনোনি ও ভেতরে এসে কী বলেছিলো—ওকে একটু ঘুমোতে দিতে। শুধু এই কথাই তো বলেছিলো।'

গলার স্বরগুলো যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন তারা হারিয়ে ফেলছে আওয়াজ। যেন তারা গলায় আটকে গিয়েছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। পুরোটা একটা স্বপ্ন।

আর তারপর, একটু পরে: 'ও নড়েছে। মনে হয় জেগে যাবে। আমাদের যদি ভাখে তো অনেক কথা জিগেশ করবে।'

'কীই বা জিগেশ করতে পারে আমাদের?'

'তুমি জানো। আর নিশ্চয়ই কিছু-একটা ব'লে বসবে, বলবে না?'

'বলতে দাও। ও নিশ্চয়ই দারুণ ক্লান্ত।'

'তোমার তা ই মনে হয়?'

'চুপ করো, মেয়ে।'

'ভাখো, ঐ আবার নড়লো। দেখলে, কেমন ক'রে পাশ ফিরলো। যেন পস্তাচ্ছে, অনুশোচনা হচ্ছে। বিবেক ওকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি জানি, কারণ আমার বেলাতেও ঠিক এইরকম হয়েছিলো।'

'তোমার আবার কী হয়েছিলো?'

'ঐ একই জিনিশ।'

'কী বলছো, আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি বলতাম না যদি-না ও আমায় মনে করিয়ে দিতো প্রথম যখন তুমি আমায় করেছিলে তখন আমার কী হয়েছিলো। কতটা ব্যথা লেগেছিলো আমার, কেমন অনুতাপ করেছিলাম পরে।'

'কী?'

'তুমি করবামাত্র যেমন অনুভব করেছিলাম। তুমি চাও আমি সে-কথা ভুলে যাই, কিন্তু পারছি না।'

'তুমি এখনও ও নিয়ে ভাবছো? ঘুমোতে দিচ্ছো না কেন আমায়?'

'তুমিই তো বলেছিলে তোমায় জাগিয়ে দিতে। আমি তো সে-চেষ্টাই করছি। ঈশ্বর জানেন তুমি যা বলেছিলে শুধু তা-ই করছি আমি। এসো, উঠে পড়ো। সময় পেরিয়ে গেছে।'

'আমাকে ছেড়ে দাও, মেয়ে।'

লোকটা মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। স্ত্রীলোকটি সমানে বিড়বিড় ক'রে চলেছে, তবে ভারি নিচু গলায়।

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভোর হ'য়ে গিয়েছে, আলো দেখছি যে। এখান থেকে আমি লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আলো না-থাকলে তাকে দেখতে পেতাম কেমন ক'রে। এক্ষুনি সূর্য উঠে পড়বে। আমাকে যদি শুধোও তো বলবে, লোকটা নিশ্চয়ই কোনো দুষ্কর্ম ক'রে বসেছে···আর আমরা ওকে ওখানে লুকোতে দিয়েছি। শুধু এক রাত্তিরের জন্যে হ'লেই বা, কোনো তফাৎই হবে না: আমরা ওকে লুকিয়েছি। তাতে নিশ্চয়ই আমাদের ঝামেলায় পড়তে হবে। দ্যাখো, কেমন ক'রে নড়ছে, যেন কিছুতেই একটু স্বস্তি একটু আরাম পাচ্ছে না। ওর বিবেকে নির্ঘাৎ কোনো বিষম পীড়া আছে।'

ছায়াদের ছত্রভঙ্গ ক'রে, দিন ফুটে উঠলো। ঘুমন্ত শরীরগুলোর তাপে ঘরটাকে গরম লাগছে। প্রথম আলো আমার চোখের পাতা ছুঁলো। আলো অনুভব করতে পারছিলাম আমি। শুনতে পেলাম:

'কারু আত্মা বেজায় কষ্ট পেলে যেমন হয়, লোকটা অমনিভাবে ছটফট করছে। মন্দ লোকের সব চিহ্নই আছে ওর। ওঠো, দোনিস, উঠে পড়ো! দ্যাখো লোকটাকে! লোকটা ছটফট করছে, মাটি আঁচড়াচ্ছে! দ্যাখো, ওর কষ বেয়ে লালা ঝরছে এখন। নিশ্চয়ই লোকটা অনেক লোককে জবাই করেছে। আর তুমি কি না ওকে ভেতরে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে এসেছো।'

'নেহাৎই কোনো গরিব বেচারা হবে। যাও, ঘুমোও।'

'ঘুমোবো কেন আমি? আমার তো ঘুম পাচ্ছে না।'

'তাহ'লে উঠে প'ড়ে কোথাও চ'লে যাও, যেখানে আমায় অত জ্বালাতন করতে পারবে না!'

'ঠিক আছে, উনুন ধরাই গিয়ে। আর কী যেন নাম লোকটার, ওকে বরং বলি আমার জায়গায় তোমার পাশে শুতে।'

'বেশ, বলো গিয়ে না-হয়।'

'পারছি না যে। ওকে আমার ভয় করছে।'

'তাহ'লে যাও, নিজের কাজ করো গিয়ে। আমাদের জ্বালাতন কোরো না।'

'বেশ।'

'তাহ'লে ব'সে আছো যে? কীসের অপেক্ষায়?'

'এমনিই।'

বুঝতে পারছিলাম মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। মাটির মেঝেয় তার খালি পা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার মাথার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো। আমি একবার চোখ খুলেই আবার বুজে ফেললাম।

যখন জেগে উঠলাম, তখন বেলা দুপুর। আমার পাশে একটা কফির মগ। কয়েক ঢোঁক কফি গিললাম আমি।

'আর-কিছু নেই আমাদের। সবকিছুই বাড়ন্ত…'

স্ত্রীলোকটির গলা।

'আমাকে নিয়ে ভেবো না,' আমি বললাম। 'খিদে পুষে রাখার অভ্যেস আছে আমার। এ-জায়গাটা ছেড়ে তোমরা যাও কী ক'রে?'

'কোথায়?'

'যে-কোনোখানে।'

'অজস্র রাস্তা আছে। একটা যায় কোন্‌ৎলায়, আরেকটা সেখান থেকে আসে। তারপর আরেকটা সরাসরি সিয়েররার [পাহাড়ের] ওপর দিয়ে চ'লে যায়। এখান থেকে যেটা দেখতে পাও…' সে আঙুল তুলে দেখালো যেখানে ছাতের টালি খ'শে প'ড়ে ফোকর হয়েছে, 'সেটা কোথায় যায় জানি না। ঐ-যে রাস্তাটা, ওটা যায় মেদিয়া লুনায়। তারপর আরো-একটা আছে, যেটা সবকিছুকে ছাড়িয়ে আরো-দূরে চ'লে যায়।'

'হয়তো ও-রাস্তাটা ধ'রেই আমি এসেছি।'

'কোথায় যায় ওটা?'

'সাইয়ুলায়।'

'ভাবো একবার! আমার ধারণা ছিলো সাইয়ুলা এখান থেকে খুব কাছে। চিরকাল আমি ওখানে যেতে চেয়েছি। ওরা বলে ওখানে নাকি মানুষজন গিশগিশ করছে।'

'সবখানে যেমন করে, তেমনই।'

'ভাবো একবার! আর আমরা কি না এখানে একা প'ড়ে আছি। জীবনের একটু-কিছু জানতে চাচ্ছি সবসময়।'

'তোমার স্বামী কোথায় গেলো?'

'ও আমার স্বামী নয় মোটেই, আমার ভাই…যদিও ও কাউকে কথাটা

জানতে দিতে চায় না। কোথায় গেছে ? একটা বাছুর দলছুট হ'য়ে গিয়েছে, তার খোঁজে। অন্তত আমাকে তো তাই বললো।'

'কতদিন আছো এখানে ?'

'চিরকাল। আমরা এখানেই জন্মেছি।'

'নিশ্চয়ই দোলোরেস প্রেসিয়াদোকে চিনতে ?'

'হয়তো দোনিস চিনতো। আমি প্রায় কাউকেই চিনি না। আমি কখনও বাইরে যাই না। এখানেই আছি চিরকাল ধ'রে—ঠিক যেখানে তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছো...না, তা ঠিক সত্যি নয়। যেদিন থেকে ও আমাকে ওর মেয়েমানুষ বানিয়ে নিয়েছে, সেই থেকে। সেই থেকে আমি অন্দরেই থেকে গিয়েছি যাতে লোকে আমায় দেখতে না-পায়। ও অবশ্য বিশ্বাস করে না, তবে আমি সত্যি বিশ্রী দেখতে নই ?' মেয়েটি রোদের আলোয় এসে পড়লো। 'আমার মুখখানা ভাখো !'

সাধারণ একটা মুখ, খুবই সাধারণ।

'কী দেখবো ব'লে ভাবছো ?'

'আমার পাপগুলো দেখতে পাচ্ছো না ? ঐ লাল দাগগুলো, ঠিক ছোঁয়াচে দাদের মতো ? আর ওগুলো তো শুধু বাইরে। ভেতরে-ভেতরে আমি একটা পাঁকের সমুদ্র !'

'কিন্তু কেউ যদি এখানে না-ই থাকে, তবে কে আর ও সব দেখতে আসবে ? সারা গাঁটা আমি চুঁড়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু একটা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়নি।'

'ও-রকম ফাঁকা দেখায় বটে, তবে এখনও কয়েকজন আছে বৈ কি ! ফিলেমেনো এখনও বেঁচে আছে, তাই না ? আর দোরোতেয়া, আর মেল্‌কিয়াদেস আর বুড়ো প্রুদেন্‌সিয়ো, আর সোস্তোনেস—ওরা সবাই বুঝি বেঁচে নেই ? তবে ওরা অন্দরে থাকে। দিনের বেলা ওরা কী করে জানি না, তবে রাত্তিরে ওরা অন্দরেই থাকে। রাতগুলো সব বিভীষিকা। যদি দেখতে পেতে কত আত্মা খোলাখুলি ছাড়া পেয়ে ছন্নছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে···যেই অন্ধকার হ'য়ে পড়ে ওরা বেরিয়ে আসতে শুরু করে, আর আমরা সবাই ওদের দেখে ভয় পাই। কত-কত জন ওরা সংখ্যায়, আর গোনাগুনতিতে আমরা এত কম, আমরা এমনকী যাতে ওদের আত্মারা শান্তি পায় বিশ্রাম করতে পারে সেজন্যে ওদের জন্যে আর জপতপও করি না। আমার জপতপ ওদের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয়। হয়তো খ্রিষ্টজপের একটু-আধটু ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছোয়, তবে তাতে তাদের কোনো মঙ্গল

হবে না! আমরা পাপে ভ'রে আছি। এমন-কেউ এখানে নেই যে ঈশ্বরের দয়া থেকে বঞ্চিত নয়। ওদের লজ্জায় অধোবদন না-হ'য়ে আমরা এমনকী চোখ তুলে তাকাতেও পারি না। আর লজ্জা বা ধিক্কার কিছুই সারায় না। অন্তত বিশপ তা-ই বলেছিলেন, ক-দিন আগে যখন এখানে দীক্ষা দেবার জন্যে এসেছিলেন। আমি ওঁর কাছে গিয়ে সব পাপ স্বীকার করেছি।

' "এই কলঙ্কের ক্ষমা নেই," তিনি বলেছিলেন।

' "আমি লজ্জায় ধিক্কারে ভ'রে আছি।"

' "সেটা কোনো সারান নয়।"

' "আমাদের বিয়ে দিয়ে দিন।"

' "ওকে ছেড়ে চ'লে যাও।"

'আমি তাঁকে বলতে চেয়েছিলাম যে জীবনই আমাদের দুজনকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে, জীবন আমাদের বন্দী ক'রে এ ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। আমরা এখানে এতই একা যে আমরাই শুধু একমাত্র আছি। আর গ্রামটাকে তো যে-ক'রেই হোক লোক দিয়ে ভরাতে হবে। হয়তো যখন ফিরে আসবেন তখন আমরা কাউকে দীক্ষা দেবার মতো এখানে পাবো।

' "ওকে ছেড়ে চ'লে যাও। তুমি শুধু এ-কাজটাই করতে পারো।"

' "তাহ'লে আমরা বাঁচবো কী ক'রে?"

' "মানুষের মতো।"

'আর মুখ গম্ভীর ক'রে, একবারও পেছন ফিরে না-তাকিয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি চ'লে গিয়েছিলেন, যেন পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছেন নরকটাকে। আর-কখনও তিনি ফিরে আসেননি। সেইজন্যেই গ্রামটা ভূতপ্রেতে ভরা, একদঙ্গল ঘরছাড়া দিকহারা আত্মা—যারা পাপে-তাপে মরেছে, ক্ষমা পাবার কোনো উপায় যাদের নেই, অন্তত আমাদের সাহায্যে যাদের কোনো মুক্তি নেই···ঐ-যে, ও এসে পড়েছে। শুনতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'ও দোনিস।'

দরজা খুলে গেলো।

'বাছুরটার কী হয়েছে?' মেয়েটি জিগেশ করলে।

'ফিরে আসেনি আর, তবে আমি ওর পায়ের ছাপ ধ'রে-ধ'রে গিয়েছি। বোধহয় বুঝে গিয়েছি কোথায় আছে। রাত্তিরে ওকে পাকড়াবো।'

'রাত্তিরে আমায় একা ফেলে রেখে যাবে নাকি?'

'তাতে কী?'

'আমি তা সইতে পারবো না। এখানে তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। একমাত্র তখনই আমি স্বস্তি পাই। রাত্তিরে।'

'কিন্তু আমি তো রাত্তিরে বাছুরটার তল্লাশে যাবো।'

'এইমাত্র জানলাম যে,' আমি বললাম, 'তুমি এর ভাই।'

'খুলেই বললাম ওকে যাতে ও বুঝতে পারে। সেটাই একমাত্র কারণ।'

'তাহ'লে কী বুঝলে তুমি, শুনি?'

মেয়েটি তার কাছে গিয়ে কাঁধে হেলান দিলে, বললে, 'হ্যাঁ, শুনি, কী বুঝলে?'

'কিছু-না,' আমি বললাম। 'আমি ক্রমেই সবকিছু কম বুঝছি।' আর তারপরে যোগ করলাম, 'যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই ফিরে যেতে চাই। এখনও একটু আলো আছে।'

'না, বরং একটু সবুর করো,' লোকটা বললে। 'কাল যেয়ো না-হয়। রাত হ'য়ে এলো ব'লে, রাস্তাঘাট সব কাঁটাঝোপে ফণিমনসায় ভরা। পথ হারিয়ে ফেলতে পারো। আমি না-হয় কাল তোমায় রাস্তা দেখিয়ে দেবো।'

'বেশ,' আমি বললাম।

...

ছাতের ফোকর দিয়ে আমি শ্যামাপাখির ঝাঁক দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা সবসময় সন্ধেবেলায় বাসায় ফিরে আসে, অন্ধকার ঘিরে ধরবার আগেই। আর কয়েক টুকরো মেঘ, হাওয়ার তোড়ে ছেঁড়াখোঁড়া, যে-হাওয়া এসেছে দিনকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে। পরে সন্ধ্যাতারা বেরিয়ে এলো, আর তারপর চাঁদ।

লোকটি আর মেয়েটি ঘরে ছিলো না। দরজা দিয়ে তারা বেরিয়ে গিয়েছিলো পাতিওতে, ফিরে এলো যখন রাত নেমে পড়েছে। ফলে তারা জানেইনি তারা যখন বাইরে ছিলো তখন কী হয়েছে।

রাস্তা থেকে ঘরে এসেছিলো এক স্ত্রীলোক। বুড়ি, বেজায় রোগা। ভেতরে এসে ঘরের মধ্যেটায় চারপাশে খুঁটিয়ে দেখলো। হয়তো দেখতেও পেয়েছিলো আমায়। হয়তো ভেবেছিলো যে আমি ঘুমিয়ে আছি। সোজা তক্তপোশটার কাছে চ'লে এসেছিলো সে, একটা তোরঙ্গ টেনে বার করেছিলো তার তলা থেকে, তারপর ডালা তুলে ভেতরটা হাৎড়ে দেখেছিলো। বগলে গোটা কতক

চাদর তুলে নিয়ে পা টিপে-টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো, যেন ভয় পাচ্ছিলো, বুঝি আমায় জাগিয়ে ফ্যালে।

আমি একেবারে নিঃসাড় পড়েছিলাম, শ্বাস চেপে, চেষ্টা করছিলাম না-দেখতে। শেষটায় মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম সন্ধ্যাতারাটাকে, চাঁদের পাশে ঝকমক করছে।

'খেয়ে নাও এটা।'

মাথা ঘোরাবার সাহস ছিলো না আমার।

'খেয়ে নাও, তোমার ভালো হবে। কমলাকুঁড়ির চা। আমি জানি তুমি ভয় পেয়ে গেছো, কারণ তুমি কাঁপছো থরথর ক'রে। খেলে তোমার ভালো লাগবে।'

মেয়েটির হাত দুটি চিনতে পারলাম আমি, যখন চোখ তুললাম তখন, তার মুখখানাও চিনতে পারলাম। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে, সে আমায় জিগেশ করলে : 'অসুখ করেছে ?'

'জানি না। তোমরা দেখতে পাও না অথচ আমি লোকজন দেখতে পাই। একটু আগেই এক বুড়ি এসেছিলো এখানে। সে চ'লে যাবার সময় নিশ্চয়ই দেখেছো তোমরা।'

'ছেড়ে দাও একে,' লোকটা মেয়েটিকে বললে, 'এ মরমিয়া।'

'একে শুইয়ে দেয়া উচিত আমাদের। দেখছো না কেমন কাঁপছে। নিশ্চয়ই জ্বর এসেছে।'

'একে নিয়ে খামকা ভেবো না। এ-ধরনের লোক শুধু লোকেদের যত্নআত্তি পাবার জন্যে এ-রকম করে। মেদিয়া লুনায় এ-রকম একজনকে জানতাম। ওরা বলতো সে নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। যেটা সে দেখতে পায়নি সেটা হ'লো যখন পাত্রোন তার ভুলচুকগুলো ধ'রে ফেলবেন তখন সে যে মরবে। এ-ও নিশ্চয়ই সে-রকম কোনো মরমিয়া। এরা গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, দেখতে চায় "দৈব তাদের কী জুটিয়ে দেয়," কিন্তু এ এখানে এমন-কাউকে পাবে না যে একে একমুঠো খেতে দেবে। ঐ ছাখো, এর কাঁপুনি থেমে গিয়েছে। আমার কথা শুনতে পেয়েছে কিনা।'

যেন সময় পেছন পানে চলেছে। আবারও দেখতে পেলাম তারাটা, চাঁদের পাশে। মেঘগুলো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে। শ্যামাপাখির ঝাঁক। তারপর বিকেলবেলা, তখনও আলোয় ভরা।

দেয়ালগুলো ঝিলকে দিচ্ছে বিকেলবেলার আলো। শান রাস্তার খোয়ার ওপর আমার পায়ের শব্দ। সেই গাধাওলা লোকটা, যে আমায় বলেছিলো, 'দোনিয়া এস্থিহেসের খোঁজ কোরো, যদি এখনও বেঁচে থাকেন।'

তারপর এক অন্ধকার ঘর, আমার পাশে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে এক স্ত্রীলোক। খেয়াল করলাম তার শ্বাসে কোনো ছন্দ নেই, যেন সে স্বপ্ন দেখছে, কিংবা হয়তো সত্যি সে ঘুমিয়ে নেই, শুধু স্বপ্নের সব শব্দ নকল ক'রে চলেছে। পাৎলা সরু কাঠের বিছানা, ছালা দিয়ে ঢাকা—তাতে মূতের গন্ধ, যেন রোদে-হাওয়ায় কেউ কোনোদিনও তাদের সাফ করেনি, আর বালিশটা তৈরি রুক্ষ মোটা কাপড়ে ভেতরে রেশম-সুতিকাপড়ের টুকরো ঠাশা, কিংবা পশম ঠাশা, এত শক্ত; কিংবা হয়তো ঘামে ভিজে-ভিজে ঠিক কাঠের মতো শক্ত হ'য়ে গিয়েছে।

মেয়েটির নগ্ন পা আমার পাশে, গায়ে-গায়ে লেগে আছে—টের পেলাম—আমার মুখের ওপরে তার ঘন শ্বাস। আমি ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলাম বিছানায়, হেলান দিলাম ঐ আদোবে [পোড়া মাটির] বালিশে।

'ঘুমোওনি তুমি?' মেয়েটি জিগেশ করলে।

'আমার ঘুম পাচ্ছে না। আমি সারাদিন প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমিয়েছি। তোমার ভাই কোথায়?'

'ও বেরিয়ে গেছে। শোনোনি, বলেছিলো রাতে বেরুবে। হয়তো আজ রাতে আর ফিরবেই না।'

'মানে, ওকে তুমি বারণ করার পরও ও বেরিয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ফিরে আসবে ব'লে মনে হয় না। এইভাবেই ওরা সবাই এদিক-সেদিক বেরুতে শুরু করে। আমায় এখানে যেতে হবে, ওখানে যেতে হবে। শেষটায় এত দূরে চ'লে যায় যে সেখানেই আড্ডা গেড়ে বসা অনেক সহজ হয়। আমায় কিছু বলেনি ও, তবে আমার মনে হয় ও আমায় তোমার কাছে রেখে চ'লে গিয়েছে, যাতে তুমি আমার দেখাশুনো করতে পারো। সুযোগ বুঝে কেটে পড়েছে আর-কি। বাছুর হারাবার গল্পটা নেহাৎই বানানো। দেখবে, ও আর ফিরে আসবে না।'

আমি মেয়েটিকে বলতে চাইলাম, 'বাইরে একটু হাওয়া খেয়ে আসি, পেটের মধ্যেটা কেমন গোল পাকাচ্ছে,' কিন্তু আমি শুধু বললাম, 'মিথ্যে ভেবো না। ও ঠিক ফিরে আসবে।'

আমি উঠতেই মেয়েটি বললে, 'রান্নাঘরে কাঠকয়লার তাওয়ার ওপর আমি

কিছু খাবার রেখেছি তোমার জন্যে। বেশিকিছু না, তবে তা তোমার খিদে মেরে দেবে।'

আমি দেখতে পেলাম ধোঁয়ায় শুকোনো গোরুর মাংসের টুকরো, আর কয়েকটা তোর্‌তিয়া—কয়লার ওপর বসানো, তাওয়ার ওপর।

'শুধু এটুকুই জোগাড় করতে পেয়েছি,' অন্য ঘর থেকে মেয়েটি বলছে, শুনলাম। 'আমার বোনের কাছ থেকে আনলাম, দুটো পরিষ্কার চাদর দিয়ে, মা মারা যাবার পর থেকে আমি ওগুলো আগলে রেখেছিলাম। দিদি নিশ্চয়ই ওগুলো নিতে এসেছিলো। দোনিসের সামনে আমি ও-কথা বলতে চাইনি, তবে তুমি যাকে দেখে ভয় পেয়েছিলে সে আমার দিদি।'

কালো এক আকাশ, তারায়-তারায় ভরা। আর চাঁদের পাশে সবচেয়ে বড়ো তারাটি।

...

'আমাকে তুমি শুনতে পাচ্ছো না?' নিচু গলায় আমি জিগেশ করলাম।

আর মেয়ে-গলা আমায় উত্তর দিলো: 'তুই কোথায়?'

'এইখানে। তোমার গ্রামে। তোমার নিজের লোকজনের মধ্যে। আমায় দেখতে পাচ্ছো না তুমি?'

'না তো, বাছা। তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

তার গলা মনে হ'লো সবকিছুকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। আর তারপর তা হারিয়ে গেলো পৃথিবীর পরপারে।

'না তো, তোকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

...

যে-ঘরে সেই মেয়েটি ঘুমোচ্ছিলো, আমি আবার এসে সে-ঘরে ঢুকলাম।

'আমি এখানেই থাকবো, আমার নিজের কোণটায়। বিছানাটা মেঝের মতোই শক্ত। কিছু হ'লে, আমায় বোলো।'

'দোনিস আর ফিরে আসবে না,' মেয়েটি বললে। 'ওর চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। ও শুধু অপেক্ষা করছিলো কবে কেউ এখানে আসে, যাতে ও চ'লে যেতে পারে। ফলে এখন তোমার আমাকেই দেখাশুনো করতে হবে···না কি তুমি তা চাও না? এখানে এসো, আমার সঙ্গে শোও।'

'যেখানে আছি সেখানেই বেশ আছি।'

'কিন্তু বিছানায় আরো ভালো থাকবে। ওখানে নিচে এঁটুলি পোকাগুলো তোমায় শুষে খাবে।'

আমি উঠে তার সঙ্গে বিছানায় গিয়ে শুলাম।

...

গরম আমাকে জাগিয়ে দিলো। মাঝরাত তখন। গরম আর ঘাম। মেয়েটির শরীর মাটি দিয়ে তৈরি, দলা-দলা মাটির তাল তার সর্বাঙ্গে, আর এখন সব কাদার জলা হ'য়ে যাচ্ছে। মনে হ'লো তার শরীরের ঘামে আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি। নিশ্বাস নিতে পারছি না। আমি উঠে পড়লাম, কিন্তু মেয়েটি ঘুমিয়েই রইলো। তার মুখটা হা-করা, খোলা, তার মধ্যে থেকে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, ঠিক মরবার সময় যেমন হয়।

একটু হাওয়ার জন্যে আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম, কিন্তু গরম আমার পেছন নিয়ে বাইরে তাড়া ক'রে এলো, কিছুতেই আমায় ছেড়ে যাবে না। একটু হাওয়া নেই। শুধু স্তব্ধ, স্তম্ভিত রাত, অগস্টের কুকুরখ্যাপানো দিনে ঝলসানো।

একটু হাওয়া নেই। যে-হাওয়া আমার শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে তাকেই ফের গিলে খেতে হচ্ছে, আমার হাত দুটি দিয়ে আগলে রেখে, যাতে তারা পালিয়ে না যায়। তার আসা-যাওয়া টের পাচ্ছি আমি, আর প্রতিবারেই তা ক্রমশ আগের চাইতে কম হ'য়ে আসছে, শেষটায় এত মিহি ফুরফুরে হয়ে গেলো যে তা তা আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে চিরকালের মতো পালিয়ে গেলো।

চিরকালের মতো।

মনে পড়ে, ফেনার একটা মেঘের মতো কী-একটা যেন দেখেছিলাম, আর সেই ফেনায় ধুয়েছিলাম নিজেকে, হারিয়ে গিয়েছিলাম মেঘের মধ্যে। সব শেষে যা দেখেছিলাম, তা এই।

...

'তুমি দম আটকে মরেছিলে, আমাকে তুমি তা-ই বিশ্বাস করতে বলছো, হুয়ান প্রেসিয়াদো? তোমাকে আমি প্লাসায় দেখতে পেয়েছিলাম, দোনিসের বাড়ি থেকে অনেক দূরে, আর আমার সঙ্গে সে-ও ছিলো, বলছিলো তুমি মারা

যাচ্ছো। তোমাকে আমরা তোরণশোভিত পথের ছায়ায় টেনে নিয়ে এসেছিলাম, আর তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করছিলে, যেমনভাবে লোকে মরে আতঙ্কে। যে-রাতের কথা বলছো সে-রাতে যদি কোনো হাওয়াই না-থাকে, তাহ'লে কোত্থেকে এত জোর পেলাম যে এখানে তোমাকে টেনে নিয়ে এসে তোমাকে আমরা কবর দিলাম? আর দেখতেই তো পাচ্ছো, তোমাকে আমরা কবর দিয়েছি।'

'তুমিই ঠিক, দোরোতেয়ো। তোমার নাম দোরোতেয়োই তো বলেছিলে?'

'সবই সমান। আমার নাম আসলে দোরোতেয়া। তবে সবই সমান।'

'তুমিই ঠিক, দোরোতেয়া। আমাকে মেরেছিলো গলার স্বরগুলোই।'

…'তুই দেখতে পাবি, বাছা, কেন আমি ও-জায়গাটা এত ভালোবাসতাম। আমি ভালোবাসতাম যে-গ্রামটা। যেখানে স্বপ্নেরা আমাকে রোগা ক'রে গিয়েছিলো, আমার গ্রাম, মাঠঘাটের ওপরে তুলে-ধরা। গাছপালায় ভরা, সবুজ পাতায়, যেন একটা কড়ির ঝাঁপি যেখানে আমরা আমাদের স্মৃতিগুলোকে জমিয়ে রাখতাম। তোর মনে হবে সেখানে তোর থাকতে ভালো লাগবে, চিরকাল। সূর্য-ওঠা, সকাল, বিকেল, সন্ধে - সবসময় একইরকম, শুধু তফাৎ বোঝা যায় হাওয়ার ধরনে। হাওয়াই বদ্‌লে দেয় সবকিছুর রং…'

'হ্যাঁ, দোরোতেয়া। আমাকে গলার স্বরগুলোই মেরেছে। মেরেছে, কারণ আমি এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আর আমি তা সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার মাথাটা ঠিক ছিলো না আর। আমার মনে পড়ে দেয়ালে ভর দিয়ে-দিয়ে আমি প্লাসায় গিয়েছিলাম, যেন হাতে ভর দিয়ে হাঁটছিলাম। আর ঐ গুঞ্জন, ঐ মর্মর—সব যেন দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসছিলো, চুঁইয়ে পড়ছিলো ফাঁক ফোকর চিড় থেকে। মানুষের গলার স্বর সে-সব, কিন্তু স্পষ্ট ছিলো না তারা যেন তারা গোপন কথা, যেন তারা আমাকে যাবার সময় ফিশফিশ ক'রে কিছু বলছিলো। কিংবা সে-সব ছিলো যেন গুঞ্জন, আমার কানের মধ্যে। দেয়াল থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে এনেছিলাম নিজেকে, রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, অথচ তবু তা শুনতে পাচ্ছিলাম একইভাবে, একই রকম, যেন তারা আমার সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছে, কখনো সামনে, কখনো পেছনে। আর তেমন গরম লাগেনি আমার, যেমন আগে তোমায় বলেছি। আমার বরং ঠাণ্ডা

লাগছিলো। যে-মেয়েটি আমার বিছানা ধার দিয়েছিলো, তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে, আমার ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছিলো। ক্রমে আরো-ঠাণ্ডা, আরো কনকনে ঠাণ্ডা বোধ করেছিলাম, ঠাণ্ডায় গায়ের লোম শিউরে-শিউরে উঠছিলো। ফিরে যেতে চেয়েছিলাম আমি, কারণ, ভেবেছিলাম, এইমাত্র যে-গরম ছেড়ে এলাম তাকে আবার খুঁজে পাবো, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম এই কনকনে ঠাণ্ডা আমারই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, আমারই রক্তের মধ্য থেকে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমি কতটা ভয় পেয়েছি। প্লাসা থেকে একটা জোরালো আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, শুনে ভেবেছিলাম আমি যদি ওখানে লোকজনের মধ্যে গিয়ে পড়ি তবে হয়তো একটু স্বস্তি পাবো। সেইজন্যই তুমি আমায় প্লাসায় পেয়েছো। তাহ'লে দোনিস শেষটায় ফিরেই এসেছিলো। মেয়েটি তো নিশ্চিত ছিলো তাকে আর কোনোদিনই দেখতে পাবে না।'

'তোমাকে যখন খুঁজে পেলাম ততক্ষণে দিনের আলো ফুটে গিয়েছে। দোনিস কোত্থেকে এলো জানি না। আমি ওকে জিগেশ করিনি।'

'তা, আমি তো প্লাসায় গিয়ে পৌছুলাম, তোরণপথের একটা থামের গায়ে হেলান দিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম সেখানে কেউ নেই, অথচ তখনও লোকজনের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম, যেন একটা হাটের দিন। অর্থহীন একটা গুঞ্জন, ঠিক যেমন হাওয়া রাতের বেলায় গাছের ডালেপালায় আওয়াজ করে, যখন তুমি গাছপালা দেখতে পাচ্ছো না অথচ শুনতে পাচ্ছো হাওয়ার শরশর। হুবহু সেই রকম। আমি আর দূরে যাইনি। টের পাচ্ছিলাম বিড়বিড় কথা-গুলো ক্রমেই আমার কাছে এসে পড়ছে, আমাকে ঘিরে ঘুরছে একঝাঁক মৌমাছির মতো, আর শেষটায় আমি কয়েকটা কথা বুঝতে পারলাম: "আমাদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো।" আমাকে স্বরগুলো এই কথাই বলছিলো। তারপর আমার আত্মা যেন হিম জ'মে গেলো। সেইজন্যেই তোমরা আমায় মৃত পেয়েছো।'

'তোমার বাড়ি থাকা উচিত ছিলো। এখানে আসতে চাচ্ছিলে কেন?'

'সে তো তোমায় গোড়াতেই বলেছি। ওরা বলছিলো পেদ্রো পারামো নাকি আমার বাবা, আমি তারই খোঁজে এসেছি। সেই আলেয়াটাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'আলেয়া বিভ্রম—এরা খারাপ। একটা বিভ্রমই আমাকে যতদিন বাঁচা

উচিত ছিলো না তার চেয়ে ঢের বেশি দিন বাঁচিয়ে রেখেছে। এইভাবেই আমাকে দাম দিতে হয়েছে আমার ছেলেকে খুঁজে পাবার চেষ্টা ক'রে, সেটাও একটা আলেয়া। আমার কোনো ছেলেই হয়নি কখনও। এখন যখন আমি ম'রে গিয়েছি, আমি ফুরসৎ পেয়েছি সবকিছু ভালো ক'রে ভাববার, আর সবকিছু বুঝতে পেরেছি। ভগবান আমায় এমন কোনো ঘর দেননি যেখানে তাকে রাখতে পারতাম। শুধু একটা লম্বা একটানা ক্লান্তিকর জীবন, যেখানেই যাই হন্যে হ'য়ে খুঁজে বেড়াই, এপাশে-ওপাশে তাকাই, লোকের পেছনে খুঁজি, সবসময় সন্দেহ করি ওরাই বুঝি আমার ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছে। আর এ সবই ছিলো আমার খারাপ স্বপ্নের দোষ। দুটি স্বপ্ন ছিলো আমার। একটাকে আমি বলি খারাপ স্বপ্ন, অন্যটাকে ভালো। প্রথমটা আমাকে দেখাতো যে আমার এক ছেলে আছে। যতদিন বেঁচেছি কখনও এই বিশ্বাস থেকে টলিনি যে এটা সত্য, কারণ আমি তাকে টের পেতাম বুকে-কোলে, টের পেতাম তার মুখখানা, তার ছোট্ট হাত দুটি টের পেতাম। দীর্ঘকাল আমার আঙুল আর চোখের পাতা ছুঁতে পারতো, টের পেতো তার বুকের টিপটিপ শব্দ। কাজেই বিশ্বাস না-ক'রেই বা কী উপায় ছিলো? যেখানেই যেতাম তাকে আমি ব'য়ে নিয়ে যেতাম সঙ্গে ক'রে, আমার রেবোসোয় [আলোয়ানে] গা মুড়ে, তারপর হঠাৎ তাকে হারিয়ে ফেললাম একদিন। স্বর্গে ওরা আমায় বলেছিলো ওরা একটা ভুল করেছে। বলেছে, ওরা আমায় মায়ের বুক দিয়েছে, কিন্তু মায়ের গর্ভ দেয়নি। সেটাই আমার অন্য স্বপ্ন। আমি স্বর্গে এসে পৌঁছেছি, চারপাশে খুঁজেছি তন্নতন্ন, যদি আমার ছেলের মুখখানাকে খুঁজে পাই দেবদূতদের মধ্যে। কোনো লাভ হয়নি। মুখগুলো সব একই রকম, প্রত্যেকেরই মুখ একরকম দেখতে। তাই তার কথা আমি জিগেশ করেছিলাম। একজন সন্ত কোনো কথা না-ব'লে আমার কাছে এলেন, আর হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন আমার পেটে, যেন নরম মোমের গোল একদলার মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়েছেন। হাত বার ক'রে নিয়ে এসে আমায় তিনি এমন-একটা জিনিশ দেখালেন, যেটাকে দেখতে ঠিক বাদামের খোসার মতো: "আর তোমাকে যা দেখাচ্ছি সেটাই প্রমাণ।"

'ওখানে ওরা কেমন অদ্ভুতভাবে কথা বলে জানো তো। অথচ তুমি তাদের তবু বুঝতে পারো। আমি তাঁকে বলতে চেয়েছিলাম এ তো আমার পেটটাই, সব শুকিয়ে গিয়েছে কোনোদিনই যথেষ্ট খাবার ছিলো না ব'লে, কিন্তু সন্তদের

আরেকজন আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমায় ধ'রে-ধ'রে দরজার কাছে নিয়ে এলেন : "পৃথিবীতে ফিরে যাও আবার, মেয়ে, আরো-একটু বিশ্রাম করো, ভালোভাবে থাকবার চেষ্টা করো যাতে শুদ্ধিকরণের গণ্ডিতে [পুরগাতোরিতে] বেশিদিন থাকতে না-হয়।"

'সেটাই আমার ভালো স্বপ্ন, আর তার মধ্য দিয়েই আমি শেষটায় জেনেছিলাম যে আমার কোনো ছেলে হয়নি কখনও। একেবারে শেষ দশার আগে সে-কথা আমি জানিনি যখন আমার শরীর শুকিয়ে গুটিয়ে গেছে, আর শিরদাঁড়াটা এত বেঁকে গিয়েছে যে সহজে একপাও হাঁটতে পারি না। তারপর গ্রামটা ফাঁকা হ'য়ে যেতে লাগলো। সকলে চ'লে গেলো গ্রাম ছেড়ে, ভিক্ষেশিক্ষে ক'রে বেঁচে-থাকার কোনো উপায় রইলো না আমার। আমি ব'সে-ব'সে মরণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। তোমায় পাবার পর আমরে অস্থি-হাড় বিশ্রাম নেবে ব'লে ঠিক করলো। ভেবেছিলাম, "কেউ আমাকে লক্ষও করবে না," আমি হচ্ছি সেইরকম কেউ যে কাউকে কখনও জ্বালাতন করে না। আর, দেখছো তো, পৃথিবী থেকে একফোঁটা জমিও আমি চুরি করিনি। ওরা আমায় কবর দিয়েছিলো তোমারই কবরে, আর তোমারই কোলের খাঁজে আমি মাপ মতো দিব্যি এঁটে গেলাম। শুধু এটা আমার মাথায় ঢুকলো যে আমারই তোমাকে কোলে-করা উচিত, উলটোটা নয়। শোনো। ওপরে এখানে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তুমি টের পাচ্ছো না?'

'মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাদের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে।'

'আর তোমার কোনো ভয় নেই। এখন ওরা তোমায় ভয় দেখাতে পারবে না আর। শুধু ভালো-ভালো মধুর জিনিশ ভাবো, কারণ আমাদের এখানে থাকতে হবে অনেক, অনেক কাল।'

দিন যখন ফুটলো, মাটিতে বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। কী-রকম ঝাঁপ শোনায় তাদের, যখন তারা মাটির ভাঁজগুলোর নরম আলগা ধুলো ছোঁয়। একটা হরবোলা পাখি উড়ছে মাটি ছুঁয়ে আর নকল করছে কোনো বাচ্চার ডুকরে কাঁদা। একটু দূরে গিয়ে সে কাৎরালো, যেন কোন বিষম ক্লান্তিতে, আর আরো-দূরে, যেখানে দিগন্ত শুরু করেছে খুলে যেতে, সে হেঁচকি তুললো, তারপরেই হেসে উঠলো, তারপর গুঙিয়ে উঠলো আবার।

ফুলহোর সেদানো মাটির সোঁদা গন্ধ শুঁকলো, তাকিয়ে দেখলো বৃষ্টি ছোপ ধরিয়ে দিচ্ছে মাটির ভাঁজে-ভাঁজে। তার ছোট্ট চোখ দুটো খুশি-খুশি। তিন ঢোঁক সোঁদা গন্ধ গিলে নিয়ে হাসলো যতক্ষণ-না দেখা গেলো তার দাঁতের পাটি।

'খাশা!' বললে ফুলহোর, 'আরো-একটা চমৎকার বছর।' তারপর যোগ করলে: 'চালিয়ে যাও, বৃষ্টি। হয়রান না-হওয়া অব্দি প'ড়েই চলো। তারপর ওখানে গিয়ে আবার শুরু কোরো। সেই একই কারবার। মনে রেখো, সব মাঠে হাল দিয়েছি শুধু তোমাকেই খুশি করবো ব'লে।'

আর সে হেসে উঠলো।

যে-হরবোলা পাখি মাঠ দিয়ে উড়ে গিয়েছিলো, সে আবার ফিরে এলো, ঠিক তার সামনে দিয়ে উড়তে উড়তে গুমরে উঠলো আবার।

এমন ভারি বাদল যে আকাশ যেন চেপে'নেমে এসেছে, যেন রাত্রি আবার ফিরে আসছে।

মেদিয়া লুনার মস্ত ফটকটা কঁ্যাচকঁ্যাচ ক'রে উঠলো খোলবার সময়। প্রথমে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে এলো দুটি লোক, তারপর আরো দুজন, তারপর আরো দুজন, এইভাবে প্রায় দুশো লোক সব শুদ্ধু, ঘোড়ার পিঠে; ভিজে মাঠে-মাঠে তারা ছড়িয়ে পড়লো।

'এন্‌মেদিও থেকে গোরুমোষগুলো এস্তাগুয়াও ছাড়িয়ে নিয়ে যাও, আর এস্তাগুয়ার গোরুমোষ নিয়ে যাও ভিলমাইয়ো পাহাড়ের ওপর,' যখন গাউচোরা [কাউবয়] ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরুলো, ফুলহোর সেদানো তাদের বললে। 'আর চটপট করো। বর্ষা শুরু হ'য়ে গিয়েছে এর মধ্যেই।'

কথাটা সে এতবার বললে যে শেষ লোকেরা শুধু শুনতে পেলে, 'ওখান থেকে ওখানে, আর ওখান থেকে ঐ ওখানে।' তারা সবাই তাদের সম্‌ব্রেরোতে হাত তুললো এটাই দেখাতে যে তারা হুকুমটা বুঝতে পেরেছে।

শেষ লোক সবে চ'লে গিয়েছে, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো মিগেল পা'রামো, আর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো, প্রায় সেদানোর ঘাড়ে। ঘোড়াটাকে সে নিজে-নিজেই আস্তাবল খুঁজে নিতে ছেড়ে দিলে।

'এত সকাল-সকাল কোত্থেকে, ছোটো কর্তা?'

'দুধ দুয়ে।'

'কে?'

'খাঁচ করতে পারছো না?'

'এ নিশ্চয়ই দোরোতেয়া "লা কুয়ারুরকো"। বাচ্চা নিয়ে এমন খ্যাপা আর কে আছে?'

'তুমি একটা বুদ্ধু, ফুলহোর। তবে সে তো আর তোমার দোষ নয়।'

আর সে হেঁটে চ'লে গেলো ছোটোহাজরি সারতে, এমনকী জুতোর নাল আর ফলক না-খুলেই।

রান্নাঘরে, দামিয়ানা সিস্‌নেরোস তাকে ঠিক একই প্রশ্ন করলে: 'কিন্তু এত সকালে তুমি কোত্থেকে, মিগেল?'

'মায়েদের খোঁজে বেরিয়েছিলাম।'

'রাগ কোরো না। ডিম কেমনভাবে চাও?'

'তোমার যেমন পছন্দ।'

'আমি সরাসরি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, মিগেল।'

'আমি তা জানি, দামিয়ানা। ভেবো না। আচ্ছা, শোনো, দোরোতেয়া নামে কাউকে চেনো, যাকে সবাই বলে "লা কুয়ারুরাকা"?'

'চিনি। তাকে যদি দেখতে চাও, এখুনি বাইরে পেয়ে যাবে। রোজ সকালে ও এখানে ছোটোহাজরি সারতে আসে। তার রেবোসোয় ও একটা পুঁটুলি ব'য়ে নিয়ে বেড়ায় আর গুনগুন ক'রে ঘুমপাড়ানি গান গায়। বলে যে এ নাকি তার ছেলে। কখনও নিশ্চয়ই বিষম-কিছু ঘটেছিলো ওর, কিন্তু ও কারু সঙ্গে এ নিয়ে কিছু বলে না, ফলে কেউই জানে না সত্যি-সত্যি কী হয়েছিলো। ভিক্ষে-শিক্ষে ক'রে বাঁচে।'

'গোল্লায় যাক ফুলহোরটা! ওকে আচ্ছা শিক্ষা দিতে হবে।'

তারপর সে ভাবতে শুরু করলে মেয়েটা তার কোনো কাজে লাগবে কি না। রান্নাঘরের পেছনের দরজায় গিয়ে সে মেয়েটিকে ডাক দিলে।

'দোরোতেয়া, এখানে এসো। তোমার সঙ্গে আমি একটা চুক্তি করতে চাই।'

যখন সে ফিরে এলো, সে তার হাত কচলাচ্ছে।

'কই? ডিমগুলো?' দামিয়ানাকে সে চোটপাট ক'রে জিগেশ করলে। 'আর এখন থেকে ঐ ছুঁড়িকে তোমরা যা খাও তা-ই খেতে দিয়ো। আর কিপটেমি কোরো না।'

ফুলহোর সেদানো গোলায় গিয়েছিলো দানা-শস্য কত আছে দেখতে। এ-নিয়ে বেশ ভাবিতই সে, কারণ এখনও ফসল তোলার সময় হয়নি। সত্যি-

বলতে, খেতে সবেমাত্র বীজ বোনা হয়েছে'। 'দেখতে চাই সব ফুরিয়ে যায় কি-না।' পরে আরো যোগ করলো: 'ঐ ছোকরা! বাপকা ব্যাটা—হুবহু বাপটার মতো, তফাৎ এই যে ছোঁড়া আরো কচি বয়েসেই শুরু ক'রে দিয়েছে। এভাবে চললে একেবারে উচ্ছন্নে যাবে। ওকে বলতে ভুলে গেলাম যে কাল লোক এসেছিলো কাকে নাকি খুন করেছে এই নালিশ করতে। এভাবে যদি চলে, ছোঁড়া …'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে অনুমান করবার চেষ্টা করলে গাউচোরা কদ্দুর অব্দি গেছে, কিন্তু মেগেল পারামোর ঘোড়াটা তাকে বিব্রত করলো, বেড়ার গায়ে সে তার মুখটুলি ঘষছে। 'এমনকী জিনলাগামও খোলেনি,' ভাবলে সে। 'আর খুলবেও না। দোন পেদ্রো বরং বুঝদার, অন্তত মাঝে-মাঝে ভাবে-টাবে। কিন্তু মিগেল ছোঁড়ার মাথা খাচ্ছে লাই দিয়ে। কাল যখন বললাম তার গুণধর ছেলে কোন্ কীর্তি করেছে, বলে কি না: "ফুলহোর, ভেবে নাও না কেন কাজটা আমিই করেছি। মিগেল তা করবে কী ক'রে, এখনও কাউকে খুন করার মতো তাকৎ ওর হয়নি। তা করতে হ'লে তোমার ইয়া বড়ো বুক চাই," এই ব'লে এমন হাত বাড়িয়েছিলো যেন কোনো কুমড়ো মাপ করছে। "ও যাই করুক, শুধু বোলো যে আমি করেছি।"

'"মিগেল আপনাকে বিস্তর ঝামেলায় ফেলবে, দোন পেদ্রো। ও ঝগড়া করতে গোলমাল পাকাতে ভালোবাসে।"

'"করুক, যা খুশি। ওকে ছেড়ে দাও, ফুলহোর, ও নেহাৎই ছেলেমানুষ। কত বয়েস হ'লো? সতেরো, তাই না?"

'"হয়তো তাই। আমার মনে আছে ও কবে জন্মেছিলো। কালকের কথা মনে হয়। তবে এমন রগচটা আর দাঙ্গাবাজ! এমন তাড়া যে মনে হয় যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। ভয় হয় বেজায় খারাপ কোনো শেষ হবে ওর।"

'"ও নেহাৎই ছেলেমানুষ, ফুলহোর।"

'"যা বলেন আপনি, দোন পেদ্রো। কিন্তু ঐ মাগি এসে বলছিলো ও নাকি ওর মরদটাকে জবাই করেছে।…কিছুতেই তার কান্না থামাতে পারি না, বা সান্ত্বনা দিতে পারি না। আমি জানি, দোন পেদ্রো, শোকতাপ কেমন ক'রে মাপে, ঝুড়িভরা তার শোক। একশো বুশেল দানাফসল দিতে চাইলাম যাতে ঝামেলাটা ভুলে যায়—কিন্তু মাগি তা চায় না। তখন তাকে কথা দিলাম

যে যেভাবেই হোক এর একটা বিহিত করবো—তবু কিছুতেই তাদের তুষ্ট করতে পারি না।"

' "এই 'ওরা' কে শুনি?"

' "লোকগুলিকে চিনি না।"

' "তাহ'লে ভাবনার কিছু নেই, ফুসহোর। ও-লোকগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই।" '

গোলায় ঢোকবামাত্র সে দানাশস্যের স্তূপের ওম টের পেলে গায়ে। এক মুঠো তুলে নিলে হাতে গুবরেপোকারা হামলা করেছে কি না দেখতে। তারপর হিশেব করলে কতটা দানাশস্য এখনও গোলায় আছে।

'চমৎকার। ফসল ওঠা অব্দি চ'লে যাবে,' বললে সে। 'ঘাস গজাবামাত্র গোরু-মোষগুলোর জাবনার জন্যে দানাফসল আর লাগবে না। যথেষ্টরও বেশি আছে গোলায়।'

ফেরার পথে সে মুখ তুলে তাকালে মেঘলা আকাশে। 'বেশ কিছুকাল বৃষ্টি চলবে দেখছি।' আর সে বাকি সবকিছুই ভুলে গেলো।

'ঋতু বদল হচ্ছে নিশ্চয়ই। আমার মা আমাকে বলেছেন যখন বর্ষা শুরু হয়, হাওয়া ভ'রে ওঠে নতুন অঙ্কুরের হালকা সবুজ গন্ধে। মা বলেছেন কেমন ক'রে ভেসে আসে মেঘ, কেমন ক'রে তারা ছড়িয়ে যায় মাটির ওপর, বদলে দেয় তার সব রং···জীবনের সবচেয়ে সুখী দিনগুলো মা এই গ্রামে কাটিয়েছেন, কিন্তু এখানে তিনি ফিরে আসতে পারেননি মরতে। সেই জন্যেই মা আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর জায়গায়। এটা ভারি অদ্ভুত, দোরোতেয়া, কেমন ক'রে যেন আমি একবারও আকাশ দেখবার সুযোগ পেলাম না। তবে মনে হয় নিশ্চয়ই সেই একই আকাশ এখানে—মা যাকে জানতেন।'

'আমি জানি না, হুয়ান প্রেসিয়াদো। অত বছর আমি আমার মাথা তুলিনি যে আকাশ সম্বন্ধে আমি সবকিছু ভুলে গিয়েছি। আর আমি যদি মুখ তুলে তাকাতামও, তাতেই বা কোন্ ফায়দাটা হ'তো? স্বর্গ কত দূরে, আর আমার চোখ দুটি এমনই অন্ধ যে আমি মাটি কোথায় সেটা জেনেই যথেষ্ট খুশি ছিলাম। তাছাড়া, আমি সব আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছিলাম, বিশেষ যখন পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া বলেছিলেন যে আমি কোনোদিনও স্বর্গে যাবো না, এখান

থেকে কোনোদিনই তাকে আমি চোখে দেখবো না। সে শুধু আমারই সব পাপের জন্যে। কিন্তু আমাকে তাঁর এ-কথা বলা উচিত হয়নি। জীবনকে যা শুধু একটুখানি তাৎপর্য দেয় তা হ'লো এই আশা যে অন্তত মরণের পরে কেউ এর চেয়ে কোনো ভালো জায়গায় যাবে, আর যখন ওরা সেই দরজাটাও তোমার মুখের ওপর বন্ধ ক'রে দেয় আর শুধু যে-দরজাটা খোলা থাকে সে-দরজাটা হয় নরকের, তখন কোনোদিনও না-জন্মানোই ভালো। আমার জন্যে, হুয়ান প্রেসিয়াদো, জেনো, আমি যেখানে স্বর্গও সেখানেই।'

'আর তোমার আত্মা? সে কোথায় গেছে ব'লে তোমার মনে হয়?'

'সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এলোমেলো, পথহারা, দিকহারা, অন্য সকলের আত্মার মতোই, খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন লোক যারা ওর হ'য়ে প্রার্থনা করবে। আমার মনে হয় আমার সব খারাপ কাজের জন্যে আমায় ঘেন্না করে, কিন্তু তা আর আমাকে ভাবায় না মোটেই। যত কষ্ট দিতো সে আমায়, এখন আমি তাকে উপড়ে ফেলেছি। সবকিছুর জন্যেই তিক্তবিরক্ত ক'রে তুলতো আমাকে, এমনকী যথেষ্ট খাবার নেই ব'লেও, আর অসহ্য ক'রে তুলতো রাতগুলো, ভরিয়ে দিতো বিভীষিকায়, আতঙ্কে। অভিশপ্তদের দৃশ্য ভেসে উঠতো চোখের সামনে, নরকের দৃশ্য। যখন আমি মরতে বসেছি সে আমাকে বলেছিলো আবার উঠে পড়তে, বেঁচে থাকতে, বেঁচেই থাকতে, যেন সে তখনও আশা ক'রে ছিলো অলৌকিক-কিছু ঘটবে যা আমার পাপগুলোকে সাফ ক'রে দেবে। কিন্তু আমি অটল। "এইই শেষ," তাকে বলেছিলাম, "আর আমি সইতে পারছি না।" আমি মুখ খুলে হা ক'রে রইলাম যাতে সে বেরিয়ে যেতে পারে, আর সে আমায় ছেড়ে চ'লে গেলো। মনে হয়েছিলো কী যেন পড়েছিলো আমার হাতে। রক্তের ছোট্ট-একটা সুতো, যা দিয়ে সে বাঁধা ছিলো আমার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে।'

তারা দরজা ধাক্কালে, কিন্তু লোকটা কোনো সাড়া দিলে না। লোকটা শুনতে পেলে তারা সবগুলো দরজাতেই ঘা মেরে বেড়াচ্ছে, সবাইকেই জাগিয়ে দিচ্ছে। সে চিনতে পারলে ফুলহোরের পায়ের শব্দ যখন সে মস্ত ফটকটার দিকে হড়বড় ক'রে এগুলো। এক ঝলক থামলো পায়ের শব্দ, যেন সে ফিরে আসতে চাচ্ছে, দরজা ধাক্কাতে চাচ্ছে আবার, তারপর পায়ের শব্দ ফের এগিয়ে গেলো।

তার মনে প'ড়ে গেলো তার বাবার মৃত্যু। সেও একটা উষায়, দিন ফোটবার সময়, ঠিক এইরকমই, তফাৎটা শুধু এই যে সেই ভোরে দরজা ছিলো হাট ক'রে খোলা, এক ছাইরঙা আকাশের মনখারাপ আলো ঢুকতে দিচ্ছিলো

ভেতরে। আর এক স্ত্রীলোক হেলান দিয়ে ছিলো দরজায়, চোখের জল চেপে। যে-মাকে সে ভুলে গিয়েছে, ভুলে গিয়েছে অনেক, অনেকবার, তিনি তাকে বলছেন : "ওরা তোর বাবাকে খুন করেছে।"

সে কোনোদিনও চায়নি সেই দুঃখের স্মৃতিকে ফিরে জাগাতে, কারণ সবসময়েই সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে অন্য-সব স্মৃতি, যেন সে একটা ভরা বস্তা ফাটিয়ে ফেলেছে, চেষ্টা করছে শস্যের দানা যাতে ঝুরঝুর ক'রে সব প'ড়ে না-যায়। তার বাবার মৃত্যু তাকে মনে করিয়ে দেয় অন্য মৃত্যুগুলো, আর তাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে একই ধ'সে-যাওয়া মুখের আদল, একই বিধ্বস্ত মুখের ছবি : একটা চোখ নষ্ট, অন্য চোখে প্রতিহিংসার ঝিলিক। আর আরেকটা স্মৃতি, আর আরো-একটা, যতক্ষণ-না শেষে সে তাকে মুছে ফ্যালে মন থেকে, যখন সেখানে সব মনে ক'রে আছে এমন-কেউ আর নেই।

'ওকে নামিয়ে রাখো এখানে। না, না, ওভাবে নয়। নামাতে হবে পা আগে। তুমি! তুমি কীসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছো?'

সব নিচু গলায়।

'আর দোন পেদ্রো?'

'উনি ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে জাগিয়ো না। কোনো আওয়াজ কোরো না।

কিন্তু ঐ যে তিনি ওখানে, দরজার গায়ে বিশাল, তাকিয়ে আছেন এক পুঁটুলির দিকে, পুরোনো ছালায় এমনভাবে মোড়া যেন তা এক কাফন।

'কে ও?' তিনি শুধোলেন।

ফুলহোর সেদানো তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। 'মিগেল, পাত্রোন।'

'কী করেছে ওরা ওকে?' তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন।

তিনি শুনতে চাচ্ছিলেন, 'ওরা ওকে মেরে ফেলেছে,' আর চেপে রাখতে চাচ্ছিলেন রাগটাকে যেটা ফুঁসে উঠছে ভেতরে, কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন ফুলহোর সেদানো নরম স্বরে বলছে, 'কেউ ওকে কিছু করেনি। নিজেই মরেছেন।'

কেরোসিনের ডিবেগুলোর আলো কেমন আবছা আর হলুদ।

'...ঘোড়াটা ওকে মেরেছে,' কে যেন বললে।

ওরা তাকে টান ক'রে শোয়ালো বিছানায়, তলার জাজিম সরিয়ে দিয়ে, খালি তক্তার ওপর। বুকের ওপর আড়াআড়ি ক'রে সাজালো হাত দুটি, কালো একটা কাপড়ে ঢেকে দিলো মুখ। 'যত বড়ো ছিলো তার চেয়ে আরো বড়ো লাগছে ওকে,' ফুলহোর সেদানো ফিশফিশ ক'রে বললে।

পেদ্রো পারামো তাদের তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন, মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। তাঁর চিন্তাগুলো সব একটা আরেকটার পেছন-পেছন এলো অসংলগ্ন, অর্থহীন, অবশেষে তিনি বললেন: 'মাশুল গুনতে শুরু করেছি আমি। চটপট দেনা শোধাই ভালো। তাড়াতাড়ি সব চুকেবুকে যাবে।'

কোনো শোক, কোনো দুঃখ অনুভব করলেন না পেদ্রো পারামো।

পাতিওতে জড়ো-হওয়া লোকদের সঙ্গে কথা বললেন যখন, আসবার জন্যে তাদের যখন ধন্যবাদ দিলেন, তাঁর স্বর কেটে বেরুলো মেয়েদের বিলাপ, আর পরে শুধু যে-শব্দটা শোনো গেলো সেটা মিগেল পারামোর ঘোড়ার ছটফটে দাপাদাপি।

'জন্তুটাকে মেরে ফেলতে বলো ওদের,' তিনি বললেন ফুলহোর সেদানোকে। 'চাই না যে ঘোড়াটা সারাক্ষণ এমন কষ্ট পাক।'

'তাই হবে, দোন পেদ্রো। আমি বুঝতে পারছি। বেচারা ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ওর জন্যে খুব কষ্ট পাচ্ছে।'

'আমিও ঠিক তা-ই ভাবছি, ফুলহোর। আর ঐ মেয়েদের গিয়ে বলো, এমন শোরগোল যেন না-করে। এ আমার মৃতদেহ। এ যদি তাদের মৃতদেহ হ'তো তবে তারা এমনভাবে ডুকরোতো না।'

অনেক বছর পরে, পাদ্রে রেন্‌তেরিয়ার তখনও মনে পড়তো সেই রাতটা যখন তাঁর বিছানার শক্ত তাঁকে ঘুমোতে দেয়নি, বরং তাঁকে বাইরে বার ক'রে দিয়েছিলো। এটা সেই রাত, যে-রাতে মিগেল পারামো মারা গিয়েছিলো।

কোমালার ফাঁকা রাস্তায় এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তিনি, জঞ্জালের স্তূপে আটকে-থাকা কুকুরগুলোকে তাঁর পায়ের শব্দ ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলো। নদীর কাছে এসে তিনি শান্ত জলের ধারে থেমেছিলেন, তাকিয়ে দেখছিলেন জলের ওপর তারার ঝিলিমিলি—আকাশ থেকে যা খ'শে-খ'শে পড়ছিলো। কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ওখানে, নিজের ভাবনাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তাদের কালো নদীতে।

'এ-সবই শুরু হয়েছে,' তিনি ভেবেছিলেন, 'পেদ্রো পারামো যখন বড়ো হ'য়ে সবকিছু দখল ক'রে নিতে শুরু করেছে। আগাছার মতো বেড়েছে তার ক্ষমতা। আর সবচেয়ে যেটা অধম, সে জোরটা পেয়েছে আমারই কাছ থেকে। "আমি স্বীকার করতে চাই যে গত রাতে আমি পেদ্রো পারামোর সঙ্গে শুয়েছি।"

"পাদ্রে, আমি পেদ্রো পারামোর বাচ্চা ধরেছি পেটে।" "পাদ্রে, আমি আমার মেয়েকে ধার দিয়েছি পেদ্রো পারামোর কাছে।" আমি সবসময় ভেবেছি সে নিজে এসে আমার কাছে কিছু কবুল করবে বুঝি, কিন্তু সে কোনোদিনও আসেনি। সে শুধু তার অশুভ শক্তিকে তার ছেলের মারফৎ ছড়িয়ে দিয়েছে। যে-ছেলেটাকে সে স্বীকার করেছিলো, যদিও ঈশ্বরই জানেন কেন। আমি শুধু এই জানি আমিই ঐ হাতিয়ারটাকে তার হাতে তুলে দিয়েছি।'

তাঁর স্পষ্ট মনে প'ড়ে গেলো দিনটা যেদিন তিনি মিগেলকে নিয়ে এসেছিলেন পেদ্রোর কাছে, সদ্যোজাত। বলেছিলেন: 'দোন পেদ্রো, জন্ম দিতে গিয়ে এর মা মারা গেছে। বলেছে, আপনিই তার বাপ। এই আপনার ছেলে।'

পেদ্রো পারামো মোটেই অস্বীকার করেনি, শুধু বলেছিলো : 'পাদ্রে, নিজের কাছেই রাখছেন না কেন একে? একে যাজক বানিয়ে নিন।'

'আমি দায়িত্ব নিতে চাই না। বিশেষত যে-রক্ত বইছে ওর শিরায়।'

'আপনার সত্যি মনে হয় ওর শিরায় খারাপ রক্ত বইছে?'

'হ্যাঁ, দোন পেদ্রো।'

'আমি প্রমাণ ক'রে দেবো যে আপনি ভুল করেছেন। রেখে যান একে এখানে। এর যত্ন করার মতো প্রচুর লোক আছে এখানে।'

'আমি শুধু এই কথাই ভাবছিলাম। অন্তত এর খাওয়াপরার কোনো অভাব এখানে হবে না।'

কচি একরত্তি শিশু কুণ্ডলি পাকিয়ে যাচ্ছিলো সাপের মতো।

'দামিয়ানা! এর যত্ন কোরো। এ আমার ছেলে।'

তারপর সে একটি বোতল খুলেছিলো। 'আসুন, এর মা আর আপনার নামে পান করা যাক।'

'আর বাচ্চাটার নামে?'

'আর তার নামেও। নয়ই বা কেন?'

পেদ্রো পারামো আরেক দফা পানীয় ঢেলেছিলো, তাঁরা শিশুটির ভবিষ্যতের উদ্দেশে পান করেছিলেন।

এইই ঘটেছিলো তার জন্মের দিন।

ওয়াগনগুলো বেরিয়ে যেতে শুরু করলো মেদিয়া লুনার পথে। তিনি টিপ ক'রে ব'সে প'ড়ে লুকিয়ে পড়লেন নদীর পাড় ধ'রে-ধ'রে যে-লম্বা নলখাগড়াবন

গজিয়েছে তার মধ্যে। 'কার কাছ থেকে লুকোচ্ছো তুমি?' নিজেকে তিনি জিগেশ করলেন।

'সুপ্রভাত, পাদ্রে,' শুনলেন তারা চেঁচিয়ে বলছে।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলেন, 'সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, প্রভু তোমাদের মঙ্গল করুন।'

গাঁয়ের আলোগুলো সব নিভে যাচ্ছে। নদী রঙে-রঙে ঝলমল ক'রে উঠেছে।

'প্রথম ঘণ্টা পড়েছে নাকি?' একজন তাঁকে জিগেশ করলে।

'নিশ্চয়ই অনেক আগেই বেজে গিয়েছে,' এই ব'লে তিনি অন্যদিকে চ'লে গেলেন, যাতে তারা তাঁকে আটকাতে না-পারে।

'এত ভোরে কোথায় চলেছেন, পাদ্রে?' 'কে মরতে বসেছে, পাদ্রে?' 'কোন্‌ৎলায় কেউ মরেছে নাকি, পাদ্রে?'

তিনি তাদের বলতে চাইলেন, 'মরেছি আমি। আমিই মৃতদেহ।' কিন্তু তিনি শুধু মৃদু হাসলেন।

গাঁয়ের বাইরে এসে তিনি দ্রুত পায়ে হেঁটে চললেন। যখন ফিরে এলেন, সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে?

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি, কাকা?' আনা তাকে জিগেশ করলে। 'অনেক মেয়ে-বৌ এসেছিলো তোমার খোঁজে। ওরা স্বীকার করতে চাচ্ছিলো—কাল মাসের প্রথম শুক্রবার কি না।'

'ওরা সন্ধেবেলায় আসতে পারে ইচ্ছে হ'লে।'

ঢোকবার মুখের বেঞ্চিটায় তিনি চুপচাপ ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ, শান্ত।

'কী ঠাণ্ডা হাওয়া, আনা!'

'না, কাকা, গরম।'

'গরম?'

তিনি কোন্‌ৎলার কথা না-ভাববার চেষ্টা করছিলেন। তিনি সেখানে যাজকের কাছে গিয়েছিলেন সাধারণভাবে স্বীকারোক্তি দিতে, যাজক তাঁকে পাপক্ষালন করতে দেননি।

'এই-যে লোকটা যার নাম আপনি আমাকে বলবেন না আপনার চার্চ ধ্বংস করেছে, আপনি তাকে তা করতে দিয়েছেন। তাহ'লে এখন আপনার জন্যে আর রইলো কী? ঈশ্বর আপনাকে যে-অনুগ্রহ আর ক্ষমতা দিয়েছেন তা দিয়ে আপনি কী করেছেন? আমি বিশ্বাস করতে চাই যে আপনি যাজক হিশেবে

ভালো, সকলেই আপনার সম্বন্ধে ভালো কথা ভাবে, কিন্তু নিছক ভালো হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। পাপ ভালো নয়, আর তার সঙ্গে যুঝতে হ'লে কঠিন হ'তে হবে আপনাকে, নির্দয় হ'তে হবে। আশা করি তারা এখনও ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু আপনি তাদের বিশ্বাস রক্ষা করেননি, তারা বিশ্বাস বজায় রেখেছে ভয় আর কুসংস্কারের বশে। বুঝতে পারি কেমন দারিদ্র্যে দিন চলে আপনার, এও জানি এই দুঃস্থ গ্রামগুলোয় আমাদের কাজ কত কঠিন। কিন্তু সেই তথ্যটাই আমাকে এই কথাটা জানাবার অধিকার দিয়েছে যে কিছু-কিছু লোককে আমাদের আশীর্বাদ বা করুণা বিলোবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ বিনিময়ে আপনার আত্মার জন্যে অতি সামান্যই মাশুল দেয় তারা। আর তাদের হাতেই যদি আপনার আত্মা থাকে, তবে আপনার সত্যিকার কাজগুলো আপনি করবেন কী ক'রে? না, আপনার পাপক্ষালন করবার মতো পরিচ্ছন্ন হাত আমার নেই। আপনাকে অন্য-কোথাও গিয়ে তা চাইতে হবে।'

'আপনি কি বলছেন আমার চার্চটি আমার ছেড়ে দেয়া উচিত?'

'ছাড়তে হবেই। আপনি নিজে যদি পাপ ক'রে থাকেন তবে অন্যদের আশীর্বাদ বিতরণ করা সম্ভব হয় না!'

'কিন্তু ওঁরা যদি আমায় সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন?'

'হয়তো তা-ই আপনার প্রাপ্য। ওঁরাই তার বিচার করবেন।'

'কিন্তু আপনি কি···? আপাতত, ধরুন···সাময়িকভাবে···আমাকে তো অন্তিমলেপন দিতে হবে···খ্রিষ্টপ্রসাদও আছে। এত লোক মরে আমার গাঁয়ে।'

'ঈশ্বরকেই তাদের বিচার করতে দিন।'

'না, তাহ'লে?'

আর কোনো'লার যাজক তাঁকে না বলেছেন।

পরে তাঁরা পাশাপাশি পায়ে হেঁটে এসেছেন পাতিওর ছায়াঘেরা বারান্দা দিয়ে। বসেছেন একটি আঙুরকুঞ্জের তলায় যেখানে আঙুর পেকে টশটশে হ'য়ে যাচ্ছে।

'তেতো এগুলো,' যাজক বলেছেন, তিনি কী প্রশ্ন করবেন সেটা আগেভাগেই আন্দাজ ক'রে। 'আমরা এমন-একটা মহালে থাকি যেখানে সবকিছুই আমাদের দেয়া হয়, দৈব করুণায়, কিন্তু যেখানে সবকিছুই তেতো। এই আমাদের দণ্ড।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি কোমালায় আঙুর ফলাবার চেষ্টা করে-

ছিলাম, তাদের ফল ফলেনি। শুধু কমলা আর জাম; তেতো নারঙ্গ আর তেতো জাম। মিষ্টি ফলমূলের স্বাদ আমি ভুলেই গিয়েছি। আপনার মনে পড়ে সেমিনারিতে আমরা যে-পেয়ারা খেতাম? আর পীচ? আর ঐ নারঙ্গ? একটু শুধু চাপ দিন, অমনি তারা খোশা ফাটিয়ে টুপ ক'রে বেরিয়ে আসতো। কিছু বীজ কিনেছিলাম আমি, খুব বেশি নয়, শুধু একটা ঠোঙা। পরে আমার মনে হয়েছিলো এখানে এনে তাদের মেরে না-ফেলে হয়তো যেখানে তারা গজায় সেখানে রেখে এলেই ঢের ভালো হ'তো।'

'তবু, ওরা তো বলে কোমালায় জমি নাকি ভালো। ধিক্কারের বিষয় হ'লো সব জমিই একজনের হাতে। পেদ্রো পারামোই কি এখনও সবকিছুর মালিক?'

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

'আমার মনে হয় না ঈশ্বরের ইচ্ছা এ-ক্ষেত্রে কাজ করেছে। আপনার কী মনে হয়?'

'মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় বৈ কি, তবে ওখানে সবাই এ-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।'

'আর আপনিও তাদের মতে বিশ্বাস করেন?'

'আমি নেহাৎই দুঃস্থ বেচারি—নিজেকে দীন ভাবতে সবসময় তৈরি… যতক্ষণ সে ও-রকম যা-খুশি তা-ই ক'রে চলে।'

তারপর তাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন পরস্পরের কাছে। অন্য যাজকের হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেয়েছেন। আর এখন, তিনি যখন এখানে ফিরে এসেছেন, বাস্তবের মাঝখানে, তিনি কোন্‌খানে কী ঘটেছে সে-সম্বন্ধে আর ভাবতে চান না।

উঠে প'ড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'কোথায় যাচ্ছো, কাকা?'

তাঁর ভাইঝি আনা সবসময় থাকে সেখানে, সবসময় তাঁর কাছে-কাছে, যেন তাঁরই ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে থেকে জীবন থেকে সে আশ্রয় নেবে।

'একটু হাঁটতে যাচ্ছি, আনা। হয়তো তাতে উপকার হবে?'

'শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, আনা, শরীর খারাপ নয়। আমি মন্দ লোক, আর আমি অমঙ্গল—আমার শুধু এ-কথাই মনে হচ্ছে।'

পেদ্রো পারামোকে সান্ত্বনা দিতে তিনি মেদিয়া লুনায় গেলেন, আর

আবারও তাঁকে সাত কাহন শুনতে হ'লো ছেলের হ'য়ে তার যত-সব কৈফিয়ৎ আর ওজর-ওজুহাত। তাকে কথা ব'লে যেতে দিলেন তিনি। কিছুই আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার সঙ্গে খাবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি : 'পারছি না, দোন পেদ্রো, আমাকে সকাল-সকাল চার্চে যেতে হবে, কারণ একদঙ্গল মেয়ে পাপ স্বীকার করবে ব'লে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। অন্য-কখনও বরং…'

হেঁটেই ফিরে এলেন তিনি, সরাসরি চার্চে চ'লে এলেন যেমন ছিলেন তেমন, ধূলিধূসর আর বিমর্ষ। পাপস্বীকার শোনবার জন্যে বসলেন তিনি।

প্রথমে এলো বুড়ি দোরোতেয়া, যখনই তিনি গির্জের দুয়োর খোলেন সে অপেক্ষা ক'রে থাকে সকলের আগে। তার গায়ে মদের গন্ধ।

'তো এখন তুমি গিলে এসেছো, হুম? কিসে শুরু হ'লো মদ টানা?'

'আমি শুধু মিগেলিতোর জন্যে নিশি জাগতে গিয়েছিলাম, পাদ্রে। আর বড্ড বেশি মদ খেয়েছি। ওরা এত মদ দিলো আমায়। নিজেকে একটা ভাঁড় বানিয়ে ফেলেছি আমি।'

'আর-কিছু তো তুমি ছিলে না, দোরোতেয়া, কখনও।'

'কিন্তু এখন যে পাপ ক'রে বসেছি, পাদ্রে। অনেক পাপ। অনেক, অনেক বেশি।'

বিভিন্ন উপলক্ষে তাকে তিনি বার-বার বলেছেন : 'তুমি কোনো পাপ-স্বীকার কোরো না, দোরোতেয়া, তুমি এখানে এসে মিথ্যে শুধু আমার সময় নষ্ট করো। চেষ্টা করলেও তুমি কোনো পাপ করতে পারবে না। বরং অন্যদের পাপস্বীকার করবার সুযোগ দাও।'

'কিন্তু এখন যে এ সত্যি, পাদ্রে।'

'বলো, শুনি।'

'এখন যখন ওর আর কোনো ক্ষতি করতে পারবো না তখন আমি কবুল করতে চাই যে আমিই মিগেলিতোর জন্যে মেয়ে পটিয়ে আনতাম।'

পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া কিছুক্ষণ কী ভাবলেন, তারপর তাকে জিগেশ করলেন : 'কবে থেকে?'

'বড়ো হবার পর থেকেই। যখন ও প্রথম মেয়েমানুষ চাইতে শুরু করলো।'

'কী বললে, তা আবারও বলো, দোরোতেয়া।'

'কেন, আমিই মিগেলিতোর জন্যে মেয়ে জোগাড় ক'রে আনতাম।'

'নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে ?'

'মাঝে-মাঝে। মাঝে-মাঝে আমি শুধু মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলতাম আর ওও মাঝে-মাঝে কাউকে-কাউকে ঝাপটে ধরতো। জানেন, যখন কোনো মেয়ে একা আছে, যখন সাহায্য করার মতো কেউ কাছে-পিঠে নেই।'

'অনেক মেয়ে বুঝি ?'

এ-প্রশ্নটা তিনি করতে চাননি, কিন্তু মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো।

'আমি এমনকী গোনাও ছেড়ে দিয়েছি, পাদ্রে। অজস্র।'

'আমাকে তুমি কী করতে বলো, দোরোতেয়া ? নিজেই নিজের কাজের বিচার করো। ছাখো, নিজেকে তুমি ক্ষমা করতে পারো কি না।'

'আমি পারছি না, পাদ্রে। কিন্তু আপনি তো পারেন। সেই জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'কতবার তুমি আমার কাছে এই অনুনয় নিয়ে এসেছো যে মরবার আগে তোমাকে সরাসরি যেন স্বর্গে পাঠিয়ে দিই ? তুমি সেখানে যেতে চাও এই দেখতে যে তোমার ছেলেকে সেখানে খুঁজে পাও কি না ? তা, এখন তো তুমি স্বর্গে যেতে পারবে না আর। ঈশ্বর বরং তোমায় ক্ষমা করুন।'

'ধন্যবাদ, পাদ্রে।'

'আর আমিও তোমায় ঈশ্বরের নামে ক্ষমা করছি, দোরোতেয়া। এখন তুমি যেতে পারো।'

'আমাকে প্রায়শ্চিত্ত কিছু করতে দেবেন না ?'

'তোমার তার দরকার নেই, দোরোতেয়া।'

'ধন্যবাদ, পাদ্রে।'

'ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন।'

পাপস্বীকার কুঠুরির ছোট্ট জানলায় তিনি হাতের গাঁট ঠুকে আওয়াজ করলেন, অন্য-একজন স্ত্রীলোককে ডাকবার জন্যে। সে এসে যখন তার পাপস্বীকার শুরু করেছে, তাঁর মাথা নুয়ে এলো, যেন মাথাটা আর তুলে রাখতে পারছেন না। তারপর মাথাঘোরা, সব কী-রকম তালগোলপাকানো, তিনি ডুবে যাচ্ছেন কালো জলে, আলোর চর্কিপাকে, দিনের আলো টুকরো-টুকরো হ'য়ে গিয়েছে। জিভে রক্তের স্বাদ। আর সারাক্ষণ কানে বেজে চলেছে গলার স্বর···

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তিনি বললেন। 'শেষ পাপস্বীকার করেছিলে কবে ?'

'দু-দিন আগে, পাদ্রে।'

আর আজই সে আবার এখানে। এ যেন তিনি দীন-দুঃখীতে দিনরাত ঘেরাও হ'য়ে আছেন। 'কী করছো তুমি এখানে?' নিজেকে তিনি জিগেশ করলেন। 'বিশ্রাম করো। যাও, গিয়ে বিশ্রাম করো। তুমি অতিরিক্ত ক্লান্ত হ'য়ে আছো।'

পাপস্বীকার কুঠুরি ছেড়ে বেরিয়ে এসে সোজা পোশাকঘরের দিকে চ'লে গেলেন তিনি। মাথা না-ঘুরিয়েই অপেক্ষারতা অন্য মেয়েদের বললেন: 'যারা মনে করো পাপ করোনি তারা কাল খ্রিস্টপ্রসাদ পাবে।'

তাঁর পেছনে রইলো শুধু এক মর্মরধ্বনি, মৃদু।

...

আমি শুয়ে আছি সেই বিছানায়, যেখানে অনেক কাল আগে আমার মা মারা গিয়েছেন। সেই একই জাজিমের ওপর। সেই একই কালো পশমের কম্বল যার তলায় আমরা শুতাম, মা আর মেয়ে। আমি তখন মায়ের পাশে শুতাম, আমার জন্যে তাঁর কোলে ছোট্ট যে-নীড় বেঁধে দিতেন, তাতে।

যেন এখনও তাঁর নিশ্বাসের ছন্দ টের পাই সারা গায়ে, এখনও শুনতে পাই তাঁর দীর্ঘশ্বাস···যেন এখনও টের পাই তাঁর মৃত্যুর ব্যথা।

কিন্তু তা তো সত্যি নয়।

এই আমি এখানে, চিৎ শুয়ে, সঙ্গহীনতাকে ভুলতে সেই দিনগুলোর কথা ভাবছি। কারণ আমি তো এখানে মাত্র কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবো না। আর আমি আমার মায়ের বিছানাতেও নেই, আছি কালো একটা সিন্দুকের মধ্যে, কফিনের মতো কালো বাক্স, মড়াকে কবর দিতে ওরা যা ব্যবহার করে। কারণ আমি ম'রে গিয়েছি···

কোথায় আছি মনে প'ড়ে যায় আমার, আমি ভাবতে শুরু ক'রে দিই···

ভাবি বছরের সেই মরশুমের কথা যখন জামির পাকতে শুরু করে। যখন ফেব্রুয়ারির হাওয়া নুইয়ে দেয় ঝাউয়ের অঙ্কুর, অবহেলায় তারা শুকিয়ে যাবার আগে। যখন পাকা জামির তার সুবাসে ঝিম ধরিয়ে দেয় পাতিওয়।

ঐ-সব ফেব্রুয়ারির সকালে হাওয়া নেমে আসতো পাহাড় থেকে। কিন্তু মেঘ থেকে যেতো ওপরে, অপেক্ষা করতো কখন তাদের ঢোকবার পালা আসে

উপত্যকায়। তারা আকাশকে রেখে যেতো ফাঁকা নীল। হাওয়া যে-সব খেলা খেলতো রোদ ঝলকাতো তাদের ওপর, মাটির ওপর বৃত্ত এঁকে-এঁকে, উশকে দিয়ে, কমলাঝোপের ডালকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে।

আর চড়ুইরা হাসতো। হাওয়া যে-সব পাতা উড়িয়ে নিয়ে এসেছে তাদের তারা ঠোকরাতো আর হাসতো। তারা ধাওয়া ক'রে যেতো প্রজাপতিদের, কাঁটাঝোপে ফেলে রেখে যেতো গুটিকয় পালক—আর হাসতো। বছরের সেটা সেই মরশুম।

ফেব্রুয়ারি, সকালগুলো যখন হাওয়া আর চড়ুই আর নীল আলো। আমার মনে পড়ে।

তারপর আমার মা মারা গেলেন।

আমার উচিত ছিলো ডুকরে-ওঠা, উচিত ছিলো মরীয়া হতাশায় দুই হাত চেপে ধ'রে ভেঙে-ফেলা। তা-ই তো তুমি চেয়েছিলে। কিন্তু তা সুখী এক সকালবেলা হ'লো না কেন? হাওয়া এসেছিলো খোলা দুয়োর দিয়ে, মর্নিংগ্লোরি লতায় শরশর শব্দ তুলে। সবে তখন আমার পায়ে কচি হালকা রোম গজাতে শুরু করেছে, শিরার ফাঁকে-ফাঁকে, আর আমার হাতগুলো থাকে উষ্ণ কম্পমান যখন তারা ছোঁয় আমার কপাল। চড়ুই পাখিরা খেলা করছে। পাহাড়ের ঢালে দুলছে গম। আমার দুঃখ হচ্ছিলো, জুঁই ফুলের মধ্যে হাওয়ার খেলা মা আর দেখতে পাবে না, যে মা রোদ্দুরের কাছে চোখ মুদে ফেলেছে। কিন্তু ডুকরে-ওঠা উচিত ছিলো কেন আমার?

তোমার মনে পড়ে, হুস্তিনা? তুমি বারান্দা ধ'রে পেতে দিয়েছিলে চৌকিগুলো, যাতে, তাঁকে যারা দেখতে আসবে তারা তাদের পালা আসা অব্দি ব'সে-ব'সে অপেক্ষা করতে পারে। চৌকিগুলো ফাঁকা প'ড়ে রইলো। আর মোমবাতিগুলোর মধ্যে আমার মা, একা। তাঁর পাণ্ডুর মুখ। তাঁর আড়-ধরা রাঙা ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে শাদা দাঁত। তাঁর চোখের পাতারা এখন শান্ত, চুপচাপ, আর তাঁর হৃৎপিণ্ডও। আর তুমি আর আমি, একসঙ্গে, সেখানে, অন্তহীন জপ ক'রে যাচ্ছি প্রার্থনা, তিনি শুনতে পাচ্ছেন না কিছুই, রাতের হাওয়ার শনশনের মধ্যে সবকিছু হারিয়ে-যাওয়া।

তুমি ইস্ত্রি ক'রে দিয়েছিলে তাঁর কালো পোশাক, মাড় দিয়েছিলে গলবন্ধ আর হাতার মণিবন্ধে যাতে তাঁর হাত দুটিকে সঠিক দেখায় যখন আমরা আড়াআড়ি শুইয়ে দেবো তাঁর বুকে। তাঁর সেই মমতাময় বুকে যেখানে মাথা

রেখে আমি ঘুমোতাম। যে-বুক আমায় খাওয়াতো, আমায় দোল দিয়ে-দিয়ে ঘুম পাড়াতো।

কেউ তাঁকে দেখতে আসেনি। সে-ই ভালো। মৃত্যু তো এমনভাবে বিলিয়ে দেয়া হয় না যেন সেটা কোনো ভালো জিনিশ। শোক-দুঃখের খোঁজে কেউই ঘুরে বেড়ায় না।

ওরা দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলো। সাড়া দিয়েছিলে তুমি।

'তুমি যাও,' আমি বলেছিলাম। 'আমি কাউকে দেখতে চাই না। আর ওদের বলো চ'লে যেতে। ওরা গ্রেগরীয় যাগের জন্যে টাকা চায়? কিন্তু তিনি তো কোনো টাকা রেখে যাননি। ওরা খ্রিস্টযাগ না-গাইলে তিনি কখনও শুদ্ধিকরণের গণ্ডি ছেড়ে বেরুতে পারবেন না? ওরা বিচার করবার কে, হুস্তিনা? তুমি বলছো আমার মাথাখারাপ। ঠিক আছে।'

চৌকিগুলো শূন্য প'ড়ে ছিলো যতক্ষণ-না আমরা তাঁকে কবর দিতে বেরুলাম। যে-ভাড়াটে লোকগুলো কফিন নিয়ে গেলো, তারা অচেনা লোকের পেসোর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছিলো। তারা আমাদের শোকের কাছে অচেনা। সমাধির মধ্যে কফিনটা তারা নামিয়েছিলো আস্তে, সাবধানে, যখন হাওয়া তাদের ঠাণ্ডা ক'রে গেলো গোরস্থানের পথে তাদের দীর্ঘ পথচলার পর। তাদের চোখগুলো ছিলো ঠাণ্ডা, উদাসীন। তারা তোমাকে কত দিতে হবে বলেছিলো আর তুমি টাকা চুকিয়ে দিয়েছিলে, যেন তুমি সওদা করতে এসেছো দোকানে। তুমি তোমার রুমাল ভিজিয়ে ফেলেছিলে, বারে-বারে তা নিংড়েছিলে, এবার তুমি গিঁট খুলে গুনে-গুনে দিলে সৎকারের টাকা…

তারা চ'লে যাবার পর তুমি তাঁর কবরের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছিলে আর চুমু খেয়েছিলে মাটি, আর তুমি হয়তো তা খুঁড়তে শুরু ক'রে দিতে আমি যদি না-বলতাম: 'চলো, বাড়ি যাই, হুস্তিনা। মা এখানে নেই। একটা মৃতদেহ ছাড়া এখানে আর-কিছু নেই।'

…

'এত কথা বললো কে, দোরোতেয়া? সে কি তুমি?'

'অ্যাঁ? আমি একটু ঢুলছিলাম। ওরা কি এখনও তোমায় ভয় দেখাচ্ছে নাকি?'

'কাকে কথা বলতে শুনলাম যেন। মেয়ের গলা। ভেবেছিলাম তুমি।'

'মেয়ের গলা? এ নিশ্চয়ই সে-ই হবে সারাক্ষণ যে আপন মনে বকে, দোনিয়া সুসানিতা। একটা বড়ো সমাধির তলায় তার কবর, আমাদের কাছেই। স্যাঁৎসেঁতে ভাবটা নিশ্চয়ই তার কাছে পৌঁছেছে, আর ঘুমের মধ্যে সে পাশ ফিরেছে।'

'কে সে?'

'পেদ্রো পারামোর শেষ বৌ। কেউ-কেউ বলে তার নাকি মাথা খারাপ, অনেকে বলে মোটেই না। আসলে, যখন বেঁচে ছিলো তখনও সে সারাক্ষণ আপন মনে বকতো।'

'সে নিশ্চয়ই অনেক দিন আগে মারা গিয়েছে?'

'ও, হ্যাঁ। অনেক দিন আগে। তাকে কী বলতে শুনলে?'

'তার মায়ের সম্বন্ধে কী যেন।'

'কিন্তু তার তো কোনো মা-ই ছিলো না!'

'তা, সেই কথাই তো বলছিলো।'

'অন্তত, এখানে আসার সময় সে তার মাকে সঙ্গে ক'রে আনেনি। না, সবুর, এখন আমার মনে পড়ছে। এখানেই সে জন্মেছিলো, আর হ্যাঁ, তার মা মারা গিয়েছিলো যক্ষ্মায়। ভারি অদ্ভুত মেয়েমানুষ ছিলো তার মা, কক্খনো কারু সঙ্গে দেখা করতে যায়নি।'

'সেই কথাই সে বলছিলো, যে মরবার সময় কেউ তার মাকে দেখতে আসেনি।'

'কিন্তু সে-কোন্ সময়কার কথা ভাবছিলো সে? লোকে বাড়ি যাবে না, সে ঠিক, যক্ষ্মার ছোঁয়াচের ভয় ছিলো তাদের। সেই সব মনে করছিলো বুঝি?'

'হ্যাঁ, সেই কথাই সে বলছিলো।'

'পরের বার তার কথা যখন শুনতে পাবে, আমায় বোলো। কী বলে, শুনতে চাই।'

'শোনো। আমার মনে হয় সে কিছু বলবে। আমি মৃদু গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি।'

'না-না, এ সে নয়। এ আরো দূর থেকে আসছে, অন্য দিক থেকে। তাছাড়া এ পুরুষের গলা। এইসব পুরোনো মড়াগুলোর কী হয়, জানো? যখন ওদের কাছে জল সেঁধোয়, তারা নড়তে শুরু করে। আর তখন তারা জেগে যায়। শোনো, লোকটা কথা বলছে।'

'...স্বর্গ বিশাল, মহান। সে-রাত্রে ঈশ্বর আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি যদি না থাকতেন, তবে যে কী হ'তো জানি না। কারণ আবার যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে...'

'শুনতে পাচ্ছো একে, হুয়ান প্রেসিয়াদো?'

'হ্যাঁ।'

'...আমার সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি। ওঠবার সময় পাথরের ওপর রক্তের একটা পুকুরে আমার হাত পড়েছিলো। আর সে-রক্ত আমার। রক্তের একটা দিঘি। কিন্তু আমি ম'রে যাইনি। বুঝতে পারছিলাম আমি। জানতাম যে দোন পেদ্রো আমায় খুন ক'রে ফেলতে চাননি। শুধু আমাকে একটু ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন, ব্যস, এইটুকুই। তিনি শুধু জানতে চাচ্ছিলেন দু-মাস আগে আমি ভিলমাইয়োতে গিয়েছিলাম কিনা। সান ক্রিস্তোবাল পরবের দিন। বিয়েতে। কোন্ বিয়ে? কোন্ দিন? নিজের রক্তে গড়াগড়ি যেতে-যেতে আমি তাঁকে শুধিয়েছিলাম: "কোন্ বিয়ে, দোন পেদ্রো? না, না, দোন পেদ্রো, আমি সেখানে যাইনি। হয়তো জায়গাটার পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম, তবে সে নেহাৎই কাকতাল—দৈবাৎ..." আমাকে নিকেশ ক'রে দেবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না। তিনি আমাকে খুলো ক'রে রেখে গেছেন, দেখতেই তো পারছো। কিন্তু আমায় তিনি মেরে ফ্যালেননি। লোকে বলে সেই থেকে আমার একটা চোখ টেরা হ'য়ে যায়, যা ভয় দেখিয়েছিলেন তিনি আমায়! মূল কথাটা এই যে পরে আমি সত্যিকার মরদ হ'য়ে উঠেছিলাম। স্বর্গ মহান। কেউ তাতে সন্দেহ করতে পারবে না—'

'এ কে, দোরোতোয়া?'

'ভিড়ের একজন। তাঁর বাবা গুলি খেয়ে মরবার আগে পেদ্রো পারামো একটা কশাইখানা খুলে বসেছিলেন, লোকে বলে বিয়েতে যারা গিয়েছিলো সবাইকে তিনি খুন করেছিলেন। দোন লুকাস পারামোর নিতবর হবার কথা ছিলো, কিন্তু যা ঘটেছিলো তা নেহাৎই এক দুর্ঘটনা, কারণ তারা মারতে চেয়েছিলো বরকেই। পেদ্রো পারামো বার করতে পারেননি কে গুলি চালিয়েছিলো, কাজেই তিনি সকলকেই খুন ক'রে শোধ নিয়েছিলেন। বিয়ে হবার কথা ছিলো ঐ ভিলমাইয়ো টিলায়, যেখানে আগে কতগুলো র‍্যান্‌চ ছিলো, অনেক দিন হ'লো সব হাপিশ হ'য়ে গিয়েছে—শোনো, মনে হয় দোনিয়া সুসানিতাই আবার কথা বলছে। তোমার কচি বয়েস,

কান তাজ', মন দিয়ে শোনো, তবেই আমায় বলতে পারবে সে কী বলছে।'

'আমি তার কথা বুঝতে পারছি না। মনে হয় না কথা বলছে, শুধু ফোঁপাচ্ছে।'

'কী নিয়ে?'

'জানি না।'

'কিছু একটা নিয়ে নিশ্চয়ই। এমনি এমনি তো আর ফোঁপাবে না। ভালো ক'রে শোনো।'

'শুধু ফোঁপাচ্ছে, আর কিছু না। হয়তো পেদ্রো পারামো তাকে কষ্ট দিয়েছিলো।'

'বিশ্বাস কোরো না সে-কথা। আমি অন্তত বলতে পারি ওকে যেমন ভালোবাসতেন তেমন আর কাউকে বাসেননি। ওকে এতই ভালোবাসতেন যে জীবনের বাকি দিনগুলো একটা চৌকিতে গুটিয়ে ব'সেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়েটিকে কবর দেবার জন্যে যে-পথ ধ'রে ওরা গিয়েছিলো, সেই দিকে তাকিয়ে। সবকিছু থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফ্যালেন। খেতগুলো ফাঁকা প'ড়ে থাকতে দেন, সব চাষবাসের জিনিশ পুড়িয়ে ফ্যালেন। কেউ-কেউ বলতো সে খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন ব'লে, অন্যরা বলতো তাঁর মোহ কেটে গিয়েছিলো, কিন্তু একটা জিনিশ ঠিক - সবাইকে তিনি ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন, শুধু জবুথবু ব'সে থাকতেন চৌকিটায়, রাস্তার দিকে মুখ।

'তারপর খেতগুলো গোল্লায় গেলো। হাল না-পড়ায় আগাছা আর বিছুটিতে এমনভাবে খেতগুলো দম আটকে মরলো যে দেখলে কষ্ট হয়। তখনই লোকজন চ'লে যেতে শুরু করে। প্রথমে যায় পুরুষরা, অন্য কাজের ধান্দায়। আমার সেই দিনগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে যখন কোমালা ভরপুর হ'য়ে ছিলো বিদায়ে আর বিচ্ছেদে। এমনকী যারা কোমালা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে তাদের বিদায় শুভেচ্ছা জানানোটাও যেন সুখের বিষয়, ছিলো। ফিরে-আসার মৎলব ছিলো তাদের, তাই সংসার-সম্পত্তি পেছনে ফেলে রেখেই তারা গিয়েছিলো। তারপর কেউ-কেউ পরিবারের লোকদের নিয়ে গেলো। সম্পত্তির জন্যে খোঁজ নেয়নি অবিশ্যি, আর তারপর তারা যেন গ্রামটার কথা ভুলেই গেলো, ভুলে গেলো আমাদের, বাকি যারা ছিলাম গ্রামে, এমনকী সম্পত্তিও ভুলে গেলো। আমি থেকে গিয়েছিলাম কারণ ত্রিসংসারে আমার কোনো-যাবার জায়গা ছিলো না। অন্য

যারা ছিলো, থেকে গিয়ে অপেক্ষা করছিলো কবে পেত্রো পারামো মরেন, কারণ তারা বলতো তিনি নাকি তাঁর বিষয় সম্পত্তি ইষ্টিপত্রে তাদের লিখে দিয়ে যাবেন ব'লে কথা দিয়েছেন, আর সেই আশাতেই তারা এখানে থাকছিলো। কিন্তু বছরের পর বছর চ'লে গেলো, পেত্রো পারামো মরেনই না, তিনি ঠায় ব'সে রইলেন মেদিয়া লুনায়, কাকতাড়ুয়ারমতো।

'তিনি মারা যাবার অল্প কিছুকাল আগে ক্রিস্তেরোরা বিদ্রোহ করে, আর ফৌজ এসে অল্প যে-কজন পুরুষ এখানে ছিলো পাকড়ে নিয়ে যায়। সেইসময়েই আমি ক্ষুধায় অনাহারে মরতে শুরু করেছিলাম, আর কখনও আমি জীবনের নাগাল পাইনি।

'আর এইসবই কিনা দোন পেত্রোর ভাবনাগুলোর দরুন। তাঁর শোকের জন্য। কী? না, বৌ মরেছে। ঐ সুসানিতা। কাজেই ওকে তিনি ভালোবাসতেন কিনা সেটা তুমি অনুমান ক'রে নিতে পারো।'

...

ফুলহোর সেদানো তাকে জিগেশ করলে : 'পাত্রান, জানেন কে ফিরে এসেছে?'

'কে?'

'বার্তোলোমে সান হুয়ান।'

'তো?'

'ঠিক সেই কথাই আমিও নিজেকে শুধিয়েছি : এখানে ও কী করছে?'

'তুমি তদন্ত করোনি?'

'না। ব্যাপারটা হ'লো ও কোনো বাড়ির খোঁজ করেনি। সোজা সেই পুরোনো বাড়িটায় গিয়ে হাজির হয়েছে—ঐ যেটায় আপনি থাকতেন। ঘোড়া থেকে সোজা জিন-লাগাম খুলে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে নিলো, যেন আপনি এর মধ্যেই বাড়িটা ওকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। অন্তত সেই রকমই দেখালো ব্যাপারটা।'

'তোমার আক্কেলটা কী, ফুলহোর? কী হচ্ছে না-হচ্ছে সেটা তো তোমারই খোঁজ করবার কথা। সেইজন্যেই কি তোমাকে রাখা হয়নি?'

'আমি একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। তবে আপনি যদি দরকার মনে করেন কাল গিয়ে আমি সরেজমিন তদন্ত ক'রে আসবো।'

'কাল কী হবে সেটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। আমিই তার বোঝাপড়া করবো। ওরা দুজনেই ফিরে এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। সান হুয়ান আর তার বৌ। আপনি কী ক'রে জানলেন?'

'বৌ, না তার মেয়ে? মেয়ে হ'তে পারে না সে?'

'তার সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করছিলো তা থেকে মনে হ'লো বৌই হবে।'

'তুমি শুতে যেতে পারো, ফুলহোর।'

'শুভরাত্রি, দোন পেদ্রো।'

'তিরিশ বছর ধ'রে আমি তোমার ফিরে-আসার অপেক্ষা করছি, সুসানা,' পেদ্রো পারামো বললে। 'আশা করেছিলাম সবকিছুই পাবো—নিছকই একটা-কিছু নয়, সবকিছু। যা-কিছু আমরা চাইতে পারি জীবনে, সব...আর তার সবটাই তোমার জন্যে। কত বার আমি তোমার বাবাকে ফের এখানে থাকতে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছি? বলেছি, তাকে আমার প্রয়োজন। এমনকী এমন-সব কথাও বলেছি যা মোটেও সত্যি নয়।

'তাকে ফোরম্যানের কাজ অব্দি দিতে চেয়েছিলাম, সে শুধু তোমাকে আবার চোখে দেখবো ব'লেই। আর কী জবাব সে দিয়েছিলো? "কোনো উত্তর দেননি," সবসময় দূত ফিরে এসে বলেছে। "তাঁকে দেবামাত্র দোন বার্তোলোমে আপনার চিঠি কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছেন।" কিন্তু আমি চরের মুখে শুনেছি তুমি বিয়ে করেছো, তারপর বিধবা হ'য়ে ফের বাপের বাড়ি চ'লে এসেছো।

'তারপর স্তব্ধতা। দূতেরা এসেছে গিয়েছে, প্রতিবারই ফিরে এসে আমায় বলেছে: "আমি ওঁদের খুঁজে পাইনি, দোন পেদ্রো। শুনেছি ওঁরা মাস্কোতা ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন। কিন্তু কোথায় যে গিয়েছেন সে নিয়ে লোকে একমত নয়।"

'আর আমি বলেছি, "খরচের কথা ভেবো না। খুঁজে বার করো ওদের। এমনকী মাটি যদি ওদের গিলে খেয়ে থাকে, তবু।"

'শেষটায় একদিন এসে সে আমায় বলে: "সারা সিয়েরা আমি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেছি, দোন বার্তোলোমে সান হুয়ান কোথায় লুকিয়ে আছেন খুঁজে বার করার জন্যে—অবশেষে তাঁদের খুঁজে পেয়েছি। পাহাড়ের মধ্যে একটা গর্তে লুকিয়ে আছেন—লা আন্দ্রোমেদা নামে একটা বাতিল খনির কাছে একটা কাঠের বাড়িতে।"

'অদ্ভুত সব হাওয়া বইতো তখন। লোকে বলাবলি করতো, বিপ্লব নাকি

ফেটে পড়েছে। আমরা তার গুজব শুনতাম। সেটাই তোমার বাবাকে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। নিজের কথা ভেবে নয়, তাঁর চিঠিতে তিনি বলেছেন, শুধু তোমার নিরাপত্তার জন্যে। তিনি তোমাকে এমন জায়গায় আনতে চেয়েছেন যেখানে লোকজন আছে।

'আমার মনে হচ্ছে, স্বর্গ বুঝি খুলে গেলো। তোমার কাছে ছুটে চ'লে যেতে ইচ্ছে করছে। তোমাকে সুখে ঘিরে ফেলতে ইচ্ছে করছে, সুসানা। কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আর কত কেঁদেছি আমি, সুসানা, যখন জেনেছি যে তুমি আবার ফিরে আসছো।'

'কতগুলো গ্রামের স্বাদ দুর্ভাগ্যেভরা, তাদের বাসি বাতাস এক ঢোঁক গিলেই তুই তা ধ'রে নিতে পারবি। দুঃস্থ, রুগ্ন—যা-কিছু জীর্ণ পুরোনো তার মতো। এটা সে-রকমই একটা গ্রাম, সুসানা।

'লা আন্দ্রোমেদায় তুই অন্তত সময় কাটাতে পারতিস কত কী জন্মাচ্ছে দেখে-দেখে: মেঘ, পাখি, শ্যাওলা। মনে পড়ে তোর? কিন্তু এখানে তুই যেখানেই যাস না কেন সেই একই বাসি হলুদ ছাড়া আর-কিছু নেই। গ্রামটাই দুর্ভাগ্য, অলুক্ষণে। দুর্ভাগ্য ছাড়া আর-কিছু নয়।

'সে আমাদের ফিরে আসতে বলেছে। ঋণ দিয়েছে তার বাড়ি, যা কিছু আমাদের চাই, সব দিয়েছে। কিন্তু তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবার কোনোই কারণ নেই আমাদের। আমরা যে এখানে আছি, এটাই দুর্ভাগ্য। কারণ আমাদের প্রতি ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হবে না। আমি তা ব'লে দিতে পারি।

'জানিস তুই পেদ্রো পারামো আমাকে কী বলেছে? যা-কিছু দিয়েছে, সব এমনি-এমনি, বিনিদামে; এটা আমি আশা করিনি, আমি তাকে গায়ে-গতরে খেটে সব শোধ ক'রে দিতে তৈরি ছিলাম—একভাবে না একভাবে তাকে শোধ ক'রে দিতেই হবে ঋণ। আমি তাকে লা আন্দ্রোমেদার কথা সব খুলে বলেছি, তাকে খুলে দেখিয়েছি ঠিক মতো কাজ করতে পারলে তার অনেক সম্ভাবনা আছে। আর তুই জানিস সে কী বলেছে? "খনিতে আমার কোনো রুচি বা আগ্রহ নেই, বার্তোলোমে সান হুয়ান। আপনার কাছ থেকে একমাত্র যা আমার চাই

সে আপনার কন্যা। জীবনে সেরা কাজ যা করেছেন আপনি, সে আপনার কন্যাটি।"

'সে তোকে ভালোবাসে, সুসানা। বলেছে যে, তোরা যখন ছোটো ছিলি তখন নাকি একসঙ্গে খেলা ক'রে বেড়াতিস। যে, সে তোকে জানে। যে, যখন ছোটো ছিলি একসঙ্গে তোরা নদীতে সাঁতার কাটতে যেতিস। আমি তা জানতাম না। যদি জানতাম, তবে তোকে ঠেঙিয়েই আমি মেরে ফেলতাম।'

'তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'এই কথা বললি আমায়? যে তাতে তোর কোনো সন্দেহ নেই?'

'হ্যাঁ, তা-ই তো বলেছি।'

'বলতে চাস, তুই ওর সঙ্গে শুতে চাস?'

'হ্যাঁ, বার্তোলোমে।'

'জানিস না ও বিবাহিত? জানিস না শয়ে-শয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গে ও শুয়েছে!'

'জানি, বার্তোলোমে।'

'আমাকে বার্তোলোমে ব'লে ডাকিস না! আমি তোর বাবা।'

বার্তোলোমে সান হুয়ান। এক মৃত খনিশ্রমিক। সুসানা সান হুয়ান। লা আন্দ্রোমেদার খনিতে মরা এক খনিশ্রমিকের মেয়ে। বার্তোলোমে তা স্পষ্ট দেখতে পেলে মনশ্চক্ষুতে। 'আমাকে ওখানে চ'লে যেতে হবে মরতে,' সে ভাবলে। তারপর বললে:

'তুই বিধবা। কিন্তু আমি ওকে বলেছি তুই এখনও তোর স্বামীর ঘর করছিস—কিংবা অন্তত সেইভাবেই তুই থাকিস। আমি ওকে ভুজুংভাজুং দিয়ে ভাবনাটা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছি, কিন্তু ওর সঙ্গে কিছু বলতে গেলেই ও কেবল চোখ কুঁচকে তাকায়; আর যখনই তোর নাম করি চোখ বুজে ফ্যালে। তার মানে কী, আমি জানি। সেটা ডাহা অমঙ্গল। সেটা পেদ্রো পারামো, স্বয়ং।'

'আর আমি কে?'

'তুই আমার মেয়ে। আমার। বার্তোলোমে সান হুয়ানের মেয়ে।'

সুসানার মনে আস্তে-আস্তে চিন্তা জাগতে লাগলো, প্রথমে খুবই ধীরে, তারপর ভাবনারা এত দ্রুত ছুটে এলো যে সে শুধু বলতে পারলে: 'তা সত্যি নয়। তা সত্যি নয়।'

'জগৎটা কেন চারপাশ থেকে আমাদের চেপটে ফ্যালে, কেন ভেঙে ফ্যালে আমাদের টুকরো-টুকরো, কেন জমি সজল হ'য়ে ওঠে আমাদের রক্তে? কী আমরা করেছি? কেন প'চে যায় আমাদের আত্মা?—তোর মা বলেছিলো অন্তত ঈশ্বরের কৃপা থাকবে আমাদের জন্যে। আর তুই তা অস্বীকার করছিস, সুসানা। কেন তুই বললি আমি তোর বাবা নই? তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?'

'তুমি জানতে না?'

'তোর কি মাথা খারাপ?'

'মাথা খারাপ তো বটেই, বার্তোলোমে। তুমি জানতে না?'

'জানো, ফুলহোর, সে জগতে সবচেয়ে সুন্দরী। আমি ভেবেছিলাম তাকে বুঝি চিরকালের মতো হারিয়ে বসেছি। আর এখন আমি তাকে আবার হারাতে চাই না। বুঝেছো, ফুলহোর, বুঝতে পারো তুমি? তার বাপটাকে গিয়ে বলো খনিতে কাজ করতে। আর ওখানে…দূরে…অনুমান করি কোনো বুড়োর পক্ষে ওখানে উধাও হ'য়ে-যাওয়া খুবই সহজ হবে। কেউ কখনও ওখানে যায় না। ঠিক কিনা?'

'হ'তে পারে।'

'হ'তেই হবে। ওকে বাপ-মা হারা অনাথিনী হ'তে হবে। আর অনাথাদের দেখাশুনো করাই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ঠিক?'

'খুব কঠিন ব্যাপার হবে ব'লে শোনাচ্ছে না।'

'তাহ'লে কাজে লেগে পড়ো, ফুলহোর, কাজে লেগে পড়ো।'

'কিন্তু সে যদি জেনে ফ্যালে?'

'তাকে কে বলতে যাবে? আচ্ছা, আমরা দুজনেই শুধু জানবো তো—তবে তাকে কে বলতে যাবে?

'কেউ যাবে ব'লে মনে হয় না।'

'তোমার ঐ "মনে হয় না" থামাও। দেখবে সব তাক মাফিক হয়ে যাবে। লা আন্দ্রোমেদায় কী করতে চেয়েছিলো, সে-কথা ওকে মনে করিয়ে দাও। ওকে ওখানে কাজ করতে পাঠিয়ে দাও। তবে বোলো যে ওখানে ওকে থাকতে হবে না। আর বোলো যাবার সময় মেয়েটাকে যাতে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে না-যায়,

কারণ আমরা এখানে তার দেখাশুনো করবো। ওর কাজ হবে ওখানে, ঘরবাড়ি থাকবে এখানে। এইভাবেই ওকে বুঝিয়ে বলো, ফুলহোর।'

'আপনি যেভাবে মৎলব আঁটছেন, পাত্রোন, আমার পছন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে আবার যেন আপনি তরতাজা যুবক হ'য়ে গেছেন।

কোমালার উপত্যকায় বৃষ্টি পড়ছে। হালকা ফুরফুরে বৃষ্টি; যেখানে কেবল আকাশ ফেটে বাদল ঝরে, তার পক্ষে একটু অসাধারণই। দিনটা রবিবার। আর ইণ্ডিয়ানরা নেমে এসেছে আপান্হো থেকে, সুতোয় ঝুলিয়ে এনেছে তাদের ছোটোখাটো ফলমূল, তাদের চিরহরিৎ সুগন্ধিপাতা, তাদের গন্ধপাতার গোছা। তারা কোনো ওকোতে আনেনি, কারণ কাঠ ভিজে আছে, আনেনি কোনো পাতার ছাতাও, কারণ দীর্ঘ বর্ষায় তারাও ভিজে চুপচুপে হ'য়ে আছে। তারা শুধু তাদের যাবতীয় ভেষজ তোরণপথের তলায় পেতে বিছিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বৃষ্টি প'ড়েই চললো গর্তের জলের ওপর। মাটির ভাঁজ ধ'রে-ধ'রে নদীর সরু-সরু স্রোতের মতো জল ছুটে চলেছে যেখানে নতুন ভুট্টার অঙ্কুর গজাচ্ছে। পুরুষরা কেউ হাটে আসতে পারেনি কারণ তারা আলগুলো ভাঙছে, যাতে জল অন্য খাতে চ'লে যায়, নতুন অঙ্কুরগুলোকে ভিজিয়ে না-দেয়। ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হ'য়ে কাজ করছে তারা, বেমক্কা কাজ করছে বন্যা-ভেজা খেতে বৃষ্টির মধ্যে, শাবলগুলো দিয়ে ভেঙে-ভেঙে দিচ্ছে নরম চাপড়াগুলো, হাত দিয়ে এঁটে বসাচ্ছে অঙ্কুর আর চারা, চেষ্টা করছে তাদের বাঁচাতে যাতে তারা গজিয়ে ওঠে দীঘল আর সতেজ।

ইণ্ডিয়ানরা সবুর করছে। দুর্ভাগ্য একটা দিন এটা, তাদের মনে হ'লো। হয়তো সেইজন্যেই তারা তাদের খড়ের বর্ষাতির মধ্যে কাঁপছে, ঠাণ্ডায় নয়, ভয়ে। তারা দেখছে বৃষ্টি প'ড়েই চলেছে; হাঁ ক'রে তারা মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কেউ এলো না। গ্রামটাকে মনে হ'লো কেমন পরিত্যক্ত, ফাঁকা। মধ্যদিন নাগাদ তাদের বর্ষাতিগুলো একটানা ভিজে-ভিজে ভারি হ'য়ে গেলো। তারা গল্পগুজব করছে, রঙ্গরসিকতা করছে, হাসাহাসি করছে তা নিয়ে। ভেজা ফলমূলগুলোর ওপর জলের ফোঁটা প'ড়ে চকচক করছে। 'একটু পুল্‌কে যদি নিয়ে

আসতাম সঙ্গে, তারা ভাবছে, 'বৃষ্টিতে তাহ'লে কিছুই এসে যেতো না। কিন্তু মাগুয়েই খেতগুলো কাদার সমুদ্র হ'য়ে ছিলো, ফলে কীই বা করতে পারতাম?'

মেদিয়া লুনা থেকে যে-রাস্তাটা বেরিয়ে এসেছে, সেটা ধ'রে এলো হুস্তিনা দিয়াস, ছাতের নালি থেকে জল প'ড়ে প'ড়ে পায়ে-চলা রাস্তায় যে জল জ'মে আছে তাকে পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে। গির্জের ফটকের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে বুকে ক্রুশ আঁকলো, তারপর চ'লে এলো তোরণপথে। ইণ্ডিয়ানরা সবাই তাকে দেখতে ফিরে তাকালে। যেন তারা তাদের চোখ দিয়ে তাকে তন্নতন্ন ক'রে হাৎড়াচ্ছে। তাদের সাজিয়ে-রাখা প্রথম বেসাতির সামনে থামলো হুস্তিনা, কিনলো দশ সেন্তাভোর সুগন্ধি চিরহরিৎ, তারপর ফিরে এলো, তার পেছন-পেছন এলো ঐসব স্তব্ধ চাউনি।

'সবকিছুই আজকাল মাগ্‌গি হ'য়ে গিয়েছে,' মেদিয়া লুনার দিকে ফিরে যেতে-যেতে সে বললে, আপন মনে। 'এই একটুখানি শুকনো সুগন্ধি চিরহরিতের জন্যে কিনা দশ-দশ সেন্তাভো। কোনো গন্ধ হবার মতোও যথেষ্ট চিরহরিৎ নয়।'

সন্ধেবেলায় ইণ্ডিয়ানরা তাদের বেসাতি গুটিয়ে নিলে, কাঁধে ভারি-ভারি পুঁটুলি নিয়ে পা ফেললো বৃষ্টির মধ্যে। গির্জেয় গিয়ে তারা কুমারীর জপ করলে, নিবেদন ক'রে গেলো একগোছা গন্ধপাতা। তারপর তারা বেরিয়ে পড়লো আপানহোর পথে। হাঁটতে-হাঁটতে হাসিঠাট্টা করলো, রসিকতা শুনে হাসলো।

হুস্তিনা দিয়াস সুসানা সান হুয়ানের শোবার ঘরে চ'লে এলো, দেয়ালগিরিতে রাখলো চিরহরিতের গোছা। টানা পর্দাগুলো বাইরে আলো আটকে রেখেছে ফলে সে শুধু দেখতে পেলে কালো-কালো ছায়া। ভাবলে সুসানা সান হুয়ান বুঝি ঘুমিয়ে আছে। প্রার্থনা করলে সবসময়েই ও যেন ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু তখনই সে শুনতে পেলে একটি মৃদু দীর্ঘশ্বাস, মনে হ'লো সেটা বুঝি ঘরের কোনো অন্ধকার কোণা থেকে আসছে।

'হুস্তিনা।'

সে মাথা ফেরালো। কাউকে দেখতে পেলো না, কিন্তু পুরুষ হাতটি অনুভব করলো কাঁধে, তারপর কানে তার ঘন শ্বাস। পুরুষ গলাটি ফিশফিশ করলে: 'চ'লে যাও, হুস্তিনা। জিনিশপত্র বাঁধাছাদা ক'রে চ'লে যাও। তোমাকে আর চাই না আমরা।'

'ওঁর যে আমায় দরকার,' সে বললে, খাড়া হ'য়ে। 'ওঁর অসুখ করেছে, আমায় ওঁর দরকার।'

'আর দরকার হবে না, হুস্তিনা। এখন থেকে আমিই এখানে থাকবো, ওর দেখাশুনো করবো।'

'আপনি? দোন বার্তোলোমে?' আর তার আর্তচীৎকার এমন প্রচণ্ড হ'লো যে খেত থেকে যে-মেয়েপুরুষ ফিরছিলো তারা অব্দি তা শুনতে পেলে। তারা বলাবলি করলে: 'মানুষের চীৎকার ব'লেই শোনাচ্ছে। কিন্তু কোনো মানুষ যে এমনভাবে চ্যাঁচায়, তা কবে কে শুনেছে!'

বৃষ্টি এখন তুফান হ'য়ে উঠেছে, নিজের শব্দ ছাড়া বাকিসব আওয়াজকে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে।

'কী হ'লো, সুসানা? চীৎকার কেন?'

'আমি তো চীৎকার করিনি।'

'তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলে, সুসানা!'

'তোকে তো আগেই বলেছি আমি কখনও স্বপ্ন দেখি না। আমার জন্যে তোর কোনো দরদ নেই। ভীষণ ক্লান্ত আমি। কাল রাতে তুই বেড়ালটাকে বাইরে বের ক'রে দিসনি, আর হতচ্ছাড়া আমায় ঘুমোতেই দেয়নি।'

'বেড়ালটা আমার সঙ্গে ঘুমিয়েছিলো, আমার ঠ্যাঙের ফাঁকে। ভিজে একশা হ'য়ে ছিলো, আমার কেমন দুঃখ হ'লো, তাই আমার বিছানায় তাকে ঘুমোতে দিয়েছি। কিন্তু ও তো কোনো শোর তোলেনি।'

'না, কোনো শোর তোলেনি। শুধু সার্কাসের বেড়ালের মতো পা থেকে মাথায় লাফিয়ে গিয়েছে, আবার মাথা থেকে পায়ে ডিঙি মেরে নেমেছে। কিছু খাবার জন্যে মিউ-মিউ করছিলো।'

'আমি তো সন্ধেবেলায় ওকে খাইয়েছি, রাতে একবারও আমার কাছ ছেড়ে যায়নি। আবার তুমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছো, সুসানা।'

'বলছি না তোকে সারাটা রাত লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে আমায় ভয় দেখাচ্ছিলো। তোর বেড়াল ভারি আদুরে, কিন্তু যখন ঘুমোবার চেষ্টা করছি তখন তাকে আমি ধারে-কাছে চাই না।'

'তুমি খোয়াব দেখছো, সুসানা। সেটাই হয়েছে গোল। পেদ্রো পারামো যখন আসবেন আমি ওঁকে বলবো তোমার সঙ্গে আর আমি বনিয়ে চলতে পারছি না। ব'লে দেবো ওঁকে যে আমি চললাম। অনেক ভালো-ভালো লোক আছে যারা আমায় কাজ দেবে। তোমার মতো খ্যাপা তো কেউ নয়,

সবসময় কেবল দিকদারি করছো। কালকেই আমি চ'লে যাচ্ছি, বেড়ালটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো, তখন তুমি যত-খুশি ঘুমিয়ো।'

'তুই ভারি পাজি, হুস্তিনা। কিন্তু তুই যাবি না। কোথাও যাবি না তুই, কারণ তুই ঠিকই জানিস তুই এমন-কাউকে পাবি না যে তোকে আমার মতো ভালোবাসবে।'

'না, আমি চ'লে যাবো না, সুসানা। এখানে তোমার দেখাশুনো করার ভার আমার ওপর। তুমি কী করো না-করো, কিচ্ছু এসে যায় না, আমি এখানেই থাকবো।'

সুসানার জন্ম থেকে সে তার দেখাশুনো ক'রে আসছে। তাকে সে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে, তাকে হাঁটতে শিখিয়েছে, তাকে বড়ো হ'য়ে উঠতে দেখছে। তার চোখে তাকিয়েছে ও, সেই চোখ দুটি যা পুদিনার মেঠাইয়ের মতো দেখতে। 'পুদিনার মেঠাই নীল। হলদে আর নীল। সবুজ আর নীল। পুদিনা আর চিরহরিৎ একসঙ্গে।' সে তার পা মালিশ করেছে, তাকে আমোদ দিয়েছে নিজের মাই দুটো দিয়ে, যদিও মাই দুটি শুকনো ছিলো সবসময়, শুধু খেলনারই কাজ করেছে। 'দ্যাখো-দ্যাখো,' তাকে সে বলেছে, 'এ নিয়ে খেলা করো। এগুলো মজার খেলনা।' তাকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরেছে ও।

কলাগাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ছে টপটপ। শোনা যাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা জলের মধ্যে ফুটছে, মাটিতে যে-জল দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে।

চাদরগুলো সব ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে। নালাগুলো ফেনিয়ে উঠছে, তোড়ে জল ছুটেছে, সারা দিন, সারা রাত কাজ করেছে জল। জল ছুটেই চলেছে, ছুটে চলেছে, হিশহিশ করছে লক্ষ বুড়বুড়ি তুলে।

এখন মাঝরাত। বৃষ্টির শব্দ অন্যসব শব্দকে শ্‌শ্‌ ক'রে থামিয়ে দিয়েছে।

সুসানা সান হুয়ান উঠে বিছানা থেকে নামলো। আবার সেই ভারি-ভারি ভাবটা চেপে বসছে, পা দুটিকে বোঝার মতো ক'রে তুলেছে, তার শরীর ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চেষ্টা করছে তার মুখটা খুঁজে পেতে।

'বার্তোলোমে নাকি?'

তার মনে হ'লো সে যেন দরজার ক্যাঁচকেঁচ শব্দ শুনতে পেলো, যেন কেউ ঘরে

এসেছিলো, বেরিয়ে গেলো। আর তারপর শুধু কলাপাতার ওপর ঠাণ্ডা বৃষ্টির টপটপ।

ঘুমোতে ফিরে গেলো সে, যতক্ষণ-না মেঝের লাল ইটের ওপর আলো ফুটলো, জাগলোই না। ইটগুলোর ওপর শিশিরের ফোঁটা। নতুন একটা দিনের ধূসর সকাল।

'হুস্তিনা।' সে চেঁচিয়ে ডাকলো।

আর তক্ষুনি এসে হাজির হ'লো হুস্তিনা, কম্বল মুড়ি দিয়ে। 'কী চাই তোমার, সুসানা?'

'বেড়ালটা। আবার ঢুকে পড়েছে ভেতরে।'

'আহা আমার বেচারি সুসানা!'

তার বুকের ওপর শুয়ে তাকে সে জড়িয়ে ধরলো, যতক্ষণ-না মাথা তুলে সে জিগেশ করলে: 'তুমি কাঁদছো কেন, হুস্তিনা? পেদ্রো পারামোকে বলবো তুমি খুব ভালো ক'রে আমার যত্ন করছো। তোমার বেড়াল কেমন ক'রে আমায় ভয় দেখায়, সে সম্বন্ধে একটা কথাও বলবো না। দোহাই তোমার, হুস্তিনা, কেঁদো না।'

'তোমার বাবা মারা গেছেন, সুসানা। পরশু রাত্তিরে মারা গেছেন, আর আজ এসে ওরা বলে কিনা ওঁকে এর মধ্যেই গোর দিয়ে দিয়েছে। বড্ড দূরে ব'লে এখানে নাকি আনতে পারেনি। এখন তুমি একেবারে একা হ'য়ে গেলে, সুসানা।'

'তাহ'লে আমার বাবাই এসেছিলো,' মৃদু হাসলো সে। 'আমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিলো,' ব'লে সে মৃদু হাসলো।

অনেক বছর আগে, যখন সে তখনও এক বাচ্চা মেয়ে, বাবা তাকে বলেছিলো, 'আরো নিচে, সুসানা, বল তো কী দেখতে পাচ্ছিস?'

সে একটা দড়ি থেকে ঝুলছিলো। তার কোমরে ব্যথা লাগছিলো, হাতদুটি রক্তারক্তি হ'য়ে গিয়েছিলো, তবু সে দড়িটা ছেড়ে দিতে চায়নি, কারণ সেটাই ছিলো বাইরের জগতের সঙ্গে তার একমাত্র যোগসূত্র।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, পাপা।'

'ভালো ক'রে ছাখ, সুসানা। কিছু-একটা নিশ্চয়ই আছে।'

আর নিজের বাতিটা দিয়ে তাকে সে আলো ক'রে তুলেছিলো।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, পাপা।'

'আরো-একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি তোকে। তলায় চ'লে গেলে বলবি।'

পাথরের ফলকগুলোর মধ্যে একটা ছোটো গর্তে সে ঢুকে পড়েছিলো, আর হাৎড়ে-হাৎড়ে গিয়েছিলো পুরোনো পচা তক্তার ওপর দিয়ে, চিড়-ধরা, টুকরো-টুকরো, ধূলিধূসর সব।

'আরো নিচে, সুসানা। ঠিক দেখতে পাবি যা বলেছিলাম।'

আর সে নেমেছিলো নিচে, আরো-নিচে, দুলতে-দুলতে, অন্ধকারে, আর একটা ভর দেবার জায়গা খুঁজছিলো তার পা।

'নিচে, সুসানা, আরো-নিচে। কিছু দেখতে পেলে আমায় বলিস।'

তলায় পৌঁছে সে নিশ্চল দাঁড়িয়েছিলো, এত ভয় পেয়েছিলো যে কথাই বলতে পারছিলো না। বাতির আলো ঘুরে বেড়ালো গোল হ'য়ে যতক্ষণ-না তাকে খুঁজে পেলো। বাবার চীৎকারে সে কেঁপে উঠেছিলো :

'নিয়ে আয়, সুসানা, ওখানে কী পেয়েছিস!'

করোটিটা তুলে ধরেছিলো সে, তারপর আলোয় নিয়ে এসে যেই দেখেছিলো কী, হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলো।

'মড়ার মাথার খুলি,' সে বলেছিলো।

'যা পাবি সব নিয়ে আয়। এটার কাছে আরো-কিছু নিশ্চয়ই আছে।'

মাথার খুলিটা গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেলো। চোয়াল খুলে এলো, যেন চিনির তৈরি। পর-পর টুকরো কুড়িয়ে চলেছিলো সে, যতক্ষণ-না পৌঁছেছিলো পায়ের আঙুলের একরত্তি হাড়গুলোয়।

'আরো-কিছুর খোঁজ কর, সুসানা। টাকা। সোনার চাঁদি। গোল-গোল সোনার চাকা। খোঁজ, সুসানা, খোঁজ।'

যখন সে তার বাবার হিম চাউনির সামনে ভয় পাচ্ছিলো, নিজের সম্বন্ধে কিছুই সে জানতো না তখন, অনেকদিন পরে ছাড়া জানেনি।

সেইজন্যেই এখন সে হাসছে।

'আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি তুমি এসেছিলে, বার্তোলোমে।'

আর বেচারি হুস্তিনা, যে তার বুকের ওপর প'ড়ে-প'ড়ে কাঁদছে, সে তাকে হাসতে দেখে উঠে পড়তে বাধ্য হ'লো। তারপর হাসি বদলে গেলো বন্য-এক খিকখিক আওয়াজে।

এখনও বৃষ্টি প'ড়ে চলেছে। ইণ্ডিয়ানরা চ'লে গিয়েছে। দিনটা সোমবার। কোমালা উপত্যকা এখনও বৃষ্টির মধ্যে ডুবে আছে।

সেইসব দিনে হাওয়া বইছিলো শন-শন, সেই হাওয়া যা বৃষ্টি নিয়ে এসেছে। এখন বৃষ্টি চ'লে গিয়েছে বটে, কিন্তু হাওয়া থেকে গিয়েছে। ভুট্টার অঙ্কুর শুকোচ্ছিলো মাঠে-মাঠে, হাওয়ার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তারা এখন শুয়ে পড়েছে। দিনের বেলায় মোটামুটি সওয়া যায়, যদিও হাওয়া ঝাঁকিয়ে যায় লতাপাতা, ঝমঝম বাজায় ছাতের টালি; কিন্তু রাতের বেলায় হাওয়া শুধু ফোঁপায় আর ফোঁপায়। মেঘেরা ভেসে চলে মাটির ওপর, মস্ত শুব্ধ চাঁদোয়ার মতো।

সুসানা সান হুয়ান শুনতে পাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া বন্ধ জানলায় দমাদ্দম ধাক্কাচ্ছে। সে শুয়ে আছে, মাথার তলায় হাত দুটি, ভাবছে, শুনছে রাতের সব শব্দ। হাওয়ার অস্থির দমকা যেন রাতটাকে এদিক-ওদিক হিঁচড়ে টানছে।

দরজা খুলে গেলো। হাওয়ার একটা দমকা নিবিয়ে দিলো বাতি। অন্ধকার দেখতে পেলে সে, থামিয়ে দিলে ভাবনাদের। শুনতে পেলে ছোট্ট চাপা মর্মর, তারপর তার বুকের ছন্দোবিহীন টিপটিপ, যখন আলো পড়লো তার বোজানো চোখের পাতায় সে শিখাটা দেখতে পেলে আব্ছেক।

সে তার চোখ খুললো না। তার মুখের ওপর ছড়িয়ে আছে চুলের রাশি। আলো তার ঠোঁটে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম নিয়ে এলো। সে জিগেশ করলে: 'তুমি নাকি, পাদ্রে?'

'হ্যাঁ, বাছা।'

আব্ছেক খুললো সে তার চোখ। তার জটপাকানো রুখু চুলের ফাঁক দিয়ে ছাতের কড়িতে সে দেখতে পেলে এক বিশাল ছায়া। আর তার ভিজে চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে, তার সামনে এক কালো মূর্তি। আবছা এক আলো। এক আলো যেখানে হৃদয়, ছোট্ট একটা হৃৎপিণ্ডের আকার, কম্পমান শিখার মতো দপদপ ক'রে উঠছে। 'শোকে তোমার হৃদয় ম'রে যাচ্ছে,' ভাবলে সে, 'তুমি এসেছো এই বলতে যে ফ্লোরেনসিয়ো মারা গিয়েছে, কিন্তু সে তো আমি আগেই জানি। আমায় নিয়ে ভেবো না। আমি আমার দুঃখতাপ নিরাপদ জায়গায় তুলে রেখেছি। তোমার হৃৎপিণ্ডকে পুড়ে খাক হ'য়ে যেতে দিয়ো না।'

সে উঠে প'ড়ে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলো পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

'তোমাকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে দাও,' হাত দিয়ে মোমের শিখা আগলে তিনি বললেন।

তাকে নিজের কাছে চ'লে আসতে দিলেন পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া। তাকিয়ে দেখলেন সে কেমন ক'রে দুই হাত দিয়ে ঘিরে ধরলো শিখা তারপর সলতে অব্দি নামিয়ে আনলে মুখ, যতক্ষণ-না পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়ে ফুঁ দিয়ে তিনি তা নিভিয়ে দিলেন।

অন্ধকার ফিরে এলো, সে ছুটে চ'লে এলো চাদরের তলায় লুকোতে।

পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া বললেন, 'আমি তোমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছি, কন্যা আমার।'

'তাহ'লে বিদায়, পাদ্রে,' সে সাড়া দিলে, 'আর ফিরে আসবেন না। আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই।'

সে শুনতে পেলে পায়ের শব্দ চ'লে যাচ্ছে; পায়ের শব্দ—সবসময় তারা হিম ক'রে যায় তাকে, হিম, আর কম্পমান, আর ভীত।

'আপনি যদি ম'রেই গিয়ে থাকেন, তবে আমায় দেখতে এলেন কেন?'

পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া দরজা বন্ধ ক'রে রাত্রির মধ্যে বেরিয়ে এলেন।

এখনও হাওয়া বইছে শোঁ-শোঁ।

একটা লোক, যাকে ওরা ডাকতো এল্ তার্তামুদো, মেদিয়া লুনায় এসে পেদ্রো পারামোর খোঁজ করলে।

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন?'

'আমি তাঁর সঙ্গে কৃ-কথা বলতে চাই।'

'উনি এখানে নেই।'

'ফ্-ফিরে এলে বলবেন, দ্-দোন ফ্-ফুলহোর সম্বন্ধে কথা ছিলো।'

'গিয়ে আমি খোঁজ করছি ওঁর, তবে অনেক সময় লেগে যেতে পারে।'

'তাঁকে ব্-বলবেন ব্-ব্যাপারটা জরুরি।'

এল্ তার্তামুদো নামের লোকটা ঘোড়ার পিঠে ব'সে-ব'সেই অপেক্ষা করলে। একটু বাদে পেদ্রো পারামো তার কাছে এসে হাজির হলেন।

‘কী চাই তোমার ?’

‘আমি শ্-শুধু স্-সরাসরি প্-পাত্রোনের সঙ্গেই ক্-কথা বলতে চাই।’

‘আমিই পা ত্রো ন। বলো, কী বলবে।’

‘শ্-শুধু এই। ওরা দ্-দোন ফ্-ফুলহোর সেদানোকে খুন ক্-করেছে। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমরা দ্-দেখতে গিয়েছিলাম নালাগুলোয় ক্-কতটা জল জমেছে। আমরা দেখলাম ব্-বিস্তর লোক আমাদের দেখতে এলো, আর ত্-তাদের একজন বললো, “আমি জানি মূর্তিমানটি ক্-কে বটে। ও মেদিয়া লুনার নায়েব।”

‘আমায় ওরা প্-পাত্তাও দেয়নি; ক্-কিন্তু দ্-দোন ফ্-ফুলহোরকে ওরা বললো ঘোড়া থেকে নেমে পড়তে। বললো ওরা নাকি ব্-বিপ্লবী, বললো ওরা আপনার জ্-জমিজিরেত চায়। “ছোটো সটান,” ওরা দ্-দোন ফ্-ফুল্‌হোরকে বললো, “গিয়ে তোমার প্-পাত্রোনকে বলো আমরা ওর সঙ্গে মোলাকাৎ ক্-করতে আসছি।” আর উনি ছুটতে শুরু ক্-করলেন। খুব জোরে নয়, ভারি মোটা ক্-কিনা, তবে যত জোরে পারেন। আর যখন ছুটছেন ওরা তাঁকে গুলি ক্-করলো। একটা পা মাটিতে একটা পা শ্-শূন্যে—এই অবস্থায় উনি মারা গেলেন।

‘আমি একফোঁটাও নড়িনি। অন্ধকার হওয়া অব্দি অপেক্ষা ক্-ক’রে, তারপর ক্-কী হয়েছে আপনাকে বলতে এলাম এখানে।’

‘তা তুমি অপেক্ষা করছো কীসের ? চ’লে যাচ্ছো না কেন ? গিয়ে বলো, আমি এখানেই আছি, আমার সঙ্গে কোনো মামলা থাকলে সরাসরি এখানে আসুক। তবে গোড়ায় লা কোন্‌সাগ্রাসিওনে যাও। এল্ তিলকুয়াতেকে চেনো ? ও ওখানে থাকবে। ওকে বলো আমি ওকে দেখতে চাই। আর ঐ লোকগুলোকে বোলো, আমি ওদের অপেক্ষায় থাকবো, যখনই ওদের সময় হবে। কী-রকম বিপ্লবী ওরা ?’

‘জ্-জানি না। ওরা শুধু ব্-বললো এই নাকি ওদের নাম।’

‘এল্ তিলকুয়াতেকে বোলো আমি ওকে এক্ষুনি এখানে চাই।’

‘ঠ্-ঠিক আছে, প্-পাত্রোন।’

পেদ্রো পারামো আবার নিজেকে কাছারিতে বন্ধ করলেন। নিজেকে তাঁর বৃদ্ধ আর জরাজীর্ণ লাগছে। ফুলহোরের জন্যে তাঁর মাথাব্যথা নেই। সে তার প্রয়োজন সাঙ্গ করেছে, যদিও লোকটা মাঝে-মাঝে খুব কাজে লাগতো। ‘যাই

হোক,' তিনি ভাবলেন, 'এল্ তিলকুয়াতে হাবা ঐ বুদ্ধুগুলোর মোকাবিলা করবে।'

সুসানা সান হুয়ানের কথা ভাবলেন তিনি, সবসময়েই তার ঘরে, হয় ঘুমোচ্ছে আর যদি না-ঘুমোয় তো ভঙ্গি করে যেন ঘুমোচ্ছে। কাল সারা রাত তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে কাটিয়েছেন। উপাসক মোমের ক্ষীণ আলোয় সারাক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে। তার হাত দুটির দিকে তাকিয়ে থেকে চাদরের কোণা ধ'রে যারা খেলা করছে, কিংবা যখন আঁচড়াচ্ছে বালিশ।

সেই যবে থেকে তাকে এখানে তিনি থাকতে এনেছেন, তার পাশে যতগুলো রাত কেটেছে, সব কেটেছে এই রকম, অসুখী, অন্তহীন মনখারাপ-করা। কবে শেষ হবে এই টান, নিজেকে তিনি শুধোলেন।

একদিন, আশা করলেন মনে-মনে, নিশ্চয়ই একদিন। কিছুই চিরকাল থাকে না। এমন কোনো স্মৃতি নেই, যত তীব্র প্রখরই হোক না কেন, যা একদিন-না-একদিন মিলিয়ে যায় না।

যদি শুধু আবিষ্কার করতে পারতেন কী সেটা ঘুমের ঘোরে তাকে ছটফট করায়—যেন ভেতর থেকে কিছু-একটা তাকে ধ'সে ফেলছে...কিন্তু যদি সে আবার নিজের মতো হ'য়ে ওঠে একদিন, সে কি তবে তার কাছে যথেষ্ট হবে যে জগতে তাকেই তিনি সবচেয়ে ভালোবাসেন? আর এও জানা—এটা আরো জরুরি—যে সে-ই তাঁকে সাহায্য করতে পারে এই জগৎ ছেড়ে চ'লে যেতে, তিনি শুধু তারই প্রতিমাতেই মাতাল যে-প্রতিমা অন্য-সব স্মৃতিকে মুছে ফ্যালে?

কিন্তু সে-কোন্ জগতে বেঁচে আছে সুসানা সান হুয়ান? অনেক কিছুর মধ্যে সেটাই ছিলো একটা জিনিশ পেদ্রো পারামো যেটা কোনোদিনও আবিষ্কার করতে পারেননি।

...

'আমার শরীর ভালোবাসতো গরম বালির ওপর টান হ'য়ে ছড়িয়ে যেতে। আমি চোখ দুটি বুজে ফেলতাম, ছড়িয়ে দিতাম হাত-পা মৃদু হাওয়ার কাছে যা আসতো সমুদ্র থেকে। আর সমুদ্রও এগিয়ে আসতো, তার ফেনায় ধুয়ে দিতো আমার পা...'

'সে-ই কথা বলছে, হুয়ান প্রেসিয়াদো। সে কী বলে আমাকে তা বলতে ভুলো না যেন।'

'...তখনও বেলা হয়নি মোটেও। ঢেউরা উঠছে পড়ছে। বেলাভূমিতে তারা ফেলে রেখে যাচ্ছে ফেনা, বদলে-বদলে যাচ্ছে সবুজ লহরীতে।

' "সমুদ্রে ন্যাংটো স্নান করতে ভালো লাগে আমার," আমি তাকে বলেছিলাম। সেই জন্যেই সেই প্রথম দিন থেকে আমার পেছন-পেছন এসেছিলো সে। সেও ন্যাংটো ছিলো, জল থেকে যখন উঠে এলো ঝলমল করছিলো তার সারা গা। কোনো গাংচিল ছিলো না, ছিলো শুধু সেই পাখিরা যারা এমন আওয়াজ করে যেন নাক ডাকছে। সূর্য উঠে-আসার পর তারা উধাও হ'য়ে গেলো। সে আমার পেছন-পেছন এসেছিলো সেই প্রথম দিনটায়, কিন্তু নিজেকে একা লাগছিলো তার, নিঃসঙ্গ, যদিও সেখানে আমিও ছিলাম তার সঙ্গে।

' "তুমি ঐ পাখিদেরই মতো একজন," সে বলেছিলো, "তোমাকে আমার রাতের বেলায় আরো ভালো লাগে যখন আমরা থাকি অন্ধকারে, একই চাদরের তলায়, একই বালিশে দুজনের মাথা..."

'আর সে চ'লে গিয়েছিলো।

'আমি ফিরে গিয়েছিলাম সমুদ্রে। সবসময় আমি ফিরে-ফিরে যেতাম সমুদ্রে। আর সমুদ্র ধুয়ে যেতো আমার গোড়ালি আমার হাঁটু আমার ঊরু। আমার কোমরে সে জড়াতো তার কোমল বাহু। সে হাত বুলোতো আমার কপালে, চুমু খেতো আমার গলায়, আদর করতো আমার কাঁধ। আমি নিজেকে লুকিয়ে ফেলতাম তার মধ্যে, তার শক্তি আর কোমলতায়...

' "সমুদ্রে স্নান করতে আমার ভালো লাগে," আমি তাকে বলেছিলাম।

'কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

'আর পরের দিন ভোরে আমি আবার সমুদ্রের তীরে, নিজেকে ধুয়ে-মুছে সাফ ক'রে নিতে, নিজেকে সমুদ্রের কাছে বিলিয়ে দিতে...'

...

লোক এলো সন্ধেবেলায়, সব শুদ্ধু কুড়িজন, সবাই সশস্ত্র।

পেড্রো পারামো তাদের রাত্তিরে খেতে নেমন্তন্ন করলেন। মাথা থেকে সম্‌ব্রেরো না-খুলেই, একটাও কথা না-ব'লে, তারা টেবিলে বসলো। শুধু যা শব্দ করে তা যখন তারা চকোলেটের পেয়ালায় চুমুক দেয় বা তাদের তোরতিয়া ও বীন্‌স খায়।

পেদ্রো পারামো তাদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। একটি মুখও চিনতে পারলেন না। এল্ তিলকুয়াতে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে, ছায়ায়।

'বলুন,' যখন তারা খাওয়া শেষ করেছে, 'আপনাদের জন্যে আর কী করতে পারি?'

হাত নেড়ে সবকিছু দেখিয়ে একজন জিগেশ করলে: 'তুমিই মালিক এখানে?'

আরেকজন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে: 'আমিই কথা বলবো।'

'বেশ।' পেদ্রো পারামো বললেন, 'কিন্তু আপনাদের জন্যে কী করতে পারি আমি?'

'দেখতেই পাচ্ছেন আমরা হাতিয়ার ধরেছি।'

'আর?'

'তা-ই সব। এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়।'

'কিন্তু করেছেন কেন এ-কাজ?'

'কারণ অন্য অনেকেও এই একই কাজ করেছে। আপনি এ-কথা শোনেননি? আমরা নির্দেশ আসার অপেক্ষা করছি, তারপর জানতে পাবো মামলাটা কী। আপাতত, আমরা এখানে।'

'আমি জানি মামলাটা কী,' আরেকজন বললে, 'আর যদি চান তো আপনাকে ব'লেও দিতে পারি। আমরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি আর আপনার মতো লোকের বিরুদ্ধে—আপনাদের মেনে নিয়ে-নিয়ে এখন আমাদের গা গুলোচ্ছে। কারণ সরকারটা পচা, পোকায়-কাটা, কারণ আপনি এবং আপনার মতো যাঁরা তাঁরা হাড়বদমাশ আর দস্যু। সরকার সম্বন্ধে আর-কিছু বলবো না, কারণ আমাদের বাকি কথা হবে বুলেট দিয়ে।'

'কত চান আপনারা আপনাদের বিপ্লবের জন্যে?' পেদ্রো পারামো বললেন। 'হয়তো আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারবো।'

'বেশ লোকটা, পেরসেভেরানসিয়ো। তোমার মুখে কুলুপ এঁটে-থাকা উচিত ছিলো। আমাদের মদত দেবার জন্যে বড়োলোক কাউকে চাই আমাদের—কাজেই এই ভদ্রলোকই বা নয় কেন? শোনো, কাসিলদো, কত টাকা চাই আমাদের, আপাতত?'

'যত উনি দিতে চান, দিন।'

'তাতে লাভ নেই। আমরা এখানে কেন এসেছি ব'লে মনে হয়? এর যা আছে সব আমাদের কেড়ে-নেয়া উচিত, ভুঁড়িতে যত ভুট্টা ঠেশেছে, সব শুদ্ধু।'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, পেরুসেভেরানসিয়ো। একেবারে দরকার না-হ'লে আমরা কোনো ঝামেলা পাকাতে চাই না। বরং এসো একটা রফায় পৌছনো যাক। তুমিই কথা বলো, কাসিল্‌দো।'

'বেশ। আমার মনে হয় শুরু হিশেবে হাজার কুড়ি পেসো মন্দ হবে না। বাকি সবাই কী মনে করো? হয়তো এই ভদ্রলোক এখানে এমনকী এও ভেবে বসবেন যে এ নেহাৎই অল্প টাকা, বিশেষত যখন ইনি স্বেচ্ছায় আমাদের সাহায্য করবার প্রস্তাব দিয়েছেন। বেশ, তাহ'লে বরং পঞ্চাশ হাজারই বলি। ঠিক আছে?'

'আমি আপনাদের এক লক্ষ পেসো দিচ্ছি,' পেদ্রো পারামো তাদের বললেন। 'সব শুদ্ধু কত লোক আছে আপনাদের?'

'প্রায় তিনশো।'

'চমৎকার। জোর বাড়াতে আমি আরো তিনশো লোক ধার দেবো। লোক আর টাকা দুইই এক হপ্তার মধ্যে জোগাড় ক'রে রাখবো। টাকাটা আমার উপহার, তবে লোকগুলো নেহাৎই ধার দিচ্ছি, কাজেই সব সারা হ'য়ে গেলে আমার কাছে তাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হবে। কী? তাতে হবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহ'লে, মহোদয়গণ, এখন থেকে এক হপ্তা পরে। আর আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে ভালো লাগলো।'

শেষ লোকটি যাবার আগে ব'লে গেলো: 'কিন্তু এটা মনে রাখবেন, কথা মতো যদি কাজ না-করেন তবে আপনি পেরুসেভেরানসিয়োর কাছ থেকে জবাব পাবেন। ওটা আমার নাম।'

পেদ্রো পারামো তার হাত ঝাঁকিয়ে তাকে শুভরাত্রি জানালেন।

'এদের মধ্যে কোন্ লোকটাকে তোমার নেতা ব'লে মনে হয়?' তিনি এল্ তিলকুয়াতেকে জিগেশ করলেন।

'হুম, আমার ধারণা মাঝখানে যে-মোটা লোকটা বসেছিলো, যে একবারও এমনকী চোখও তোলেনি, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সেই দলের মাথা। সাধারণত খুব-একটা ভুল আমার হয় না, দোন পেদ্রো।'

'না, দামাসিয়ো, তুমিই নেতা। না কি তুমি বিপ্লবে যোগ দিতে চাও না?'

'নিশ্চয়ই চাই। যত শিগগির তত ভালো।'

'বেশ। আমার কাছ থেকে কোনো পরামর্শ তোমার দরকার নেই। বিশ্বাস করা যায় এমন তিনশো লোক জড়ো করো, তারপর এই ফেরেব্বাজগুলোর সঙ্গে ভিড়ে পোড়ো। ওদের বোলো, আমি যে-কথা দিয়েছিলাম, সেইমতো তিনশো স্প্যাৎ তুমি নিয়ে এসেছো। বাকি কী করতে হবে না-হবে সে তুমিই ভালো জানো।'

'আর টাকার ব্যাপারটা? সেও সঙ্গে নিয়ে যাবো নাকি?'

'আমি তোমাকে একেকজন লোক বাবদ দশ পেসো ক'রে দেবো, তাদের সবচেয়ে জরুরি খাঁই-খরচা মেটাতে। ওদের বোলো বাকি টাকাটা ওদের জন্যে আমি এখানেই তুলে রাখবো। অত টাকা সঙ্গে ব'য়ে বেড়ানো ওদের পক্ষে খুব সুবিধেজনক হবে না। ও হ্যাঁ, ভালো কথা, ঐ যাকে ওরা পুয়ের্তো দে পিয়াদ্রা বলে সেই ছোটো র‍্যানচটা তোমার কেমন লাগে? বেশ, তাহ'লে, এখন থেকে সেটা তোমার হ'য়ে গেলো, কোমালার উকিল হেয়ার্দো ক্রুহিয়োকে দেবার জন্যে তোমার সঙ্গে আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে-ই সম্পত্তিটা তোমার নামে লিখে দেবে। কী বলো তুমি, দামাসিয়ো?'

'আপনাকে আদৌই জিগেশ করতে হবে না, পা ত্রো ন। যদিও র‍্যান্চ থাকুক চাই না-থাকুক কাজটা আমি করবোই, নেহাৎই ফুর্তির জন্যে। আপনি আমাকে যেন আদপেই চেনেন না। তবু প্রস্তাবটা আমার মনে ধরেছে। আমি যখন থাকবো না আমার বৌ তখন অন্তত চালিয়ে নিতে পারবে—একটা হিল্লে হবে।'

'আর ছাখো, আমার কিছু গোরুমোষও ওখানে নিয়ে যেয়ো। গোরুমোষ ছাড়া কোনো র‍্যান্চেরই কোনো ফায়দা নেই।'

'যদি ব্রামান গোরুবাছুর নিই, তবে হবে তো?'

'যা তুমি চাও বেছে নিয়ো, তোমার মেয়েমানুষ যত ক-টা সামলাতে পারবে ব'লে মনে হয় ততই নিয়ো। তবে হাতের কাজটায় ফিরে-আসা যাক। আমার জমি-জিরেত থেকে যেন বেশি দূরে চ'লে না-যাও, সেটা খেয়াল রেখো—যাতে অন্য কোনো দল এলে দেখতে পায় আগে থেকেই এখানে একটা বাহিনী আছে। আর যখন পারো আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো—কিংবা যখন কোনো খবর থাকবে।'

'করবো, পা ত্রো ন।'

'সুসানা কী বলছে, হুয়ান প্রেসিয়াদো?'

'ও বলছে ওর পায়ের ফাঁকে সে তার পা ঢুকিয়ে দিতো। ওর নিজের পা নাকি ছিলো পাথরের মতো হিম, আর এইভাবে ও তা গরম ক'রে নিতো, উনুনে রুটি সেঁকার মতো গরম। সে ওর পায়ে ঠুকরোতো, বলতো পা দুটি নাকি নতুন-সেঁকা রুটির মতো। তার বুকে কুঁকড়ে, গুটিয়ে সে ঘুমোতো, তার মধ্যে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতো। ও বলছে এক অন্ধকার শূন্যতায় ও হারিয়ে যেতো যখন ও টের পেতো হলরেখার মতো এক জলন্ত শলা দিয়ে ওর শরীর ছিঁড়ে খুলে যাচ্ছে। তারপর আর জলতো না, শুধু উষ্ণ মধুর একটা কিছু, ওর নরম শরীরে তা কঠিন সব আঘাত হানতো। ওর মনে হ'তো ও ডুবে যাচ্ছে, কেউ যেন গিলে খাচ্ছে ওকে, ও গুনগুন ক'রে কাৎরাতো। কিন্তু ওর মৃত্যু তাকে আরো-বেশি কষ্ট আরো-বেশি আঘাত দিয়েছিলো। এই কথাই ও বলছে।'

'কার কথা বলছে ও?'

'এমন-কারু কথা যে নিশ্চয়ই তার আগে মারা গিয়েছিলো।'

'তা বুঝলাম, কিন্তু কে?'

'জানি না। ও বলছে সে-রাত্তিরে সে নাকি ফিরে আসতে এত দেরি করেছিলো, ও কেমন যেন টের পেয়েছিলো সে খুব দেরি ক'রে এসেছে, হয়তো একেবারে ভোরবেলায়। খেয়ালই করেনি ও ঠিকমতো, অবশ্য ওর পা দুটির জন্যে। তার আগে পা দুটি ছিলো হিম ঠাণ্ডা, তারপর হঠাৎ মনে হ'লো কীসে যেন তা জড়িয়ে গেলো ঢেকে গেলো, যেন কেউ এসে তাদের কিছু দিয়ে ঢেকে দিয়েছে যাতে তা গরম থাকে। জেগে উঠে ও দেখতে পেয়েছিলো পা দুটি খবরকাগজে মোড়া। কাগজটা পড়ছিলো ও তার জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে, যখন আর জেগে থাকতে পারছিলো না হাত থেকে খ'শে প'ড়ে গিয়েছিলো মেঝেয়। ওরা যখন এসে খবর দিলে যে সে মারা গেছে তখনও কাগজগুলো তার পা জড়িয়ে ছিলো।'

'মনে হচ্ছে তার কফিনটা যেন ভেঙে গিয়েছে। কাঠের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনতে পাচ্ছি।'

...

সে-রাত্তিরে সে স্বপ্ন দেখেছিলো আবার। কেন তাকে অতকিছু মনে ক'রে

রাখতে হবে, অত আবেগ দিয়ে, শুধু তার মৃত্যুটা মনে রাখলেই হয় না কেন? কেন মনে প'ড়ে যায় অতীতের সব মমতাময় সুর?

'ফ্লোরেন্‌সিয়ো মারা গেছেন, সেনিওরা।'

কী লম্বা ছিলো ও! ঢ্যাঙা, তবে সটান খাড়া। কঠিন ছিলো গলার স্বর, শুষ্কতম মাটির মতোই শুকনো, আর এক ভারি শরীর—না কি তা ভারি হ'য়ে গিয়েছিলো পরে? 'কী বলেছিলো ওরা আমায়? ফ্লোরেন্‌সিয়ো? কোন্ ফ্লোরেন্‌সিয়ো? আমার? হায়, কেন আমি কান্নায় ফেটে পড়িনি, কেন আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিইনি চোখের জলে, সব শোকতাপ ধুয়ে-মুছে ফেলতে? তোমার অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর! আমি তোমার কাছেই প্রার্থনা করেছিলাম তাকে রক্ষা করবার জন্যে। তার যত্ন নেবার জন্যে। কিন্তু তুমি তো আমাদের আত্মা ছাড়া আর-কিছুরই তোয়াক্কা করো না। আর আমি যা চাই তা তার শরীর। নগ্ন···প্রণয়ে তপ্ত ··কামনায় টগবগ ক'রে ফুটছে। আমার কম্পমান বুকে-বাহুতে চেপে ঠেকানো, চেপে বসানো। আমার স্বচ্ছ শরীর ঝুলে আছে ওর কাছ থেকে, ওর শক্তিতেই সজীব। আর এখন আমার এই ঠোঁটগুলো নিয়ে আমি কী করবো, যদি-না তাদের চুমো খাবার জন্যে থাকে তারই মুখ? আমার এই বেচারা ঠোঁটগুলো নিয়ে করি কী?'

পেদ্রো পারামো দাঁড়িয়েছিলো দরজায়, লক্ষ ক'রে যাচ্ছিলো তার ছটফট ভাবভঙ্গি কাৎরানি, শুনছিলো এই নতুন স্বপ্নের প্রলম্বিত মুহূর্তগুলো। চিড়বিড় ক'রে জ্বলছিলো বাতি, শিখা ক্রমে মিইয়ে যেতে-যেতে একসময় দপ ক'রে নিবে গেলো।

শুধু যদি ও কষ্ট পেতো শোকে—এ-সব অন্তহীন অবসাদভরা স্বপ্নে নয়—তাহ'লে সে চেষ্টা করতো তার জন্যে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পেতে। তাকে দেখতে-দেখতে এই কথাই ভাবছিলো পেদ্রো পারামো, তার স্বল্পতম নড়াচড়াও সে খুঁটিয়ে লক্ষ ক'রে যাচ্ছিলো। কী হ'তো, যখন শিখা দপ ক'রে নিবে গেলো, সেও যদি তখন ম'রে যেতো?

পরে পেদ্রো পারামো চ'লে গেলো, শব্দ না-ক'রে দরজাটাকে ভেজিয়ে দিয়ে। তার প্রতিমা থেকে পরিচ্ছন্ন রাতের হাওয়া তাকে মুক্তি দিলে।

সে জেগে উঠেছিলো ভোর হবার আগটায়, ঘামে ভেজা। ভারি ঢাকাগুলো সে ছুঁড়ে ফেলেছিলো মেঝেয়—তারপর শুজনিটাও। তার শরীর নগ্ন শুয়ে

রইলো দিন কোটার ঠাণ্ডা হাওয়ায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ফিরে গেলো ঘুমের কাছে।

এইভাবেই পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া তাকে পেয়েছিলেন, অনেক ঘণ্টা পরে : নগ্ন, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

'জানতেন কি, দোন পেদ্রো, ওরা এল্ তিলকুয়াতেকে হারিয়ে দিয়েছে ?'

'জানি কাল রাতে বিস্তর গোলাগুলি চলেছে। হট্টগোলটা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু এইটুকুই শুধু। তোমায় কে বললে, হেরার্দো ?'

'জখমদের কেউ-কেউ কোমালায় ফিরে এসেছে, আর আমার পরিবার তাদের পট্টি বেঁধে দিতে সাহায্য করেছে। ওরা তাকে বলেছে ওরা সবাই দামাসিয়োর লোক। বলেছে, তাদের দলের অনেক লোক মারা গেছে। পাঞ্চো ভিইয়া নামে কোন্-এক লোকের সেনাদের সঙ্গে নাকি তাদের যুদ্ধ হচ্ছিলো।'

'জানি না, হেরার্দো। দেখে মনে হচ্ছে দুঃসময় এলো। তুমি কী করবে ব'লে ভাবছো ?'

'আমি চ'লে যাচ্ছি, দোন পেদ্রো। সাইউলায়। সেখানে আমি নতুন ক'রে আপিশ খুলে আবার কারবার ফাঁদবো।'

'তোমাদের, উকিলদের, আমার হিংসে হয়। যেখানে খুশি চ'লে যেতে পারো তোমরা—জমিজিরেত সম্বন্ধে কিছু ভাবতে-টাবতে হয় না।'

'মোটেই তা বিশ্বাস করবেন না। আমাদের নিজস্ব অনেক ঝক্কি-ঝামেলা আছে। তাছাড়া আপনার মতো লোকের কাছে বিদায় জানানোও কষ্টকর-- আপনি আমার জন্যে যত অনুগ্রহ করেছেন, তা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। দলিলগুলো কোথায় রাখতে বলেন ?'

'এখানে রেখো না, তোমার সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাও। না কি ওখান থেকে আমার মামলা-মোকদ্দমা তুমি চালাতে পারবে না ?'

'আপনার আস্থার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি, দোন পেদ্রো। সত্যি কৃতজ্ঞ। তবে ভয় হয় তা সম্ভব হবে না। কিছু-কিছু…এই যাকে বলা যায়… বেআইনি কাজ...আইন না-মানা তথ্য ··যে-সব তথ্য আপনি ছাড়া আর-কারু জানা উচিত নয়। ভুল লোকের হাতে দলিলগুলো পড়লে বিষম বিপত্তি হ'য়ে যাবে। এখানে আপনার কাছে এগুলো রেখে দেয়াই নিরাপদ।'

'তুমি ঠিকই বলেছো, হেরার্দো। বেশ, এখানেই রেখে যাও, আমি ওগুলো পুড়িয়ে ফেলবো। দলিল থাকুক না-থাকুক, আমার কী আছে না-আছে তা নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করবে কে?'

'কেউ না, দোন পেদ্রো। আদৌ কেউ পারবে না। এবার আমাকে ক্ষমা করুন।'

'ঈশ্বরের সঙ্গে যাও, হেরার্দো।'

'কী বললেন?'

'বললাম ঈশ্বর যেন তোমার সঙ্গে থাকেন।'

উকিল হেরার্দো ক্রুহিয়ো আস্তে আস্তে হেঁটে বেরিয়ে এলেন। এখন তিনি বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন, কিন্তু এমন বুড়ো নন যে এমন ছোটো-ছোটো পা হিঁচড়ে চলবেন। আসলে তিনি কোনো-একটা উপহার প্রত্যাশা করছিলেন। তিনি দোন লুকাসের সেবা করেছেন, দোন পেদ্রোর বাবা দোন লুকাস, ঈশ্বর তাঁকে শান্তিতে রাখুন, তারপর দোন পেদ্রোকে, আর দোন পেদ্রোর ছেলে মিগেলকে, এবং তিনি আশা করছিলেন কোনো উপহার। বড়ো-কিছু, মস্তকিছু। স্ত্রীকে ব'লে এসেছিলেন :

'দোন পেদ্রোকে বিদায় জানাতে যাচ্ছি। ঠিক জানি, এতকাল ওঁর জন্যে যা করেছি তার জন্যে আমায় উনি খুশি ক'রে দেবেন। সে-টাকায় সাইউলায় আমরা প্রতিষ্ঠা পেতে পারি—বাকি জীবনটা স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারবো।'

কিন্তু কেন যে মেয়েদের সবতাতেই সন্দেহ থাকে? তারা কি আকাশ থেকে খবর পায়, না কী?

'উঁহু,' স্ত্রী বলেছিলেন, 'সাইউলাতেও তোমায় এমন গাধার খাটুনি খাটতে হবে। কারণ, এখানে তুমি কিছুই পাবে না।'

'কী দেখে বলছো?'

'কিছু দেখে নয়। এমনি জানি।'

হেরার্দো দরজার দিকে হেঁটে চলেছেন, ডাক শুনবেন ব'লে তৈরি : 'ওহো, হেরার্দো! এত ব্যস্ত ছিলাম যে তোমার কথা ভাববার একটুও ফুরসৎ পাইনি! কিন্তু তুমি আমার জন্যে এত করেছো যে টাকায় তার ঋণ শোধ করা যায় না। অনুগ্রহ ক'রে এটা নাও, ছোট্ট একটা উপহার, একটা প্রতীক।'

কিন্তু ডাকটা আর এলো না কখনও। দরজা দিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন, খুলে নিলেন ঘোড়াটা, জিনের ওপর চ'ড়ে আস্তে ঘোড়া ছোটালেন কোমালার

দিকে, সারাক্ষণ ফিরে যাবার জন্যে ডাক শুনতে পাবেন ব'লে আশা ক'রে। যখন দেখলেন মেদিয়া লুনা অনেক পেছনে প'ড়ে আছে, ভাবলেন : 'ওর কাছে টাকা ধার চাইলে আমি নিজেকে খাটো ক'রে ফেলতাম।'

...

'দোন পেদ্রো, আবার ফিরে এলাম, কারণ আগে যা বলেছি তাতে মনে কেমন খচখচ করছিলো। আপনার মামলা-মোকদ্দমার তদারক করতে পারলে ভালো লাগবে আমার।'

আবার তিনি ব'সে আছেন দোন পেদ্রোর কাছারি ঘরে, ঘরটা ছেড়ে চ'লে যাবার মাত্র আধঘণ্টা পরে।

'চমৎকার, হেরার্দো। যেখানে দলিলগুলো রেখে গিয়েছিলে, সেখানেই সেগুলো প'ড়ে আছে।'

'আর ধরুন···একটু খরচাপাতি······জানেন···কিছু যদি বাড়তি...কিছু যদি আগাম – অবশ্য যদি আপনার অসুবিধে না-হয়।'

'পাঁচশো?'

'আরেকটু বাড়ানো যায় না? আর-একটু?'

'হাজারে খুশি হবে?'

'পাঁচ হ'লে কী হয়?'

'পাঁচ কী? পাঁচ হাজার পেসো? অত টাকা আমার কাছে নেই। তুমি তো জানোই সব টাকা জমিতে আর কম্পানির কাগজে খাটানো হয়েছে। হাজারই নাও। ঠিক জানি, তার চেয়ে বেশি তোমার লাগবে না।'

তিনি ব'সে রইলেন সেখানে, অধোবদন, ভাবছেন। পেদ্রো পারামো টাকা গুনছেন, পেসোর ঝনঝন শুনতে পাচ্ছেন ডেস্কের ওপর। দোন লুকাসের কথা ভাবলেন তিনি – বেশ-কিছু ফী না-দিয়েই তিনি মারা গিয়েছিলেন। ভাবলেন দোন পেদ্রোর কথা, যিনি নতুন হিশেব শুরু করেছিলেন। ভাবলেন তাঁর ছেলে মিগেলের কথা, ছোঁড়া কতবার তাঁকে কেলেঙ্কারিতে ফেলেছিলো! অন্তত পনেরোবার তাকে তিনি হাজতবাস থেকে বাঁচিয়েছেন, তার বেশিও হ'তে পারে। আর সেই যখন ছোঁড়া খুন করেছিলো···কী যেন তাঁর নাম? হ্যাঁ-হ্যাঁ। রেন্‌তেরিয়া। তিনি মারা যাবার পর তাঁর হাতে একটা পিস্তল গুঁজে দিতে হয়েছিলো তাঁদের। মিগেলিতো বিষম ভড়কে গিয়েছিলো, পরে যদিও তা নিয়ে

হাসি ঠাট্টামশকরা করতো। যদি কর্তৃপক্ষের কানে খবরগুলো পৌঁছুতো, তবে কত টাকা খরচ করতে হ'তো দোন পেদ্রোকে! আর মেয়েমানুষগুলোর ব্যাপারই বা কী? কতবার তিনি নিজের পকেট থেকে টাকা বার ক'রে দিয়েছেন যাতে তারা টুঁ শব্দটি না-করে! 'খুশি হওয়া উচিত তোমার, তোমার বাচ্চার রং ফরশা হবে,' বলেছেন তিনি তাদের।

'এই-যে, হেরার্দো। যত্ন নিয়ো এদের, কারণ এরা আর ফিরে আসে না।'

তিনি তখনও গভীর চিন্তায় তলিয়েছিলেন, উত্তর দিলেন:

'না। মৃতেরাও আর ফিরে আসে না।' তারপর যোগ করলেন: 'দুর্ভাগ্যবশত।'

দিনের আলো ফোটবার ঘণ্টা-দুই বাকি। আকাশ ভ'রে আছে নধর-সব পেটফোলা তারায়। চাঁদ বেরিয়ে এসেছিলো একটুক্ষণের জন্যে, তারপর মিলিয়ে গেছে। সেই বিষণ্ণ চাঁদগুলোর একটা, যাদের দিকে কেউই তাকায় না, খেয়ালই করে না কেউ যাদের। সে ঝুলে ছিলো ওখানে, কিছুক্ষণ, বিবর্ণ, কিম্ভূতকিমাকার, তারপর পাহাড়গুলোর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলো।

দূরে, অন্ধকারে, ষাঁড়গুলো নিচুস্বরে ডাকছে।

'এই জানোয়ারগুলো কখনওই ঘুমোয় না,' দামিয়ানা সিস্নেরোস বললে, 'কখনও না। হুবহু শয়তানের মতো—সবসময়েই যে মানুষের আত্মাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার ফিকির খুঁজছে।'

বিছানায় পাশ ফিরলো সে, দেয়ালের দিকে মুখ।

আর তখনই শুনতে পেলে টোকা।

শ্বাস চেপে রেখে সে চোখ খুললো। আবারও শুনতে পেলে আওয়াজ, তিনটে তীক্ষ্ণ টোকা, যেন কেউ আঙুলের গাঁট দিয়ে দেয়ালে ঘা দিচ্ছে। এখানে নয়, তার উল্টো দিকে। দূরে। তবে একই দেয়ালে।

'ঈশ্বর রক্ষা করুন! এইভাবেই সান পাস্কুয়াল বাইলোন সবসময় টোকা দেয়, তিন-তিনবার, যখন সে তার অনুগামীদের কাউকে বলতে আসে যে তার মরণদশা ঘনিয়ে এসেছে।'

আর যেহেতু সে তাঁর নাম জপ করবার জন্যে গির্জেয় যায়নি অনেকদিন,

আমবাতে কী দারুণ ভুগছে সে, সে তেমন ঘাবড়েও যায়নি। কিন্তু এখন সে শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেলো, আর ভয়ের চেয়েও বেশি হ'লো কৌতূহল।

কোনো শব্দ না-ক'রে সে বিছানা থেকে নেমে প'ড়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিলে।

সবকিছু ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরা, কিন্তু বাড়িটা এতই ভালো জানে যে সে দেখতে পেলে পেদ্রো পারামোর বিশাল ছায়ামূর্তি, মার্গারিতার জানলায় বেয়ে উঠেছে।

'ওঃ, সেই দোন পেদ্রোটা।' দামিয়ানা বললে। 'এখনও হুলোবেড়াল একটা! কিন্তু বুঝতে পারি না সবকিছু এমন রাখঢাক গুড়গুড় ক'রে কেন? আমাকে যদি ঘুণাক্ষরেও একবার জানাতো, তবে আমি মার্গারিতাকে গিয়ে বলতাম পাত্রোন তাকে আজকের রাতের জন্যে চান—তবে তাঁকে আর এত রাতে বিছানা ছেড়ে ওঠবার ঝক্কি পোয়াতে হ'তো না।'

পরে তাকে রাতকাপড় খুলে ফেলতে হয়েছিলো, কারণ রাত ক্রমেই তপ্ত হ'য়ে উঠছিলো…

'দামিয়ানা!'

যখন যুবতী ছিলো সে ছিলো তখন আমার।

'দামিয়ানা, দরজা খোলো।'

তার বুকটা ধড়ফড় করছে, যেন পাঁজরের মধ্যে একটা ব্যাঙাচি চিড়বিড় ক'রে লাফাচ্ছে।

'কেন, পাত্রোন?'

'দরজা খোলো!'

'কিন্তু আমি যে শুয়ে পড়েছি, পা ত্রো ন।'

তারপর সে শুনতে পেলে লম্বা বারান্দা ধ'রে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে, ধুপধাপ পা ফেলে, রেগে গেলে তিনি যেমন করেন।

পরের রাত্তিরে, তাঁকে আবার চটানো ঠিক হবে না ভেবে, সে দরজা আধো খোলা রেখেছিলো, বিছানায় গিয়েছিলো ন্যাংটো, যাতে তাঁকে একটুও অসুবিধেয় পড়তে না-হয়।

কিন্তু পেদ্রো পারামো আর ফিরে আসেননি।

এমনকী এখনও, যখন সে মেদিয়া লুনার সব দাসদাসীর মুরুব্বি হ'য়ে আছে, যখন সে বয়স্কা, লোকে যখন তাকে মানে-জানে, সে এখনও সেই রাত্তিরের

কথা ভাবে, যে-রাতে পা ত্রো ন বলেছিলেন : 'দামিয়ানা, দরজা খোলো!'

সে বিছানায় চ'লে গেলো, এই মুহূর্তে মার্গারিতা কেমন সুখী হয়েছে, ভাবতে-ভাবতে।

একটু পরে সে আবার ঘা শুনলে, কিন্তু এবার দেউড়ির বড়ো ফটকে। যেন তারা বন্দুকের বাঁট দিয়ে দরজায় ঘা দিচ্ছে।

সে উঠে প'ড়ে আবারও উঁকি দিয়ে দেখলে। কিছুই সে দেখতে পেলে না, অথচ তবু তার মনে হ'লো মাটি যেন ফুটছে, বৃষ্টির পর যেমন ফোটে, যখন কেন্নোরা বেরিয়ে আসে। তার মনে হ'লো সে যেন একদঙ্গল লোকের গায়ের গরম টের পাচ্ছে, গন্ধ পাচ্ছে তাদের। সে শুনতে পেলে ব্যাঙের ডাক। ঝিঁঝি। বর্ষার রাতের যত শব্দ। তারপর বন্দুকের বাঁট আবার ঘা দিতে লাগলো দরজায়।

একদল লোকের মুখে বাতির আলো পড়লো একঝলক, তারপর নিবে গেলো।

'এ আমার কোনো ব্যাপার নয়,' জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে-দিতে বললে দামিয়ানা সিস্‌নেরোস।

'ওরা আমায় বললো তুমি নাকি হেরে গিয়েছো। কিন্তু তা হ'তে দিলে কেন তুমি?'

'ওরা আপনাকে সত্যি কথা বলেনি, পা ত্রো ন। আমার কিছুই হয়নি। সাতশো লোক আছে আমার সঙ্গে, কাছেই আরো-কিছু লোক আছে। আসলে হয়েছিলো কী, পেব্‌সেভেরান্‌সিয়োর মতো কোনো-কোনো "ঘাগু" লোক কোনো কাজকর্ম না-ক'রে-ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, তাই পাহারা বাহিনীর ওপর গুলি চালিয়েছিলো। পরে দেখা গেলো আস্ত একটা ফৌজ। পাঞ্চো ভিইয়ার ফৌজ, জানেন।'

'কোত্থেকে এলো ওরা?'

'উত্তর থেকে। যা ছাখে সব ওরা ধ্বংস ক'রে ফ্যালে। এত ক্ষমতা ওদের যে মনে হয় না কেউ ওদের হারাতে পারবে।'

'তুমি তাহ'লে ওদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছো না কেন? আমি শুনেছি যারাই জেতে তুমি তাদেরই সঙ্গে যোগ দাও।'

'যোগ দিয়েছি তো।'

'তাহ'লে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো কেন?'

'আমাদের টাকা চাই, পাত্রোন। মাংস খেয়ে-খেয়ে ঘেন্না ধ'রে গেছে আমাদের, ঘেন্না আর অরুচি। আর কেউ তো আমাদের ধারে কিছু দেবে না। আমরা আপনাকে বলতে এসেছি যে আমরা লুঠপাট শুরু ক'রে দিতে চাই না। এত কাছে যদি না-থাকতাম তাহ'লে অবিশ্যি কিছুই এসে-যেতো না, কিন্তু আমরা সকলেই তো এই উপত্যকারই লোক, আর নিজেদের লোকজনদের কাছ থেকে লুঠপাট ক'রে কিছু নিতে চাই না। কাজেই কিছু টাকা চাই আমাদের, একটু লঙ্কা কিনতেও টাকা লাগবে। মাংস খেয়ে-খেয়ে অরুচি ধ'রে গিয়েছে।'

'নিজের সাঙ্গোপাঙ্গর দেখাশুনো করো দেখে খুশি হলাম, দামাসিয়ো, তবে তোমাদের যা চাই তা পাবার অন্য উপায় আছে। যা দিয়েছি তাতে যদি তোমাদের না-পোষায় তবে তোমরা কোন্‌ৎলায় গিয়ে হামলা করছো না কেন? এই বিপ্লবে তোমরা আছো কী জন্যে, শুনি? যদি ভিক্ষে চাইতে আসো তো আগেভাগেই হেরে গেলে। বরং বৌটার কাছে ফিরে গিয়ে হাঁস-মুরগি পালো। যাও, আর-কোনো গাঁয়ে গিয়ে হামলা করো। যদি তোমরা গায়ের চামড়া বাঁচাবার ঝুঁকি নাও, তবে অন্য লোকেরাই বা তোমাদের সাহায্য করবে কেন? কোন্‌ৎলায় প্রচুর ধনীলোক আছে। তাদের কাছ থেকে কিছু কেড়েকুড়ে নাও। না কি ওরা ভাবছে যে তোমরা ওদের আয়া, দাই, ওদের দেখাশুনো করবে? না, দামাসিয়ো। ওদের গিয়ে বোঝাও যে এ কোনো ছেলেখেলা নয়। যত টাকা লাগে সব পেয়ে যাবে।'

'আপনি যা বলেন, পাত্রোন। আপনি সবসময় আমায় ভালো-ভালো ফন্দি বাৎলেছেন।'

'তাহ'লে আশা করি এ থেকে তোমার কিছু ফায়দা উঠবে।'

লোকগুলোর চ'লে যাওয়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন পেদ্রো পারামো। ওরা যখন রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেলো শুনতে পেলেন ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ, ঘাম আর ধুলোর গন্ধ পেলেন। টের পেলেন মাটি কেমন ক'রে কাঁপছে। যখন দেখলেন আবার জোনাকিরা মিটমিট করছে বুঝলেন যে সব লোক চ'লে গিয়েছে। তিনি প'ড়ে আছেন একা, ভেতরে ভেতরে প'ড়ে-যেতে-থাকা একটা গাছের ডালের মতো।

সুসানা সান হুয়ানের কথা ভাবলেন একবার, তারপর সেই মেয়েটির কথা মনে প'ড়ে গেলো, একটু আগেই যার সঙ্গে তিনি শুয়েছেন। সেই চমকে-যাওয়া আর্ত ছোট্ট কম্পমান শরীর। ভয়ে বুকটা যেন লাফিয়ে মেয়েটির মুখের কাছে এসে গিয়েছিলো। 'একমুঠো শরীর,' তাকে এই ব'লে ডাকছিলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধ'রে তার শরীরটাকে বদলে দিতে চেয়েছিলেন সুসানা সান হুয়ানের শরীরে। 'এমন এক মেয়ে, যে আদৌ এই জগতের নয়।'

সূর্য-ওঠার সময় দিন পাশ ফেরে, আস্তে। জগতের জং-ধরা কব্জার শব্দটাই প্রায় শুনতে পেয়ে যাবে তুমি। এই প্রাচীন পৃথিবীটার শিহরন, যখন সে কাৎ হ'য়ে গা থেকে ঝেড়ে ফ্যালে অন্ধকার।

'এ কি সত্যি, হুস্তিনা, যে রাত্রি-ভরা থাকে পাপে?'

'হ্যাঁ, সুসানা।'

'আর এ কী সত্যি?'

'হ'তে তো হবেই, সুসানা।'

'আর জীবন কী ব'লে তোমার মনে হয়, হুস্তিনা, যদি-না তা হয় পাপ। শুনতে পাচ্ছো না তুমি? শুনতে পাচ্ছো না কেমন ক'রে জগৎটা ফেটে যাচ্ছে। শোনো!'

'না, সুসানা, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আমি তো তোমার মতো অতটা ভাগ্যবতী নই।'

'তোমার তাক লেগে যাবে, হুস্তিনা। তোমার তাক লেগে যাবে যদি শুনতে পাও আমি কী-সব শব্দ শুনি।'

হুস্তিনা একমনে ঘর গুছিয়েই চলেছে। ভিজে মেঝেটায় সে নিড়ানি বুলোলো। ভাঙা ফুলদানিটা থেকে জল মুছে নিলো। তুলে নিলো ফুলগুলো। ভাঙা কাচ রাখলো একটা ঝুড়িতে।

'সারা জীবনে তুমি কত পাখি মেরেছো, হুস্তিনা।'

'অনেক, সুসানা।'

'দুঃখ হয়নি তোমার?'

'হয়েছে, সুসানা।'

'তাহ'লে এখনও কেন তুমি মরবার অপেক্ষায় ব'সে আছো?'

'আমি চাই মরণ নিজেই আমার কাছে আসুক, সুসানা।'

'শুধু তা-ই যদি হয় তবে মরণ আসবে। ভেবো না।'

সুসানা সান হুয়ান বালিশে হেলান দিয়ে আছে। তার চোখ দুটি অস্থির, সবখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তার হাত দুটো চেপে আছে তার পেট, রক্ষা-নির্মোকের মতো। আলো হ'য়ে আছে, তার মাথার ওপর ডানা ঝাপটাচ্ছে গুনগুন শব্দ। আর কূপে কপিকলের আওয়াজ। আর লোকে যে-সব শব্দ করে জেগে-ওঠার সময়।

'তুমি জাহান্নামে বিশ্বাস করো, হুস্তিনা?'

'হ্যাঁ, সুসানা। আর স্বর্গেও বিশ্বাস করি।'

সে তার চোখ বুজলো।

হুস্তিনা যখন ঘর ছেড়ে চ'লে গেলো সুসানা সান হুয়ান তখন আবার ঘুমোচ্ছে। সূর্য ঝলশাচ্ছে। বাইরে হুস্তিনার সঙ্গে পেদ্রো পারামোর দেখা হ'লো।

'কেমন আছে?'

সে মাথা নাড়লে।

'কী কষ্ট হচ্ছে বলছে?'

'কিছুই না, সেনিওর। আর সেটাই হয়েছে মুশকিল। লোকে কী বলে জানেন তো—শুধু মড়ারাই কষ্টের কথা বলে না।'

'পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া ওকে দেখতে এসেছিলেন?'

'কাল রাতে এসেছিলেন ওর পাপস্বীকার শুনতে। আজ সকালে ওর খ্রিস্টপ্রসাদ পাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু মনে হয় না ও কৃপা পাবে, কারণ পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া আর ফিরে আসেননি। বলেছিলেন সকালে উঠেই প্রথমে এখানে আসবেন, কিন্তু দেখছেন তো সূর্য কোথায় উঠে গিয়েছে, আর উনি এখনও আসেননি। ভয় হয় ও কৃপা পাবে না।'

'কার কৃপা?'

'ঈশ্বরের, সেনিওর।'

'ছিচকাঁদুনে হোয়ো না, হুস্তিনা।'

'আপনি যা বলবেন, সেনিওর।'

পেদ্রো পারামো দরজা খুলে তার কাছে চ'লে এলেন, তার মুখে আলোর একটা ফালি পড়তে দিলেন। দেখলেন তার চোখ দুটি আঁটো ক'রে বোজা, যেন

সে ভেতরে-ভেতরে কোনো কষ্ট পাচ্ছে। মুখটা ভেজা, আধো খোলা। আর তারপরে তার অন্ধ হাত দুটি চাদর হিঁচড়ে টানছে : খুলে দেখাচ্ছে তার নগ্ন শরীর। শরীরটা যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে এঁকেবেঁকে যেতে লাগলো।

বিছানায় নুয়ে হাত বাড়িয়ে তার গায়ে ঢাকা তুলে দিলেন। আহত সাপের মতো তার শরীরটা এঁকেবেঁকে কুণ্ডলি পাকিয়ে যাচ্ছে, প্রতিটি দমক হচ্ছে আগেরটার চাইতেও তীব্র ও ভীষণ। তার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে তিনি ডাকলেন : 'সুসানা!'

আবার : 'সুসানা!'

দরজা খুলে গেলো, পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া ভেতরে এলেন : 'আমি তোমায় খ্রিষ্টপ্রসাদ দেবো, বাছা!'

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন পেদ্রো পারামো যখন শিয়রের কাছে বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে তাকে বসালেন।

সুসানা সান হুয়ান, ঘুম আর জাগার মাঝখানে, জিভ বার ক'রে গিলে নিলে। তারপর সে বললে : 'ভারি চমৎকার দিন কাটলো আজ, ফ্লোরেন্‌সিয়ো,' তারপর আবার সে নিজেকে কবর দিয়ে দিলে তার গুজনির সমাধিতে।

...

'ঐ জানলাটা দেখতে পাচ্ছেন, দোনিয়া ফাউস্তা, ঐ মেদিয়া লুনায়? যে-জানলায় সবসময় আলো জ্বলছে?'

'না, আন্‌হেলেস। আমি কোনো জানলা দেখতে পাচ্ছি না।'

'সে এইজন্যে যে এইমাত্র সেটা অন্ধকার হ'য়ে গেলো। আপনার কি মনে হয় মেদিয়া লুনায় খারাপ কিছু হ'লো? ঐ জানলাটা আলো হ'য়ে ছিলো আজ তিন বছর হ'লো। রাতের পর রাত। একজন ওখানে গিয়েছিলো, তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, মেয়েটি বললে সে নাকি পেদ্রো পারামোর স্ত্রীর শোবার ঘর। বেচারার মাথা খারাপ, অন্ধকারে ভারি ভয়—আর দেখুন, এখন কোনো আলো নেই। খারাপ লক্ষণ না সেটা?'

'হয়তো সে মারা গিয়েছে। আমি শুনেছি তার নাকি বিষম অসুখ করেছিলো। লোকে এও বলেছে সে নাকি কাউকে চিনতে পারতো না, সব সময় নিজের কথাই বলতো। ভাবো একবার, ওকে বিয়ে ক'রে পেদ্রো পারামো নিজেকে কী সাজা দিয়েছেন!'

'আমি জানি। বেচারা দোন পেদ্রো।'

'না, ফাউস্তা। এই সাজা পাওয়া উচিত ছিলো ওঁর। আরো-বেশি সাজা।'

'দেখুন, এখনও জানলাটা অন্ধকার।'

আর দুই স্ত্রীলোক, যারা এগারোটা নাগাদ গির্জে ছেড়ে বেরিয়েছে, ছায়ায় মিলিয়ে গেলো। দেখতে পেলে মেদিয়া লুনার দিকে হনহন ক'রে কে-একজন প্লাসা পেরুচ্ছে।

'দেখুন, দোনিয়া ফাউস্তা। ওঁকে দেখে ডাক্তার ভালেন্‌সিয়া ব'লে মনে হচ্ছে না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। আমি যদিও কাছের জিনিশ দেখতে পাই না, তবু ওকে ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না।'

'মনে রাখবেন উনি সবসময় কালো কুর্তা আর শাদা পাৎলুন পরেন। বাজি ধ'রে বলতে পারি মেদিয়া লুনায় নিশ্চয়ই কিছু-একটা হয়েছে, নইলে এমন হন্তদন্ত হ'য়ে উনি ছুটতেন কেন।'

'ঠিকই বলেছেন। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক-কিছু হয়েছে। ফিরে গিয়ে পাদ্রে রেন্‌তেরিয়াকে খবর দেয়া উচিত। ওঁর ওখানে যাওয়া উচিত এক্ষুনি, বেচারা নইলে পাপস্বীকার না-ক'রেই মরবে।'

'ভাববেন না, আন্‌হেলেস, ঈশ্বর তা হ'তে দেবেন না। বিশেষত এই মর্তে সে এত কষ্ট পেয়েছে যখন। তিনি ওকে আত্মার সাহায্য ছাড়া মরতে দেবেন না—তাহ'লে পরলোকেও বেচারি বিষম কষ্ট পাবে। যদিও মরমিয়ারা বলেন যে পাগলদের পাপস্বীকার করার দরকার নেই, তারা নিষ্পাপ, আত্মা যদি কলুষিত বা কলঙ্কিত হয় তবু। তা, ঈশ্বরই শুধু তা জানেন ···দেখুন! দেখুন! জানলায় আবার আলো জ্বলেছে! আশা করি সবকিছু ঠিকঠাক সামলে যাবে। সবে গির্জেটাকে বড়োদিনের জন্যে সাজিয়েছি, এখন ও-বাড়িতে কেউ মারা গেলে আমাদের এত খাটুনির ফল কী হবে ভাবুন। দোন পেদ্রোর যা ক্ষমতা, পলকের মধ্যে সব নষ্ট ক'রে ফেলবেন।'

'আপনি সবসময়েই খারাপটাই আশঙ্কা করেন, দোনিয়া ফাউস্তা। আমি যা করি আপনার তা-ই করা উচিত—সব ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিন। আভে মারিয়া বলুন একবার, ঠিক জানি আজ আর কাল সকালের মধ্যে খারাপ-কিছু হবে না।'

'বিশ্বাস করুন, আনুহেলেস, আপনি সবসময় জানেন কেমন ক'রে আমার মেজাজ ভালো ক'রে দিতে হয়। আপনার কথাগুলো মাথায় নিয়েই আমি ঘুমোতে যাবো। লোকে বলে ঘুমের মধ্যে কেউ যা ভাবে তা সরাসরি স্বর্গে চ'লে যায়। শুধু আশা করি আমার ভাবনাও যেন অতদূরে পৌঁছোয়। শুভ রাত্রি।'

'শুভ রাত্রি, ফাউস্তা।'

দুই স্ত্রীলোক যে যার বাড়ি চ'লে গেলো। আবার গ্রামটায় এঁটে বসলো রাত্রির স্তব্ধতা।

'আমার মুখ ধুলোয় ভ'রে আছে।'

'হ্যাঁ, পাদ্রে।'

' "হ্যাঁ, পাদ্রে" বোলো না। আমি যা বলি তা-ই আওড়াও।'

'কিন্তু আপনি আমায় কী বলবেন? আমাকে কেন আবার গোড়া থেকে পাপস্বীকার করতে হবে?'

'এ পাপস্বীকার নয়, সুসানা। আমি শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তোমায় মৃত্যুর জন্যে তৈরি ক'রে দিতে এসেছি।'

'আমি মরছি বুঝি?'

'হ্যাঁ, বাছা।'

'তাহ'লে আপনি আমায় রেহাই দিচ্ছেন না কেন? আমি বিশ্রাম করতে চাই। ওরা নিশ্চয়ই আপনাকে ডেকে এনেছে, শুধু আমায় জাগিয়ে রাখবে ব'লে। আমার ঘুম চটিয়ে দিতে। আর একবার ঘুম চ'টে গেলে আবার ঘুমোতে পাবো কী ক'রে। পাবোই না, পাদ্রে। দোহাই, আমায় বিশ্রাম করতে দিন।'

'দেবো, সুসানা। শুধু যদি তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমি যা বলি তা-ই বলো তবে তুমি আবার ঘুমোতে যেতে পারবে। এ প্রায় নিজেকে ঘুমপাড়ানি গান শোনানোর মতো, আর একবার তুমি ঘুমিয়ে পড়লে কেউ তোমাকে জাগাতে পারবে না। কোনোদিনও না।'

'ঠিক আছে, পাদ্রে। আপনি যা বলবেন, তা-ই করবো।'

পাদ্রে রেন্তেরিয়া বিছানার ধারে ব'সে আছেন। তার কাঁধে হাত রেখে

মুখটা তার কানের কাছে নামিয়ে আনলেন, গোপনে ফিশফিশ ক'রে বললেন তাঁর কথা: 'আমার মুখ ধুলোয় ভ'রে আছে।' তারপর তিনি থামলেন। দেখতে চাইলেন তার ঠোঁট নড়ছে কিনা। ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

'আমার মুখ ভ'রে আছে তোমার মুখে, তোমার চুমোয়। তোমার কঠিন ঠোঁট কামড়ে ঠেশে ধরেছে আমার…'

সে আড় চোখে পাদ্রে রেন্‌তেরিয়ার দিকে তাকালে, কিন্তু তাঁকে শুধু আবছা দেখতে পাচ্ছে সে, যেন তিনি মেঘলা-কোনো জানলার ওপারে রয়েছেন। তারপর সে আবার নিজের কানে তাঁর গলা শুনতে পেলে:

'আমি আমার লালার ফেনা গিলছি। মাটির দলা খাচ্ছি। তারা কিলবিল করছে কেঁচোয়। তারা আমার গলায় আটকে যাচ্ছে, ঘষটে যাচ্ছে টাগরা…আমার ঠোঁট ঢিলে হ'য়ে যায়, যন্ত্রণায় বেঁকে যায়, আমার দাঁত চিবিয়ে খায় সব। আমার মুখ মিলিয়ে যায়, চোখ দুটি গ'লে যায় কাদায়, চুল চ'লে যায় শিখার কাছে…।'

তার নিথর ভাব দেখে তিনি ভাবছেন। তার চিন্তাকে ঐশ্বরিক ক'রে দিতে পারলে ভালো লাগতো তাঁর, যে-মূর্তিগুলো তিনি তার বুকে বপন ক'রে দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে তার হৃদয়কে লড়তে দেখলে ভালো লাগতো তাঁর। তার চোখে তাকালেন তিনি, সে ফিরে তাকালে তাঁর দিকে। তাঁর মনে হ'লো তার ঠোঁট দুটিকে তিনি মৃদু হাসিতে ভ'রে যেতে দেখছেন।

'আরো বাকি আছে এখনও। ঈশ্বরের দর্শন। মহিমা। তাঁর অসীম স্বর্গের মমতাময় আলোর ধারা। দেবদূতদের উল্লাস, দেবদূতদের গান। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টির মধ্যেই সুখ, শেষ পলায়মান দৃশ্য যারা চিরযন্ত্রণায় দণ্ডিত। ঐ যন্ত্রণার কাছে পার্থিব দুঃখকষ্ট কিছুই নয়। আমাদের অস্থি-র মজ্জা আগুন হ'য়ে ওঠে, শিরাগুলো হ'য়ে ওঠে শিখা। আর ভয়ংকর নিদারুণ যন্ত্রণা কখনও হ্রাস পায় না: ঈশ্বরের রোষে তা চিরপ্রজ্বলিত হ'য়ে থাকে।'

'সে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো। সে আমায় ভালো বেসেছিলো।'

পাদ্রে রেন্‌তেরিয়া তাকিয়ে দেখলেন কারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে। বুকে আড়াআড়ি দুই বাহু, পেদ্রো পারামো দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। তাঁর পাশে, ডাক্তার ভালেন্‌সিয়া। তারপর আরো

কয়েকজন। আরো দূরে, ছায়ার মধ্যে, কয়েকজন স্ত্রীলোক, সেই যাদের তর সয় না কখন মৃতের জন্যে জপ শুরু ক'রে দেবে।

উঠে যাবার ইচ্ছে হ'লো তাঁর। ইচ্ছে হ'লো তাকে অন্তিম লেপন দিয়ে বলতে: 'আমি শেষ করলাম।' কিন্তু না, এখনও তিনি শেষ করেননি। সে অনুতাপ করেছে কিনা সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না-হ'য়ে তিনি অন্তিম লেপনের প্রসাদ বিতরণ করতে পারেন না।

সন্দেহ হ'তে শুরু করলো তাঁর। হয়তো বেচারার অনুতাপ করার কিছু নেই। হয়তো তাঁর কিছুই মার্জনা ক'রে দেবার নেই। তার দিকে আবার হেলে প'ড়ে তার কাঁধ ধ'রে নরমভাবে ঝাঁকালেন তিনি। 'তুমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাচ্ছো,' নিচু গলায় তিনি বললেন, 'আর পাপীদের তিনি কঠোর সাজা দেন।'

তারপর তিনি আরো-একবার তার কানে ঠোঁট রাখলেন, কিন্তু সে তার মাথা নাড়লে: 'চ'লে যান, পাদ্রে! আমায় নিয়ে ভাববেন না। আমি শান্তি অনুভব করছি এখন, আমি ঘুমোতে চাই।'

ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে-থাকা মেয়েদের একজন ফোঁপাতে শুরু ক'রে দিলে।

সুসানা সান হুয়ান যেন প্রাণ ফিরে পেলে আবার। বিছানায় উঠে ব'সে সে বললে: 'হুস্তিনা, তুমি তোমার কান্না দয়া ক'রে অন্য-কোথাও নিয়ে গিয়ে কাঁদবে।'

তারপর তার মনে হ'লো তার পেটে যেন ছিঁড়ে পড়ছে তার মাথা। সে আলাদা করতে চাইলো তাদের, ঠেলে পাশে সরাতে চাইলো পেট, পেটটা তার চোখ ধাঁধিয়ে তার দম আটকে দিচ্ছে। কিন্তু আরো, আরো নিচে ঝুলে পড়লো তার মাথা, যেন সে রাত্রির অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

'আমি ছিলাম সেখানে। আমি দোনিয়া সুসানাকে মরতে দেখেছি।'

'কী বললে, দোরোতেয়া?'

'যা বললাম এইমাত্র।'

ভোরবেলায় গ্রাম জেগে উঠলো ঘণ্টার শব্দ শুনে। আটই ডিসেম্বরের সকাল এটা। ধূসর এক সকাল, তবে তেমন ঠাণ্ডা নয়। ঘণ্টা বাজানো শুরু হয়েছিলো সবচেয়ে বড়ো ঘণ্টাটা দিয়ে, তারপর অন্যগুলো বেজেছিলো পর-পর। কিছু লোকে ভেবেছিলো তারা বুঝি প্রধান খ্রীস্টযাগের জন্যে ঘণ্টা বাজাচ্ছে, আর

দরজা খুলতে শুরু করেছিলো। কিন্তু শুধু অল্প কয়েকজনই, যারা ভোরের আগেই জেগে ওঠে আর জেগে শুয়ে থাকে যতক্ষণ-না ঘণ্টার ধ্বনি তাদের বলে রাত্তির শেষ হয়েছে। কিন্তু ঘণ্টা বেজেই চললো, যতক্ষণ বাজা উচিত তার চেয়েও বেশিক্ষণ। আর এ শুধু প্রধান গির্জেটারই ঘণ্টা নয়, সাংগ্রে দে ক্রিস্তো, ক্রুস ভের্দে, এমনকী সান্‌তুয়ারিয়োর ঘণ্টাও। দুপুরবেলায়ও ঘণ্টা বেজেই চললো, রাত্রি নামার পরেও। তারা বাজলো দিন আর রাত, রাত দিন, আরো জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে। গ্রামের লোককে চেঁচিয়ে কথা বলতে হ'লো কথাগুলো যাতে শোনা যায়। 'কী হয়েছে?' তারা পরস্পরকে জিগেশ করলে।

তিন দিন পরে সকলেরই কানে তালা ধ'রে গেলো। ঐ ঘণ্টার শব্দের মধ্যে কথা বলাই অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। আর ঘণ্টা শুধু বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে, কোনো-কোনো ঘণ্টা এখন ঝনঝন ফেটে পড়েছে, এক মরা, ফাঁকা আওয়াজে।

'দোনিয়া সুসানা মারা গেছেন।'

'মারা গেছে? কে?'

'তাঁর স্ত্রী।'

'কার?'

'পেদ্রো পারামোর।'

অন্তহীন ঘণ্টার শব্দ অন্য অনেক জায়গা থেকেও লোকজনকে টেনে আনতে শুরু করলো। তারা কোন্‌ৎলা থেকে এলো যেন তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছে। আর আরো-দূর থেকে। কোত্থেকে এসে হাজির হ'লো এক সার্কাস, নাগরদোলা আর চরকিচাকা সমেত। আর তারপর এলো গাইয়ে-বাজিয়ের দল। গোড়ায় তারা ছিলো শুধু নিছকই দর্শক, কিন্তু শিগগিরই তারা প্লাসার ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে বাজনা শুরু ক'রে দিলে। একটু-একটু ক'রে উপলক্ষটা বদলে গেলো মেলায়, উৎসবে। কোমালায় এমন গিশগিশে ভিড় যে কোথাও একটু পা ফেলাই মুশকিল।

ঘণ্টা একসময়ে অবশেষে থেমে গেলো বটে, কিন্তু মেলা নয়। ভিড়কে এটা বোঝানোই অসম্ভব ছিলো যে ঘণ্টা বেজেছিলো মৃতের জন্যে, তাদের বাড়ি যেতে বলার কোনো উপায়ই ছিলো না। এবং, আরো, আরো লোক এসে হাজির হ'লো।

মেদিয়া লুনা প'ড়ে আছে স্তব্ধ, চুপ। সব দাসদাসী খালি পায়ে চলাফেরা

করছে, ফিশফিশ ক'রে কথা বলছে। হুসানা সান হুয়ানের কবর হ'লো সমাধিচত্বরে, কিন্তু কোমালায় কেউ তা প্রায় জানতেই পারেনি। মেলার জন্যে। মোরগের লড়াই আর গানবাজনা। ফিরিওয়ালার চীৎকার আর মাতালের হল্লা। গ্রামটা আলোয় আর কোলাহলে ভরা, আর মেদিয়া লুনায় সব ছায়া। সব চুপ। পেদ্রো পারামো কোনো কথাই বলবেন না, ঘর ছেড়ে একবারও বেরুবেন না। শপথ ক'রে বললেন কোমালার ওপর তিনি শোধ তুলবেন :

'আমি আমার হাত মুঠো করবো আর কোমালা না-খেতে পেয়ে মরবে।'

আর তিনি ঠিক তা-ই করলেন।

...

এল্ তিল্কুয়াতে কেবলই ফিরে-ফিরে আসে : 'আমরা এখন কার্রান্সার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে।'

'আর হেনেরাল ওব্রেহোনের সঙ্গে।'

'ভালো।'

'কিন্তু ওরা শান্তির চুক্তি করেছে। আমাদের আর কিছু করার নেই।'

'সবুর। লোকগুলোকে সশস্ত্র রাখো। শান্তি খুব বেশিদিন টিকবে না।'

'পাদ্রে রেন্তেরিয়াও সশস্ত্র হয়েছেন। আমরা তাঁর পক্ষে থাকবো, না বিপক্ষে?'

'সরকারের পক্ষে থাকো।'

'কিন্তু আমরা তো বেসামরিক। ওরা এমন ভাব করে যেন আমরা বিদ্রোহী।'

'তাহ'লে যাও, গিয়ে একটু বিশ্রাম করো।'

'তা কেমন ক'রে করি?'

'তাহ'লে তোমার যা-খুশি করো।'

'ভাবছি পাদ্রের লোকজনদের সঙ্গে যোগ দেবো। ওরা যেমনভাবে চ্যাঁচায় ভালো লাগে। তাছাড়া কিছু-একটা হ'লে উনি আমাদের আত্মাকে উদ্ধার করতে পারবেন।'

'যা-খুশি করো।'

...

পেদ্রো পারামো বসেছিলেন পুরোনো একটা চামড়ার চেয়ারে, মেদিয়া লুনার প্রধান ফটকটার কাছে। রাত্রির শেষ ছায়াগুলো উধাও হ'য়ে যাবার একটু আগে। সেখানে তিনি বসেছিলেন, একা, তিন ঘণ্টারও ওপর। তিনি ঘুমোননি। ঘুমের কথা তিনি ভুলেই গিয়েছেন। সময়ের কথাও। 'বুড়োরা এমনিতেই বেশি ঘুমোয় না। ঘুমোয়ই না মোটে। আমরা হয়তো ঢুলি মাঝে-মাঝে, কিন্তু ভাবনা থামাই না কখনও। সেই একটা কাজই আমাদের বাকি আছে।' তারপর তিনি সশব্দে যোগ করলেন : 'আর খুব-একটা দেরি হবে না। আর তেমন দেরি হবে না।'

আর ব'লে চললেন : 'অনেককাল হ'য়ে গেলো তুমি আমায় ছেড়ে চ'লে গিয়েছো, সুসানা। আলো তেমনি একই আছে, তখন যেমন ছিলো তেমনই। তেমন লাল নয়, তবে তেমনি মরা, মিয়োনো, ঠাণ্ডা, কারণ সূর্য লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে। সবকিছুই একইরকম থেকে গিয়েছে। এটা এমনকী সেই একই মুহূর্ত। আমি ছিলাম এখানে, ফটকের কাছে, দেখছিলাম কেমন ক'রে ভোর হয়। দেখছিলাম তোমার চ'লে-যাওয়া। দেখছিলাম তুমি স্বর্গের পথে উঠে চ'লে গেলে। আর আকাশ খুলে গিয়েছিলো, বেরিয়ে এসেছিলো আলোর ধারা। এই জগতের সব ছায়া তুমি পেছনে ফেলে রেখে গিয়েছো। তুমি উধাও হ'য়ে গিয়েছো আকাশের আলোয়।

'সে-ই শেষবার তোমাকে দেখতে পেয়েছি। স্বর্গের পথের দু-ধারে গাছপালার ছায়ার মধ্যে দিয়ে তুমি চ'লে যাচ্ছো, আর তাদের শেষ পাতাগুলো ভেসে ভেসে চলেছে তোমার পেছন-পেছন। তারপর তুমি মিলিয়ে গেলে। আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম : "ফিরে এসো, সুসানা" !'

পেদ্রো পারামো তাঁর ঠোঁট নেড়েই চললেন, ফিশফিশ ক'রে বললেন কথা। পরে তিনি মুখ বন্ধ ক'রে আদ্ধেক খুললেন চোখের পাতা। ভোরবেলার ক্ষীণ আলোটুকু প্রতিফলিত করলো চোখের মণি।

সেই একই মুহূর্তে দোনিয়া ইনেস, হামালিয়েল ভিইয়ান্‌পাদোর মা, তার ছেলের দোকানের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিলেন। দরজা তিনি হাট ক'রে খুলে রেখেছেন, আবুন্দিয়ো মার্তিনেস ভেতরে গেলো। সে দেখতে পেলে হামালিয়েল কাউন্টারে ঘুমিয়ে আছে, মাছি তাড়াবার জন্যে সম্‌ব্রেরোটা মুখের ওপর চাপানো। তার

জেগে ওঠবার জন্যে অপেক্ষা করলে সে। শেষটায় সোনিয়া ইনেস রাস্তা থেকে ফিরে এলেন, ঝাঁটার বাঁট দিয়ে ছেলের পাঁজরে খোঁচা মারলেন।

'খদ্দের এসেছে!' বললেন তিনি ছেলেকে, 'ওঠ!'

হামালিয়েল ঘোঁৎ ক'রে শব্দ ক'রে একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠলো। তার চোখ দুটো রক্তরাঙা, কারণ সে আদ্ধেক রাত জেগে-জেগে মাতালদের মদ বিক্রি করেছে, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেও বেহুঁশ মাতাল হ'য়ে গিয়েছে। কাউন্টারের ওপর ব'সে পড়ে মাকে সে খিস্তি করলে, নিজেকে খিস্তি করলে, সবচেয়ে বেশি খিস্তি করলে জীবনকে, 'জীবনটার কোনোই মানে হয় না, কোনোই দাম নেই!' তারপর সে আবার শুয়ে পড়লো, পায়ের ফাঁকে দুই হাত গুঁজে, ঘুমের কাছে ফিরে যেতে-যেতেও বিড়বিড় ক'রে শাপ দিলে :

'বেজম্মা মাতালগুলো যদি এখনও হল্লা করে সেটা আমার দোষ নয়।'

'বেচারা ছেলেটা। ওকে ক্ষমা ক'রে দাও, আবুন্দিয়ো। সারা রাত কোন সব বাইরের লোক এখানে এসে মদ টানছিলো, বেচারা সারাক্ষণ ওদের সঙ্গে কাটিয়েছে। তা এত ভোরে তুমিই বা কী জন্যে এসে হাজির?'

সে কথাগুলো বললে গলা ফাটিয়ে কারণ আবুন্দিয়ো লোকটা কালা।

'আমার এক পাইট কোহল চাই।'

'রেফুহিয়ো আবার জ্ঞান হারিয়েছে বুঝি?'

'সে মারা গেছে, মাদ্রে ভিইয়া! মারা গেছে কাল রাত্রে, এগারোটা নাগাদ। আর আমি এমনকী আমার খচ্চরটাও বেচে দিয়েছি। সে যাতে সেরে ওঠে সেইজন্যে এমনকী খচ্চরটাকে অব্দি আমি বিক্রি করেছি।'

'কী বলছো শুনতে পাচ্ছি না! না কি কিছুই বলছো না? কী বললে এইমাত্র?'

'যে সারা রাত আমি বউয়ের সঙ্গে জেগে ছিলাম। রেফুহিয়োর সঙ্গে। ও কাল রাতে মারা গেছে।'

'আমি যে মরণের গন্ধ পাচ্ছি তাতে আর তাজ্জব কী! ভাবো একবার, আমি এমনকী এই হামালিয়েলকে এখানে বলেছি: "গাঁয়ে কেউ মারা গেছে ব'লে গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু ও কোনো কান দেয়নি, কারণ, ঐ বেল্লিক মাতাল-গুলোর সঙ্গে গিলে-গিলে ও নিজেও তখন মাতাল হ'য়ে যেতে শুরু করেছে। আর জানোই তো, ও যখন মাল টানে সবকিছুই ওকে বেদম হাসায়, কোনোকিছুতেই মন দেয় না। কিন্তু বলো, নিশিজাগরের জন্যে কাকে-কাকে পেলে?'

'কাউকে না। সেইজন্যেই আরক চাই, কোহল।'

'নির্জলা?'

'হ্যাঁ, মাদ্রে ভিইয়া। সেভাবে আমি তাড়াতাড়ি মাতাল হ'য়ে যেতে পারবো। আর এক্ষুনি চাই আমার, কারণ আমার তাড়া আছে।'

'তুমি যখন চাচ্ছো তখন আদ্ধেক দামে কিনতে পারবে। তোমার বৌকে মনে ক'রে বোলো কিন্তু যে আমি সবসময়েই ওকে পছন্দ করতাম, স্বর্গে গিয়ে ও আমায় মনে রাখবে আশা করি।'

'ঠিক আছে, মাদ্রে ভিইয়া।'

'আর তার মৃতদেহটা প'চে যাবার আগেই তাকে বোলো।'

'বলবো। আর আমি জানি তুমি ওর হ'য়ে জপ করবে ব'লে ও নির্ভর ক'রে আছে। ও শান্তিতে মরেনি, কারণ ওর আত্মাকে সাহায্য করবার মতো কেউ সেখানে ছিলো না।'

'অ্যাঁ? পাদ্রে রেন্‌তেরিয়াকে আনতে যাওনি তুমি?'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা বললো তিনি এখন পাহাড়ে আছেন।'

'পাহাড়ে? কোন পাহাড়ে?'

'সে আমি জিগেশ করিনি। সে ঐ বিপ্লবের জন্যে।'

'বলতে চাচ্ছো উনিও ভিড়ে গিয়েছেন? আমাদের নিয়ে করুণা হয়, আবুন্দিয়ো।'

'আমাদের তাতে কী এসে যায়? আমাকে আরো-একটু ঢেলে দাও। হামালিয়েলের দিকে ছাখো দিকিনি, মাদ্রে ভিইয়া, ও আবার নাক ডাকাচ্ছে।'

'কিন্তু তুমি রেফুহিয়োকে স্বর্গে আমার জন্যে প্রার্থনা করতে বলতে ভুলো না। যত সাহায্য পাই ততই আমার মঙ্গল।'

'কিছু ভেবো না। ফিরে গিয়েই ওকে বলবো। আমি এমনকী ওর কাছ থেকে কথা আদায় ক'রে ছাড়বো।'

'সেই ভালো। এইভাবেই করতে হয়। জানোই তো মেয়েমানুষ কেমন হয়। সবসময় পেছনে লেগে থাকতে হয়।'

আবুন্দিয়ো মার্তিনেস কাউণ্টারে আরো কুড়ি সেন্‌তাভো ছুঁড়ে দিলে।

'বাকিটুকুও আমায় দিয়ে দাও, মাদ্রে ভিইয়া। আর যদি যত টাকা দিয়েছি তার চেয়েও বেশি দিতে চাও তবে সে তোমার ইচ্ছে। আমি রেফুহিয়োর সঙ্গে ব'সে-ব'সে মাল টানবো। আমার কুকা-র সঙ্গে।'

'তাহ'লে, এসো', আবুন্দিয়ো, হামালিয়েল জেগে ওঠবার আগেই। মাল টানলে তার মেজাজ একেবারে টং হ'য়ে থাকে, তিরিক্কি। আর বৌটাকে বলতে ভুলো না আমি কী বলেছি।'

দোকান ছেড়ে যাবার সময় সে হাঁচছিলো, কারণ কোহলটা ছিলো নির্ভেজাল অগ্নিকাণ্ড। কিন্তু লোকে বলে কিছু না-মিশিয়ে নির্জলা খেলে তুমি চট ক'রেই মাতাল হ'য়ে যেতে পারবে। সে সোজা সব ঢকঢক ক'রে গলায় ঢেলে দিয়ে শার্টের কোণা তুলে মুখ মুছলো।

সে ঠিক করেছিলো সোজা বাড়ি ফিরবে। রেফুহিয়ো তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। কিন্তু সে ভুল দিকে মোড় ঘুরলো, যে-রাস্তাটা দিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় সটান সেই রাস্তাটা ধ'রে চললো।

'দামিয়ানা!' পেদ্রো পারামো ডাকলেন। 'কে যেন আসছে। কী চায় জেনে এসো।'

আবুন্দিয়ো টলতে-টলতে এগুচ্ছে রাস্তা দিয়ে, কখনো দু-পায়ে টালমাটাল, কখনো চার হাতে-পায়ে। মাটিটা দুলছে। পাক খাচ্ছে। তার তলা থেকে হড়কে যাচ্ছে। দুই হাতে সে মাটি আঁকড়ে ধরলে, তবু তা পিছলে গেলো। সে দেখতে পেলে কে-একজন ব'সে আছে চেয়ারে, একটা দরজায়। সে থেমে পড়লো।

'একটু পেসো দিন আমায়। একটু। আমার বৌটাকে গোর দিতে হবে।'

দামিয়ানা সিস্‌নেরোস জপ করছিলো: 'রক্ষা করো আমাদের, সদাপ্রভু। অমঙ্গল থেকে আমাদের রক্ষা করো।' সে ক্রুশ আঁকলে।

আবুন্দিয়ো মার্তিনেস একটি মেয়েছেলেকে দেখতে পেলে। দেখে মনে হয় ভয় পেয়েছে। তার সামনে সে বুকে ক্রুশ আঁকছে। সে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে পেছন ফিরে তাকালো। কোনো শয়তান, কোনো পিশাচ নেই তো পেছনে। কেউই নেই।

'দয়া করুন,' সে বললে, 'আমার বৌকে গোর দিতে হবে।'

সূর্য তার কাঁধের ওপর। মাত্র কয়েক মিনিট আগে সূর্য উঠে এসেছে। ধুলোর আস্তরে ঝাপসা।

পেদ্রো পারামো দু-হাতে মুখ ঢাকলেন, যেন আলোর কাছ থেকে লুকোতে চাচ্ছেন। দামিয়ানা সিস্‌নেরোসের আর্তচীৎকার খেতগুলো দিয়ে ছুটে গেলো: 'ওরা দোন পেদ্রোকে খুন করছে!'

মেয়েছেলেটা চীৎকার করছে, আবুনদিয়ো মার্তিনেস শুনতে পাচ্ছিলো। তাকে থামাবার একটা উপায়ের কথা ভাববার চেষ্টা করলে সে, কিন্তু চিন্তাগুলোকে দিয়ে ঠিকমতো কাজ করাতে পারলে না। এটা সে জানে যে চীৎকারটা অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। হয়তো এমনকী তার বৌও তা শুনতে পাবে। কারণ এমন জোরে চ্যাচাচ্ছে যে আওয়াজটা তার কানে বিঁধে যাচ্ছে, যদিও কথাগুলো সে বুঝতে পারছিলো না। তার মনে প'ড়ে গেলো ওখানে তার বৌ, একেবারে একা, তার বাড়ির পাতিওতে খাটিয়ায় শোয়া। সে তাকে সেখানে শুইয়ে এসেছে যাতে রাতের হাওয়া তাকে ঠাণ্ডা ক'রে যায়, যাতে চট ক'রে সে গন্ধ ছেটাতে শুরু না-করে। কুকা, যে তার সঙ্গে আগের রাতে শুতে গিয়েছিলো, এখনও বেঁচে আছে, একটা বাচ্চা মাদিঘোড়ার মতো এখনও ছুটোছুটি করছে, তাকে কামড়ে, তার গায়ে নাক ঘ'ষে। কুকা, যে তাকে সেই বাচ্চা ছেলেটা দিয়েছিলো, জন্মাবার সময় যে মারা যায়, তার অসুখবিশুখের জন্যেই নাকি লোকে বলে, তার কাঁপুনি আর জ্বর আর চোখের ঘা আর অন্যসব অসুখ-বিশুখ যা থেকে সে সারাক্ষণ ভুগতো, যেমন সে বলেছিলো ডাক্তারকে, যখন শেষ মুহূর্তের জন্যে তাকে সে আনতে গিয়েছিলো, আর তার খচ্চরগুলোকে সেজন্যে তাকে বিক্রি ক'রে দিতে হয়েছে, কারণ ডাক্তারের যা খাঁই, যত টাকা হাঁকে··· কুকা, ঐ ওখানে এখন, শিশিরের মধ্যে, চোখ বোজা, ভোর হওয়া দেখতেই পাবে না। না এই ভোর, না অন্য আরো ভোর।

'দয়া করুন আমায়!' সে বললে, 'একটা পেসো দিন!'

কিন্তু নিজের কথা তার নিজেরই কানে গেলো না। ঐ মেয়েছেলেটার চীৎকার তাকে কালা ক'রে দিয়েছে।

কোমালার রাস্তায় কালো-কালো বিন্দু নড়ছে। শিগগিরই তারা বদলে গেলো মানুষে, আর তারা প্রায় এসে পড়লো ব'লে এখানে। দামিয়ানা সিস্‌নেরোস তার চীৎকার থামালে। ক্রুশ আঁকা বন্ধ করলে। প'ড়ে গেলো মাটিতে, মুখটা খোলা, যেন হাই তুলছে।

লোকে তাকে মাটি থেকে তুলে ভেতরে ব'য়ে নিয়ে গেলো।

'আপনি ঠিক আছেন তো, পা ত্রো ন?' তারা জিগেশ করলে।

পেদ্রো পারামো কেবল তাঁর মাথা নাড়লেন।

তারা আবুনদিয়োর কাছ থেকে হাতিয়ারটা কেড়ে নিলে, তখনও সে রক্ত-মাথা ছুরিটা হাতে ধ'রে ছিলো।

'চ'লে এসো,' ওরা বললে, 'সত্যি-সত্যি ফেঁসে গেলে এবার।'

আর সে তাদের পেছন-পেছন গেলো।

তারা কোমালায় এসে পৌছুবার ঠিক আগটায় সে অনুমতি চাইলে। এক পাশে স'রে গিয়ে বমি করতে শুরু ক'রে দিলে, পিত্তশুদ্ধু, দুর্গন্ধেভরা, হলদে। ধারার পর ধারা, যেন সে গ্যালন-গ্যালন জল খেয়েছে। তারপর তার মাথাটা দপদপ করতে লাগলো, জিভটা বিষম ভারি আর পুরু লাগছে।

'মাতাল হ'য়ে গেছি আমি,' সে বললে।

অন্যরা যেখানে অপেক্ষা করছিলো সেখানে সে ফিরে গেলো। তাদের কাঁধে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো, আর তারা তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো। ধুলোর ওপর তার পা একটা লম্বা ভাঁজ কাটলো।

পেদ্রো পারামো তখনও ব'সে ছিলেন তাঁর চামড়ার চেয়ারে, তাদের গাঁয়ের দিকে চ'লে যেতে দেখছিলেন। বাঁ হাতটা যখন তোলবার চেষ্টা করলেন, সেটা মরা প'ড়ে গেলো তাঁর হাঁটুতে, কিন্তু সেদিকে তিনি কোনো পাত্তা দিলেন না। প্রতিদিন নিজের শরীরের একেকটা অংশকে ম'রে যেতে দেখতে তিনি অভ্যস্ত। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন স্বর্গের গাছগুলো দুলছে, পাতা ঝরাতে-ঝরাতে। 'সকলেই একই রাস্তা বেছে নেয়। সকলেই চ'লে যায়।' তারপর তিনি ফিরে চ'লে গেলেন সেখানে যেখানে তাঁর ভাবনাগুলোকে এলোমেলো ছড়িয়ে ফেলে রেখে এসেছেন।

'সুসানা,' বললেন একবার, চোখ দুটি বুজলেন, 'তোমাকে কত অনুনয় ক'রে বলেছি ফিরে আসতে…

'…মাথার ওপর ছিলো ভরা চাঁদ। পূর্ণিমার। আমি তোমার থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। জ্যোৎস্না তোমার মুখখানা ধুইয়ে দিচ্ছিলো। আমি শুধু তাকিয়ে থেকেছি, শুধু দেখেছি সে-কোন্ আশ্চর্য অনুপম দৃশ্য তুমি। নরম, ঝলমলে – জ্যোৎস্নার মধ্যে। তোমার ঠোঁট দুটি ভেজা-ভেজা, তারাদের সঙ্গে-সঙ্গে চকচক করছে। তোমার শরীর স্বচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছে শিশিরে। সুসানা। সুসানা সান হুয়ান।'

হাত তুলে প্রতিমাটিকে স্পষ্ট ক'রে তোলবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু হাত প'ড়ে রইলো হাঁটুতে, যেন সে পাথর। অন্য হাতটা তোলবার চেষ্টা করলেন, সেটা প'ড়ে গেলো তাঁর পাশে, আস্তে, যতক্ষণ-না মাটিতে গিয়ে ঠেকলো, তাঁর অপ্রয়োজনীয় কাঁধটা যেন তুলে ধ'রে রেখেছে কোনো ক্রাচ, অন্ধের যষ্টি।

'ম'রে যাচ্ছি আমি,' বললেন।

সূর্য ঘুরতে লাগলো পৃথিবীর ওপর, ফিরিয়ে নিয়ে এলো আকার, আকৃতি, অবয়ব। তাঁর ধ্বস্ত হাতদুটি ছড়িয়ে আছে তাঁর সামনে, শূন্য। তাপ শরীর গরম ক'রে দিচ্ছে। চোখ দুটো নড়ছে না আদৌ। তারা লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে স্মৃতি থেকে স্মৃতিতে, মুছে দিয়ে যাচ্ছে বর্তমান। হঠাৎ তাঁর হৃদয় থমকালো। মনে হ'লো সময়ও যেন থমকে গেলো। আর প্রাণবায়ু।

'তাহ'লে অন্য-কোনো রাত আর হবে না,' ভাবলেন।

কারণ রাত তাঁর ভয় করে। ভয় করে ছায়ামূর্তিগুলো, অন্ধকারে যারা ঘিরে ধরে তাঁকে।

'আমি জানি আবুন্দিয়ো ফিরে আসবে একটু পরে, তার রক্তমাখা হাত দুটি পেতে ভিক্ষে চাইবে সারাক্ষণ যে-ভিক্ষে ওকে আমি দেবো না। আর আমি হাত তুলে চোখ আড়াল করতে পারবো না—ওকে না-দেখা সম্ভব হবে না, আমায় শুনতেই হবে ওকে যতক্ষণ না দিনের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে ওর স্বর মিলিয়ে যায়। যতক্ষণ-না ওর স্বর ম'রে যায়।'

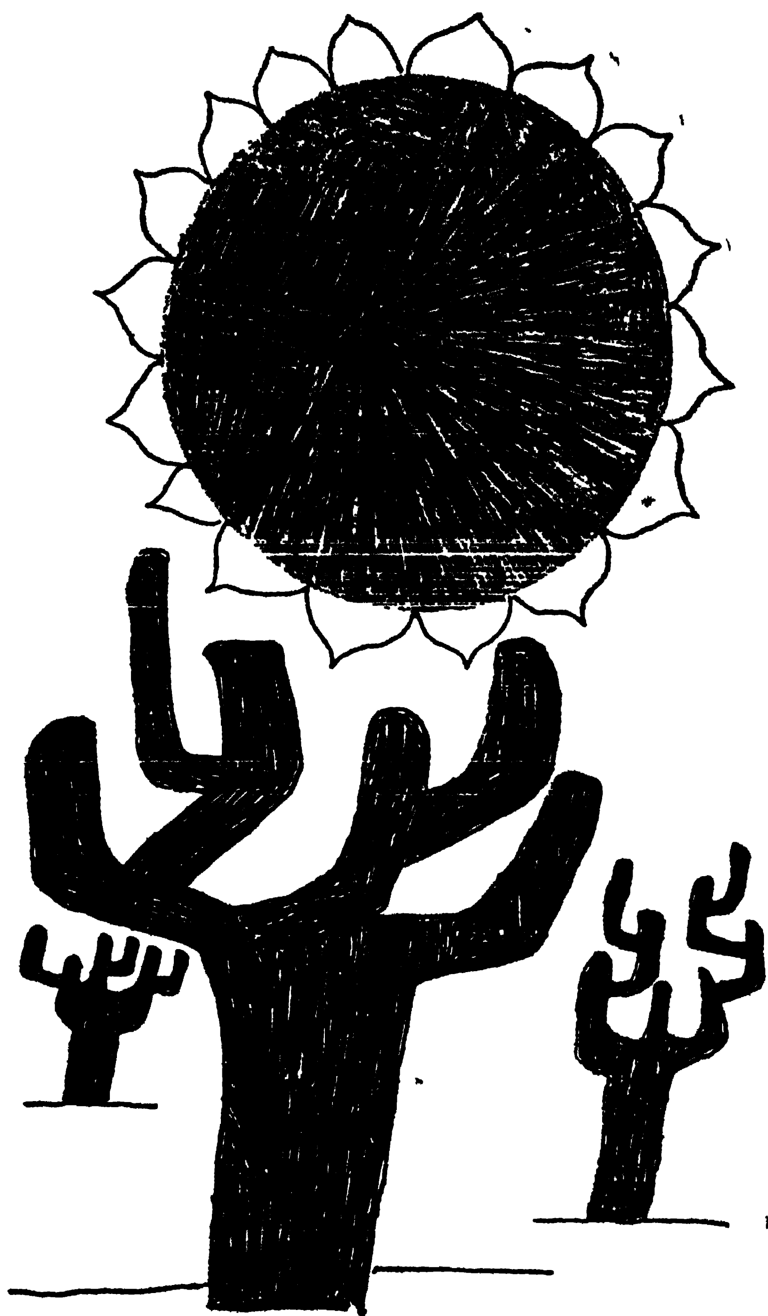
অনুভব করলেন একজোড়া হাত তাঁর কাঁধ ছুঁলো, সোজা হ'য়ে বসলেন।

'দোন পেদ্রো,' দামিয়ানা বললে: 'আপনার খাবার এনে দেবো কি এখানে।'

পেদ্রো পারামো বললেন: 'না, আমি ভেতরে যাবো।'

দামিয়ানার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটবার চেষ্টা করলেন। কয়েক পা গিয়েই প'ড়ে গেলেন থুবড়ে, ভেতরে-ভেতরে অনুনয় করছেন, কিন্তু একটাও কথা বলেছেন না। মাটির গায়ে আস্তে ঘুষি কষালেন একটা, তারপর টুকরো-টুকরো হ'য়ে গুঁড়িয়ে গেলেন, যেন একটা পাথরের স্তূপ।

———



জ্বলন্ত প্রান্তর

মাকারিও

আমি ব'সে আছি নালাটার পাশে, ব্যাঙগুলো কখন বেরিয়ে আসে তারই অপেক্ষায়। কাল রাত্তিরে যেই আমি খেতে বসেছি, ওরা ভীষণ হৈ-হৈ শোরগোল শুরু ক'রে দেয়, ভোর অব্দি সে-গান ওরা থামায়নি। ধর্মমাও তা-ই বলেন—ব্যাঙের ডাক তাঁর ঘুমকে এমন আঁৎকে দেয় যে ঘুমটুম সব চ'টে ভেগে যায়। এখন তিনি সত্যি ঘুমুতে চাইছেন। সেই-জন্যেই আমাকে এখানে ব'সে থাকতে হুকুম করেছেন তিনি, এই নালাটার পাশে হাতে একটা কাঠ নিয়ে, যত-ক-টা ব্যাঙ জল থেকে লাফিয়ে বেরুবে সবক-টাকে একঘায়ে চেপটে ছেৎরে দেবো। পেটটা ছাড়া এ-ব্যাঙগুলোর সারা গা-ই সব্জে। কোলাব্যাঙগুলো সব কালো। ধর্মমায়ের চোখদুটোও কালো। এ ব্যাঙগুলো দারুণ খেতে—কোলাব্যাঙগুলো অবশ্যি নয়। লোকে কোলাব্যাঙ খায় না, তবে আমি খাই, ওগুলো সোনাব্যাঙের মতোই খেতে। ফেলিপাই সবসময় বলে কোলাব্যাঙ খেলে খারাপ হয়। ফেলিপার চোখগুলো সবুজ, ঠিক বেড়ালের মতো। যখনই খেতে যাই ও আমায় রান্নাঘরেই খেতে দেয়। ও চায় না যে আমি ব্যাঙগুলোকে কষ্ট দিই। কিন্তু কী করতে হবে না-হবে সে তো ধর্মমাই আমাকে সবসময় হুকুম ক'রে ব'লে দেন—আমি ধর্মমায়ের চাইতে ফেলিপাকে বেশি ভালোবাসি। কিন্তু ধর্মমাই তো তাঁর ব্যাগ থেকে টাকা বার ক'রে দেন ফেলিপাকে, সব খাবার কেনবার জন্যে। ফেলিপা একা-একা রান্নাঘরে ব'সে আমাদের তিনজনের জন্যে রান্না করে। ওকে যদ্দিন থেকে জানি, ও শুধু রান্নাই ক'রে আসছে। থালাবাসন মেজে দেবার কাজটা আমার। উনুনের জন্যে লাকড়ি নিয়ে আসাও আমার কাজ। তারপর ধর্মমাই শুধু আমাদের খাবার ভাগ ক'রে দেন। নিজে খেয়ে নেবার পর উনি ওঁর হাত দিয়ে ডাঁই করে দুটো ভাগ করেন, একটা ডাঁই ফেলিপার জন্যে, অন্যটা আমার। কিন্তু ফেলিপার, প্রায়ই, কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না, তখন দুটো ডাঁইই আমার। সেই জন্যেই আমি ফেলিপাকে ভালোবাসি, কারণ সবসময় আমার খিদে থাকে, কখনও পেট ভরে না—কখনও না, ফেলিপার

ভাগের খাবারটা গবগব ক'রে খাবার পরেও না। ওরা বলে কিছু খেলে নাকি লোকের পেট ভরে, কিন্তু এটা আমি ভালো ক'রেই জানি যে আমার পেট ভরে না—যদি ওরা আমাকে সব খাবার দিয়েও দেয়, তবু না। আর ফেলিপাও সেটা জানে—রাস্তায় ওরা বলাবলি করে আমার নাকি মাথা খারাপ, কারণ আমার প্রচণ্ড খিদেটা কখনও মেটে না। ধর্মমাই এ-সব ওদের বলতে শুনেছেন। আমি শুনিনি। ধর্মমা আমাকে কখনও একা-একা রাস্তায় বেরুতে দেন না। যখন উনি আমাকে নিয়ে বেরোন, সে শুধু গির্জেয় গিয়ে খ্রীস্টযাগ শোনাবার জন্যে। সেখানে উনি আমাকে ওঁর পাশে বসিয়ে, ওঁর শালের আঁচল দিয়ে আমার হাতদুটি বেঁধে দেন; কেন-যে ওভাবে হাত বেঁধে রাখেন, তা আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু উনি বলেন সে নাকি, ওরা যেমন বলে, আমি সব উদ্ভট বিকট কাজ করি ব'লে। একদিন ওরা দেখেছিলো আমি নাকি কাকে ফাঁসিতে লটকাচ্ছি, কোন্-এক মহিলার নাকি একবার গলা টিপে ধরেছিলাম—কোনো কারণ বিনাই। আমার ও-সব মনে পড়ে না। কিন্তু ধর্মমাই আমাকে ব'লে দেন আমি কখন কী করেছি, আর উনি কখনোও মিছে কথা ব'লে বেড়ান না। যখন উনি আমার খেতে ডাকেন, সে শুধু আমাকে আমার ভাগের খাবার দেবার জন্যে। উনি অন্যদের মতো নন, ঐ যারা আমাকে খেতে ডাকে, তারপর কাছে গেলেই কেবল ঢিল ছোঁড়ে, যতক্ষণ-না ওখান থেকে ছুটে পালাই। না, ধর্মমা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। সেইজন্যেই ওঁর বাড়িতে আমি বেশ আছি, তোফা। তাছাড়া, ফেলিপাও এখানে থাকে। ফেলিপাও আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে। সেই জন্যেই ওকে আমি ভালোবাসি—ফেলিপার দুধ ঠিক জবাফুলের মতো মিষ্টি। আমি ছাগীর দুধ খেয়েছি, সদ্য-শুয়োরছানা-পাড়া শুয়োরীর দুধও খেয়েছি। কিন্তু না, ফেলিপার দুধের মতো কিছুই অত ভালো নয়—এখন অবশ্য অনেকদিন হ'য়ে গেলো ও আমাকে মাই চুষতে দেয় না, যেখানে আমাদের বুকের নিচে পাঁজরা থাকে সেখানে ওর মাই থাকে, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসে ভালো দুধ, যদি কেউ জানে কেমন ক'রে চুষতে হয়—ধর্মমা যে রোববার দুপুরে আমাদের দুধ খেতে দেন, তার চেয়েও ভালো—আমি যে-কুঠুরিটায় ঘুমুই, ফেলিপা সেখানে আসতো, আমার কাছ ঘেঁষে গুটিশুটি শুতো, এপাশে-ওপাশে একটু ঝুঁকে। তারপর আমায় তার মাইয়ের বোঁটা ধরিয়ে দিতো যাতে আমি মিষ্টি গরম-গরম দুধ চুষে-চুষে খেতে পারি, আমার জিভের মধ্যে কেমন ঝরনার মতো

ঝ'রে পড়তো দুধের ধারা—সে যে কতবার খিদে ভুলে থাকবার জন্যে জবাফুল খেয়েছি আমি। আর ফেলিপার দুধের স্বাদও ঠিক ও-রকম, শুধু ওরটা আমি বেশি ভালোবাসি, কারণ ওকে যখন চুষতে থাকি, ফেলিপা আমার সারা গায়ে শুড়শুড়ি দেয়। তারপরে প্রায় সব-রাত্তেই সকাল অব্দি আমার গা ঘেঁষে সেখানেই শুয়ে থাকতো। আর সেটা ভারি ভালো লাগতো আমার, কারণ আর ঠাণ্ডা লাগতো না—আর একা যদি কোনো রাতে দুম ক'রে ম'রে যাই তবে একা-একা যে নরকে পচতে হবে, সে-ভয় আর থাকতো না। মাঝে-মাঝে নরককে আমার অত ভয় করে না। কিন্তু প্রায়ই ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। আর তখন আমি নিজেকেই ভয় দেখাই: এখন তো যে-কোনোদিন হঠাৎ গিয়ে পৌঁছুবো নরকে, কারণ আমার মাথা এত শক্ত যে সামনে যা-ই পাই তাতেই মাথা ঠুকতে থাকি। তখন ফেলিপা এসে আমার ভয়কে ভয় দেখায়। ওর হাত দিয়ে আমায় শুড়শুড়ি দেয়, ও-ই দেয়, ও-ই জানে কেমন ক'রে শুড়শুড়ি দিতে হয়—আর আমার যে অত মরার ভয়—তাকে তাড়িয়ে দেয়। আর, একটুক্ষণের জন্যে তা আমি ভুলেও যাই—ফেলিপা বলে, যখন ও আমার কাছে থাকতে চায়, যে ও প্রভু ভগবানকে আমার সব পাপের কথা ব'লে দেবে। ও তো খুব শিগগিরই স্বর্গে যাবে, আর প্রভুর সঙ্গে কথা বলবে, আমার পায়ের পাতা থেকে চুলের ডগা অব্দি যে ভীষণ শয়তানি ভরা, তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে বলবে তাঁকে। তাঁকে আমায় ক্ষমা করতে বলবে, যাতে এ নিয়ে আমি আর মাথা না-ঘামাই। সেই জন্যেই ও রোজ গির্জেয় যায় পাপস্বীকার করতে। কিন্তু এ জন্যে নয় যে ও খারাপ মেয়ে, বরং এজন্যে যে আমার মধ্যেটায় যে শয়তান বাসা বেঁধেছে, তাকে তাড়িয়ে দিতে, আর আমার হ'য়ে পাপস্বীকার ক'রে ও শয়তানকে আমার মধ্যে থেকে ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দিতে চায়। রোজ ও পাপস্বীকার করতে যায়। প্রতিদিন, প্রতি বিকেলবেলা। ও সারাজীবন ধ'রে আমার জন্যে এই ভালো কাজটা ক'রে যাবে। এই কথাই ফেলিপা বলে আর এই জন্যেই ওকে আমি অত, ভালোবাসি—তবু, এ-রকম একটা শক্ত মোটা মাথা থাকাটা দারুণ জিনিশ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে বারান্দার থামে আমি মাথা ঠুকতে থাকি, অথচ কিচ্ছু হয় না আমার। দুমদাম মাথা ঠুকি—অথচ ফেটে যায় না। মেঝেয় মাথা ঠুকি—গোড়ায় আস্তে-আস্তে, পরে জোরে-জোরে—আর কেমন যেন ঢাকের মতো আওয়াজ হয়। ঐ যে বাঁশির সঙ্গে গুমগুম শব্দে যা বাজে, গির্জের জানলা দিয়ে

যাকের আমি শুনতে পাই, ধর্মমায়ের শালে হাত বাঁধা, বাইরে ঢাকের আওয়াজ, গুম গুম গুম—আর ধর্মমা বলেন যে আমার কুঠুরিতে যে ছারপোকা আর আরশোলা আর কাঁকড়াবিছে থাকে, তা শুধু এই জন্যেই যে আমি নরকে জ্যান্ত ঝলসাবো, যদি মেঝের ও-রকম আর মাথা ঠুকি। কিন্তু আমার যা শুনতে ইচ্ছে করে, তা ঐ ঢাক—গুম গুম গুম। ওঁর এটা জানা উচিত। এমনকী আমি যখন গির্জের ব'সে আছি, অপেক্ষা ক'রে আছি কখন শিগগির রাস্তায় বেরিয়ে দেখতে পাবো কেন অতদূর থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে, গির্জের একেবারে ভেতরটায়, পুরুতের নরকের ভয় দেখাবার মাঝখানে, 'ভালো রাস্তা আলোয় ঝলমলে। খারাপ পথ অন্ধকার।' ঐ কথাই বলে পুরুৎ। তবে আমি তো উঠে পড়ি, ঘর থেকে বেরিয়ে যাই অন্ধকার থাকতে-থাকতেই। রাস্তায় ঝাঁট দিয়ে সাফ করি, দিনের আলো আমাকে পাকড়াবার আগেই ফিরে আসি আমার কুঠুরিটায়। রাস্তায় কত-কী হয়। আমাকে দেখলেই কত লোক যে ঢিল ছুঁড়বে আমার মাথায়। সবদিক থেকে মস্ত-মস্ত ধারালো পাথর ঝ'রে পড়বে আমার মাথায়। আর তারপর তালি দিতে হবে আমার জামায়, শেলাই করতে হবে ছেঁড়া জায়গা, আর আমার মুখ আর হাঁটুর ঘা শুকোবার জন্যে অনেকদিন হাঁ ক'রে অপেক্ষা করতে হবে আমায়। আবার হাতগুলো বাঁধা থাকবে আমার। কারণ বাঁধা না-থাকলে মামড়ি খুঁটে তোলবার জন্যে উশখুশ ক'রে ঘায়ের দিকে এগুবে হাত, আর আবার রক্ত ঝরতে শুরু ক'রে দেবে। রক্তের গন্ধ আর স্বাদ ভালো। যদিও ফেলিপার দুধের স্বাদের মতো অত ভালো নয়—সেই জন্যেই আমি সবসময় আমার বাড়িতে বন্ধ হ'য়ে কাটাই—যাতে ওরা আমায় তাগ ক'রে ঢিল ছুঁড়তে না-পারে। যেই ওরা আমাকে খাইয়ে দেয়, অমনি আমি আমার কুঠুরিতে ঢুকে পড়ি আর খিল তুলে দিই যাতে আমার পাপরা আমাকে খুঁজে না-পায়, কারণ এ যে অন্ধকার। আরশোলারা কোথায় আমার গা বেয়ে-বেয়ে উঠছে তা দেখবার জন্যেও আমি আলো জ্বালি না। আমি এখন চুপটি ক'রে থাকি। ছালাগুলো বিছিয়ে শুয়ে পড়ি আমি, যখনই টের পাই আরশোলারা ওদের কিলবিলে পায়ে আমার ঘাড় বেয়ে উঠছে অমনি এক থাবড়া মেরে ওদের চেপটে ফেলি। তবু আমি আলো জ্বালি না। আমি চাই না যে আলো-জ্বালা অবস্থাতেই বেশামাল যখন কম্বলের তলায় আরশোলা হাৎড়ে বেড়াচ্ছি, আমার পাপগুলো এসে আমাকে পাকড়ে ফেলুক—আরশোলাগুলোকে যখন পিষে ফেলা যায় তখন ওরা হাউইয়ের মতো চড়বড় ক'রে ফোটে।

ঝিঁঝিঁ পোকারা চড়বড় ক'রে ফোটে কি না আমি জানি না। আমি কখনও ঝিঁঝিঁ পোকা মারি না। ফেলিপা বলে, ঝিঁঝিঁ পোকারা যে অমন ঝিঁঝিঁ ঝিঁ ক'রে ডাকে, তা নাকি নরকে শোধরাবার সময় লোকের আত্মা যে ভীষণ কাৎরায়, সেটা যাতে শোনা না-যায়। পৃথিবীতে যেদিন আর-কোনো ঝিঁঝিঁ পোকা থাকবে না, সেদিন সবকিছু ভ'রে যাবে শোধরাতে-থাকা আত্মার চীৎকারে আর কান্নায়, আর ভয়ে আমরা তখন খ্যাপার মতো এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু ক'রে দেবো। তাছাড়া কান খাড়া ক'রে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। আমার ঘরে অনেক ঝিঁঝিঁ পোকা আছে। আমি যে-বস্তাগুলো বিছিয়ে শুই, তার ভাঁজে-ভাঁজে হয়তো আরশোলাদের চাইতেও অনেক বেশি গুণ ঝিঁঝিঁ পোকাই আছে। কাঁকড়াবিছেও আছে। কিছুক্ষণ পরে-পরেই ছাত থেকে তারা টুপ ক'রে ঝ'রে পড়ে আর আমি দম আটকে নিঃসাড় প'ড়ে থাকি যতক্ষণ-না ওরা আমার গা বেয়ে মেঝেয় গিয়ে পৌঁছোয়। যদি হাতটা একটু নড়ে বা হাড়গোড় একটু কাঁপে, অমনি কামড়ে সব জালিয়ে দেয়। কামড়ে খুব ব্যথা লাগে। একবার ওদের একটা ফেলিপার পেছনে কামড়েছিলো, ও তখন কেমন গোঙাচ্ছিলো, মারিয়া মার নাম ধ'রে ডাকছিলো, আস্তে অনুনয় ক'রে বলেছিলো ওর পেছনটার যেন সর্বনাশ না-হ'য়ে যায়। আমি থুতু দিয়ে ওর পেছন ড'লে দিয়েছিলাম। সারারাত ধ'রে থুতু দিয়ে ওকে ডলেছিলাম, আর ওর সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলাম, আর একটু পরে, যখন দেখতে পেয়েছিলাম যে আমার থুতু ওকে খুব একটা সারিয়ে তুলছে না, আমি তখন যত জোরে পারি ওর সঙ্গে ব'সে-ব'সে কেঁদেছিলাম, হাউহাউ ক'রে কেঁদেছিলাম, তাতে যদি ওর একটু সাহায্য হয়। সে যাক গে, রাস্তার চাইতে এই কুঠুরিটা আমার ঢের ভালো লাগে, রাস্তায় তো ওদের নজরে প'ড়ে যাই, সেই যারা অন্য লোককে ঢিল ছুঁড়তে মজা পায়, এখানে কেউ আমায় কিছু করে না। ধর্মমা আমায় এমনকী বকেন না—তাঁর জবাফুল, মার্টল বা তাঁর ডালিম খেতে দেখলেও না। উনি তো জানেন সারাক্ষণ কী বিষম খিদে আমার, কেমন ভয়ানক খাইখাই। উনি জানেন সবসময়েই আমার খিদে থাকে। উনি জানেন কোনো ভোজ দিয়েই আমার ভেতরটাকে ঠেশে ভরানো যাবে না, যদিও সবসময়েই আমি এখান-ওখান থেকে টুকিটাকি সব খাচ্ছি। উনি জানেন শুয়োরদের জন্যেও যে শুঁটির মণ্ড হয় তাও আমি খেয়ে ফেলি। হোঁৎকা শুয়োরগুলোকে দেয়া হয় শুঁটির মণ্ড আর চিমশে-গুলোকে ভুট্টার দানার জাবনা। তাই উনি জানেন ঘুম থেকে উঠে শুতে যাওয়া

অব্দি আমি কী-রকম হা খিদে হা খিদে ক'রে ঘুরে বেড়াই। আর যতদিন এ-বাড়িতে খাওয়ার কিছু জুটবে ততদিন আমি এ-বাড়িতেই থেকে যাবো। কারণ আমি তো জানি যেদিনই খাওয়া ছেড়ে দেবো সেদিনই আমি মরবো, সোজা গিয়ে হাজির হবো নরকে। আর সেখান থেকে কেউ আমাকে বার ক'রে আনতে পারবে না, এমনকী ফেলিপাও না, ও আমার সঙ্গে অত ভালো ব্যবহার করে, কিংবা যে-তাবিজটা ধর্মমা আমায় দিয়েছেন, যেটা গলায় ঝুলিয়ে বেড়াই, সেটাও আমাকে কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না—এখন আমি নালার পাশে ঠায় ব'সে অপেক্ষা করছি ব্যাঙগুলো কখন বেরিয়ে আসে। আর যতক্ষণ ধ'রে এত কথা ব'লে যাচ্ছি ততক্ষণের মধ্যে একটাও ব্যাঙ কিন্তু বেরোয়নি। ওরা যদি বেরুতে আরো সময় নেয়, আমি হয়তো ঘুমিয়েই পড়বো। আর তখন এগুলোকে মারার কোনো উপায়ই থাকবে না, আর ধর্মমাও একফোঁটা ঘুমোতে পারবেন না। যদি শোনেন এগুলো আবার এদের উৎকট গান জুড়েছে তবে উনি বেজায় চ'টে যাবেন। আর তখন তাঁর ঘরে যে সাধুসন্তদের ছবিওলা জপের মালা আছে, তার একটাকে তিনি ব'লে দেবেন আমার পেছনে শয়তানকে লেলিয়ে দিতে, আমায় সোজা সটান চিরনরকে নিয়ে যেতে, এক্ষুনি, সঙ্গে-সঙ্গে এমনকী শোধরাবার কুণ্ডের মধ্যে দিয়ে না-নিয়েই, আর তখন আমি আমার মা বাবাকেও দেখতে পাবো না—কেননা ওঁরা তো আছেন যেখানে লোকে শোধরায়—তাই বরং এভাবে কথা ব'লে যাওয়াই ভালো—আমার সত্যি ভালো লাগবে ফেলিপার দুধের কয়েক ঢোঁক, কী ভালো দুধ ওর, আহা কী মিষ্টি, ঠিক যেন মধু, ঠিক যা আমার জিভের ওপর ঝ'রে পড়ে জবাফুলের ভেতর থেকে…

অত ঘণ্টা ধ'রে হাঁটছি, সারা পথটায় কোথাও কোনো গাছের ছায়া নেই, নেই কোনো গাছের চারা কিংবা কোনোরকম শেকড়বাকড়, তার পর এখন আমরা শুনতে পাই কুকুরের ডাক।

মাঝে-মাঝে, এই-যে রাস্তাটা যার কোনো কিনার নেই, মনে হয় ফাটল-ধরা শুকনো নালায় ভরা এই প্রান্তরের শেষে বুঝি আর কিছুই নেই, বুঝি অন্য পাশে গিয়ে কিছুই দেখা যাবে না। কিন্তু আছে তো একটা-কিছু। শহর আছে। তুমি শুনতে পাও কুকুর ডাকছে, হাওয়ায় গন্ধ পাও ধোঁয়ার, আর তুমি তারিয়ে-তারিয়ে চাখো লোকজনের এই গন্ধ, যেন এটা কোনো-একটা আশা।

কিন্তু শহর এখনো অনেক দূরে। শুধু হাওয়ার ঝাপটাই তাকে কাছে নিয়ে আসে।

আমরা সেই ভোর থেকে হাঁটছি। এখন বিকেল চারটে হবে বোধহয়। কেউ-একজন আকাশের দিকে তাকায়, সূর্য যেখানটায় ঝুলে আছে চোখ কুঁচকে তাকায় সেদিকে, আর বলে: 'বেলা চারটে হবে বোধহয়।'

সে হ'লো মেলিতোন। ফাউস্তিনো, এস্তেবান আর আমি তার সঙ্গে আছি। আমরা সবশুদ্ধ চারজন। আমি গুনি: সামনে দুজন, পেছনে দুজন। আরো পেছনে তাকিয়ে দেখি, কাউকেই দেখতে পাই না। তারপর আমি নিজেকে বলি: 'আমরা সবশুদ্ধ চারজন।' বেশিক্ষণ আগে নয়, তখন বোধহয় বেলা এগারোটা হবে, ছিলো কুড়িজনেরও বেশি, কিন্তু একটু-একটু ক'রে তারা খ'শে পড়েছে, র'য়ে গেছে শুধু আমাদের এই জটটা।

ফাউস্তিনো বলে: 'বৃষ্টি হবে বোধহয়।'

আমরা সবাই মুখ তুলে তাকাই, দেখতে পাই মাথার ওপর দিয়ে ভারি কালো মেঘ ভেসে যাচ্ছে। আর আমরা ভাবি: 'হয়তো বৃষ্টি নামবে।'

আমরা কে কী ভাবছি কিছুই বলি না। বেশ-কিছুক্ষণ হ'লো কথা বলার আর-কোনো চাড় নেই আমাদের। গরমের জন্যে। অন্য-কোথাও হ'লে আমরা খুশি হ'য়েই আলাপ চালাতাম, কিন্তু এখানে কথাবার্তা চালানো কঠিন।

এখানে তুমি যদি কিছু বলতে চাও, বাইরের গরমে কথাগুলো তোমার মুখের মধ্যে তেতে ওঠে, তোমার জিভের ওপর তারা শুকিয়ে যায়, তোমার দম আটকে দেয়। ব্যাপারটা এখানে এইরকমই। সেইজন্যেই কারু মধ্যেই আর কথা বলার কোনো ইচ্ছে নেই।

মস্ত একটা জলের ফোঁটা পড়ে, মাটির ওপর গর্ত ক'রে দেয়, আর থুতুর দলার মতো দাগ রেখে যায় বালিতে। একটাই ফোঁটা পড়ে শুধু। আমরা অপেক্ষা ক'রে থাকি আরো-সব জলের ফোঁটার জন্যে, চোখ ঘুরিয়ে দেখি তাদের খোঁজে। কিন্তু আর-কোনো জলের ফোঁটা নেই। বৃষ্টি পড়ছে না। এখন যদি তুমি আকাশে তাকাও, দেখতে পাবে দূরে হুড়মুড় ক'রে বাদল-মেঘ পালিয়ে যাচ্ছে। শহর থেকে যে-হাওয়া আসছে, সে পাহাড়গুলোর নীল ছায়ার দিকে ঠেলে নিয়ে যায় মেঘ। আর জলের যে-ফোঁটাটা ভুল ক'রে এখানে পড়েছিলো, তৃষাতুর মাটি তাকে চেটে খায়।

কোন্-সে শয়তান এই প্রান্তরকে এমন বিশাল ক'রে তৈরি করেছিলো? কোন্ কাজেই বা সে লাগবে, শুনি?

আমরা আবার হাঁটতে শুরু ক'রে দিয়েছি, বৃষ্টি দেখবো ব'লে আমরা থেমে পড়েছিলাম। বৃষ্টি পড়েনি। এখন আমরা আবার হাঁটতে শুরু ক'রে দিই। যতটা জমি হেঁটে পেরিয়েছি, তার চেয়েও বেশি হেঁটেছি ব'লে আমার মনে হয়। এমনিই, হঠাৎই মনে হয় আমার। যদি বৃষ্টি নামতো, তবে হয়তো আরো-সব বিষয় আমার মনে পড়তো। যা-ই হোক, আমি সেই ছেলেবেলা থেকে জানি কখনো এই প্রান্তরে আমি বৃষ্টি পড়তে দেখিনি—যাকে তুমি সত্যি-সত্যি বৃষ্টি বলতে পারো।

না, এই প্রান্তর কোনো কাজেই লাগে না। কোনো খরগোশ, কোনো পাখি নেই। কিছুই নেই। শুধু কতকগুলো শুঁটকো উইজাচে গাছ ছাড়া, আর এক-আধ টুকরো জমি দেখা যায় মাঝে-মাঝে যেখানে ঘাসের ফলা কুঁচকে গুটিয়ে গেছে; তা যদি না-থাকতো, তবে কিছুই থাকতো না এখানে।

আর এই-যে, আমরা এখন, এখানে। পায়দলে চারজন। আগে আমরা ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরুতাম, কাঁধে ঝোলাতাম রাইফেল। এখন আমরা রাইফেলও আর সঙ্গে নিই না।

আমি সবসময় ভেবেছি রাইফেলগুলো কেড়ে নেয়া ভালোই হয়েছে আসলে। এ-সব তল্লাটে সশস্ত্র হ'য়ে বেরুনো বিপজ্জনক। কোনো হুমকি-টুমকি ছাড়াই

তুমি খুন হ'য়ে যেতে পারো, যদি দেখা যায় তোমার কাঁধে বন্দুক ঝুলছে। তবে ঘোড়াগুলো অন্য ব্যাপার। আমরা যদি ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরুতাম তবে এতক্ষণে আমরা চাখতে পেতাম সবুজ নদীর জল, আর শহরের রাস্তায় ভরা-পেটে হেঁটে আমরা রাত্তিরের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম। যদি এখনো আমাদের ঐ ঘোড়াগুলো থাকতো, তবে আমরা তা-ই করতে পারতাম। কিন্তু ওরা রাইফেলগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াগুলোও কেড়ে নিয়ে গেছে।

আমি চারপাশে ঘুরে-ঘুরে তাকাই, প্রান্তরটাকে দেখি। এত জমি, অথচ কোনো কাজেই লাগে না। তোমার চোখ পিছলে-পিছলে স'রে যায় যখন কিছুই দেখার মতো পায় না। শুধু গুটিকয় গিরগিটি মাথা বার ক'রে উঁকি দেয় গর্ত থেকে, আর রোদ যখন পোড়াতে শুরু করে, চট ক'রে তারা পাথরের আড়ালে ছোট্ট ছায়ায় লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের যখন এখানে কাজ করতেই হবে, এই রোদের তাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কীই বা করবো আমরা?—কারণ ওরা আমাদের চাষ করার জন্যে শুধু এই পাথুরে পোড়ো জমিই দিয়েছে।

ওরা বলেছে: 'শহর থেকে এই অব্দি—সব জমি তোমাদের।'

আমরা জিগেশ করেছি: 'এই প্রান্তর?'

'হ্যাঁ, এই প্রান্তর এই মস্ত বিশাল প্রান্তর।'

আমরা মুখ খুলেছিলাম এই কথাই বলতে যে প্রান্তরটা আমরা চাই না, আমরা চাই নদীর পাশের জমি। নদী থেকে জলাভূমি পেরিয়ে যেখানে কাজু বাদামের গাছ গজিয়েছে, আর সবুজ মাঠ, আর ভালো জমি। এই শক্ত বলদের চামড়াটা নয়, যাকে ওরা বলে প্রান্তর।

কিন্তু ওরা আমাদের এ-সব কথা বলতেই দেয়নি। পদস্থ আমলাটি আমাদের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা করতে আসেনি। সে দলিলপত্তর আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে আর বলেছে: 'অত জমি শুধু নিজেদের ব'লে ভয় পেয়ো না—'

'কিন্তু, সেনিওর, প্রান্তরটা যে—'

'হাজার-হাজার জমির প্লট আছে এখানে।'

'কিন্তু জল নেই একফোঁটাও। এক ঢোঁকও জল নেই।'

'বর্ষাকাল তবে কী করতে আছে? কেউ তো তোমাদের কথা দেয়নি যে তোমরা সেচের জমি পাবে। বর্ষাকাল এলেই দেখবে ভুট্টা আর জনার

গজিয়েছে, যেন তোমরা মাটি থেকে টান দিয়ে বার ক'রে এনেছো।'

'কিন্তু, সেনিওর, জমি থেকে সব জল বেরিয়ে যায়। শক্ত জমি। আমাদের মনে হয় না এই প্রান্তরের জমিতে হাল দেয়া যাবে—পাথুরে ইটের ভাঁটির মতো জমি। কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে-খুঁড়ে তবেই বীজ বুনতে হবে, আর তখনও নিশ্চিত হওয়া যাবে না কিছু গজাবে কি না—ভুট্টা বা আর-কিছু গজাবে কি না!'

'তোমরা সেটা দরখাস্ত লিখে জানাতে পারো। এখন তোমরা যেতে পারো। তোমাদের বরং মস্ত-সব আসিয়েন্দার মালিকদের আক্রমণ করা উচিত—যে-সরকার তোমাদের জমি দিচ্ছে তাকে নয়।'

'সবুর করুন, সেনিওর। আমরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। বলেছি এই প্রান্তরের বিরুদ্ধে। কাজের কিছু যদি না-ই থাকে তবে আপনি কাজটা করবেনই বা কী ক'রে—আমরা শুধু এই দরবারটাই করতে চাচ্ছি। একটু সবুর ক'রে শুনুন আমরা কী বলতে চাচ্ছি। দেখুন, আমরা যেখানে আগে ছিলাম সেখান থেকেই শুরু—'

কিন্তু আমলাটি আমাদের কোনো কথাকেই আমল দেয়নি।

তো, ওরা আমাদের এই জমি দিয়েছে। আর এই জ্বলন্ত তাওয়ায় ওরা চায় আমরা যেন কিছু বুনি, শুধু এই দেখতেই যে কোনো শেকড়বাকড় গজায় কি না, শিষ বেরোয় কি না মাটি ফুঁড়ে। কিন্তু এ-মাটি থেকে কিছুই বেরুবে না। এমনকী কোনো গৃধিনীও না। তাদের তুমি ক্বচিৎ দেখতে পাও, খুব উঁচুতে, হুড়মুড় ক'রে উড়ে যাচ্ছে, এই কঠিন শাদা জমি থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে চাচ্ছে—এই জমি, যেখানে কিছুই নড়াচড়া করে না। যেখানে তুমি সারাক্ষণ এমনভাবে হাঁটো যেন এক পাও এগুতে পারছো না।

মেলিতোন বলে, 'এই জমি ওরা আমাদের দিয়েছে।'

ফাউস্তিনো শুধোয়, 'কী?'

আমি কিছুই বলি না। শুধু ভাবি, মেলিতোনের মাথার কলকব্জাগুলো ঠিকমতো আঁটা নেই। নিশ্চয়ই রোদের তাতই ওকে দিয়ে এভাবে কথা কওয়াচ্ছে—রোদের আঁচ নিশ্চয়ই টুপি ফুঁড়ে গিয়ে ওর মাথাটা তাতিয়ে দিয়েছে। আর তাই যদি না-হবে তো ও বলছে কেন এ কথা? ওরা

আমাদের কোন্ জমি দিয়েছে, মেলিতোন? এমনকী হাওয়াদের জন্যেও এখানে কিছু নেই যে ধুলোর মেঘ ওড়াবে।

মেলিতোন আবার বলে: 'একটা-কোনো কাজে লাগবে তো এই জমি—অন্তত একটা-কিছু করা যাবে, নিদেন ঘোড়া ছোটানো যাবে।'

'কোন্ ঘোড়া?' এস্তেবান ওকে শুধোয়।

আমি খুব-একটা খুঁটিয়ে দেখিনি এস্তেবানকে। এখন যখন ও কথা বললো, তখন আমি ওকে খেয়াল ক'রে দেখি। একটা কুর্তা প'রে আছে ও, ঝুলটা নাভি অব্দি নেমেছে, আর কুর্তার তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে মুরগির মাথার মতো কিছু-একটা।

হ্যাঁ, মুরগির মাথাই, এস্তেবান তার কুর্তার আড়ালে একটা মুরগি ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি তার ঢুলু-ঢুলু চোখ আর হাঁ-করা ঠোঁট দেখতে পাবে, যেন সেটা হাই তুলছে। আমি তাকে শুধোই: 'আরে, এস্তেবান, এ-মুরগিটাকে আবার কোত্থেকে বাগালে?'

'মুরগিটা আমার!' সে বলে।

'আগে তো ছিলো না। কোত্থেকে জোটালে, শুনি?'

'কিনিনি, আমার মুরগির খোঁয়াড় থেকে এনেছি।'

'তাহ'লে ওকে খাবে ব'লে এনেছো, তাই না?'

'না, ওর দেখাশুনো করবো ব'লে সঙ্গে এনেছি। কেউ বাড়ি নেই যে ওকে একমুঠো দানা দেবে; সেইজন্যেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। দূরে কোথাও গেলে সবসময় আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসি।'

'ওভাবে ঢাকা দিয়ে রাখলে দম আটকে মরবে যে। বরং বার ক'রে নিয়ে এসো হাওয়ায়।'

সে মুরগিটাকে বগলদাবা করে, মুখ দিয়ে তার গায়ে ফুঁ দেয়, গরম হাওয়া, তারপর বলে: 'আমরা টিলায় পৌঁছে যাচ্ছি।'

এস্তেবান কী বলে, আমি আর শুনতে পাই না। আমরা নয়ানজুলি থেকে নেমে যাবার জন্যে সার বেঁধেছি, সে আছে সবার আগে। মুরগিটার ঠ্যাং ধ'রে আছে সে, তাকে এদিক-ওদিক নড়াচ্ছে, যাতে পাথরে তার মাথা ঠুকে না-যায়।

যেই আমরা নামতে শুরু করি, জমি সারালো হ'য়ে ওঠে। ধুলোর একটা আস্তর ওড়ে আমাদের পা থেকে যেন আমরা একদঙ্গল খচ্চর নেমে আসছি। কিন্তু আমরা যে ধুলোয় ধূসর হ'য়ে যাচ্ছি, তা আমাদের ভালো লাগে। শক্ত

পাথুরে জমিতে এগারো ঘণ্টা ধ'রে ধুপধাপ ক'রে পা ফেলবার পর, আমরা সেই জিনিশে পা ঢাকা দিয়ে খুশি, যা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে আমাদের গায়ে, যার স্বাদ মাটির।

নদীর ঠিক ওপরে, কাজুবাদাম গাছগুলোর সবুজ ডগার ওপর, উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক সবুজ চাচালাকা। সেও আমাদের ভালো লাগে।

এখন আমরা শুনতে পাই কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, আমাদের কাছেই, কারণ শহর-থেকে-আসা হাওয়া নয়ানজুলিতে গমগম ক'রে প্রতিধ্বনি তোলে, তাকে ভ'রে তোলে তার সব শোরগোলে।

এস্তেবান গায়ে জড়িয়ে ধরে তার মুরগি যখন আমরা প্রথম বাড়িগুলোর কাছে পৌছুই। সে মুরগিটার পা খুলে দেয় যাতে মুরগিটা তার পায়ের অবশ ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে পারে, তার পর সে আর তার মুরগি উধাও হ'য়ে যায় কতগুলো তেপেমেস্কিতে গাছের আড়ালে।

'এখানেই আমি থামছি,' এস্তেবান আমাদের জানায়।

আমরা শহরের আরো ভেতরে ঢুকে পড়ি।

ওরা আমাদের যে-জমি দিয়েছে, তা প'ড়ে আছে পেছনে, দূরে।

তোর্‌রিকোরা—তারা এখন ম'রে গিয়েছে—ছিলো আমার জিগরি দোস্ত। সাপোৎলানে হয়তো লোকে তাদের পছন্দ করতো না, তবে আমার দিক থেকে আমি বলবো তারা চিরকালই আমার প্রাণের বন্ধু ছিলো, ঠিক ম'রে যাবার কিছুদিন আগে অব্দি। এই-যে কথাটা, যে সাপোৎলানে কেউ তাদের পছন্দ করতো না, এ-কথাটার কোনো মানে নেই, কারণ সেখানে আমাকেও কেউ পছন্দ করতো না, আর এটা আমি বুঝে গিয়েছি যে আমরা যারা পাহাড়ে থাকি, সাপোৎলানের লোকে সেই আমাদের কোনো-কিছুতেই কোনো পাত্তা-টাত্তা দিতো না। এই অবস্থাটা চ'লে এসেছে সেই কোন্ অতীত থেকে।

অন্যদিকে, পাতানো মায়ের পাহাড়েও তোর্‌রিকোরা কারু সঙ্গেই তেমন মানিয়ে চলতে পারেনি। সবসময় ঝগড়াঝাঁটি কিছু-না-কিছু লেগেই থাকতো। আর—আমি যদি অতিরঞ্জন না-ক'রে থাকি—তারা ওখানে ছিলো জমির মালিক, আর জমির ওপর যত ঘরবাড়ি আছে সে-সবেরও, এমনকী যখন সব জমি বিলিবন্দোবস্ত হ'য়ে গেলো, পুরো পাহাড়টায় আমরা যে-ষাটঘর ওখানে থাকতাম সব জমি আমাদের মধ্যে সমান-সমান ভাগ হ'য়ে গিয়েছিলো, আর তোর্‌রিকোরা পেয়েছিলো একটা মাগ্‌য়ুয়েই খেত সমেত একটুকরো জমি ; তবে সেখানে বেশির ভাগ বাড়িঘরই ছিলো ছড়ানো-ছিটোনো। তা সত্ত্বেও পাতানো মায়ের পাহাড় কিন্তু তোর্‌রিকোদেরই সম্পত্তি ছিলো। আমি যে চিলতে জমিটায় কাজ করতাম তারও মালিক ছিলো ওদিলোন আর রেমিহিয়ো তোর্‌রিকো, আর সেখান থেকে যে আঠারো-বিশটা সবুজ-সবুজ টিলা তুমি নিচে থেকে দেখতে পেতে, সেও ছিলো তাদেরই। কোনোকিছুই কাগজপত্তরে মিলিয়ে দেখার দরকার ছিলো না। সকলেই জানতো, পুরো বন্দোবস্তটা এভাবেই হয়েছিলো।

কিন্তু সেই থেকেই লোকে পাতানো মায়ের পাহাড় ছেড়ে চ'লে যেতে শুরু করেছিলো। মাঝে-মাঝেই ওখান থেকে কেউ-না-কেউ চ'লে যাচ্ছে—ঐ যেখানে উঁচু পাহারার জায়গাটা, সেখানে গোরুমোষের পাহারাটা পেরিয়ে

যায় তারা, মিলিয়ে যায় ওকগাছের বনে, এবং আর-কখনোই ফিরে আসে না। ছেড়ে চ'লে যায় তারা, বাস, এটাই হ'লো মোদ্দা কথা।

আর আমিও চ'লে যেতে পারলে খুবই খুশি হতাম। অন্তত এটাই দেখতে যে পাহাড়ের পেছনটায় কী-এমন আছে যা কাউকেই কোনোদিনও ফিরে আসতে দেয় না; তবে পাহাড়টা পছন্দ ছিলো আমার, আর, তাছাড়া, তোর্‌রিকোদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব ছিলো।

যে-চিলতে জমিটায় আমি প্রতিবছর অল্পস্বল্প ভুট্টা লাগাতাম, আর সীম-বরবটি, সেটা ছিলো খাড়াইয়ের দিকে, ঐ যেখানে ঢালটা নেমে গিয়েছে মস্ত এক বার্‌রান্‌কায় লোকে যাকে বলে যণ্ডামুণ্ড।

এমনিতে জায়গাটা তেমন খারাপ নয়, তবে বৃষ্টি শুরু হ'তে-না-হ'তেই জমিটা কেমন আঠালো আর চটচটে হ'য়ে যেতো, আর তাছাড়া জমির একটা বড়ো অংশই ছিলো কঠিন ধারালো পাথরে ভর্তি, গাছের গুঁড়ির মতো এক-একটা পাথর, দেখে মনে হয় যত দিন যায় ততই বড়ো হ'য়ে উঠছে। তবে ভুট্টা সেখানে ভালোই গজাতো, আর ভুট্টার কানগুলো ছিলো খুব মিষ্টি। তোর্‌রি-কোরা তো যা-কিছুই খেতো তাতেই নুন মাখিয়ে নিতো, কিন্তু যণ্ডামুণ্ডয় আমি যে-ভুট্টা ফলাতাম তার ছড়ায় কিন্তু তাদের কোনোদিনও একফোঁটাও নুন মাখাতে হয়নি; কখনোই তারা নুন চাইতো না বা মাখাবার কথাও বলতো না।

এত-সব সত্ত্বেও, যেমন, নিচের সবুজ টিলাগুলো যে সবার সেরা ছিলো, এটা জানা সত্ত্বেও, লোকে কিন্তু এখান থেকে চ'লেই যেতে থাকলো। সাপোৎলানে তারা যেতো না, যেতো অন্য দিকে, যেদিক থেকে হাওয়া আসে ওকের গন্ধ আর টিলাপাহাড়ের গুমগুম গর্জন নিয়ে। তারা কেটে পড়তো নিঃশব্দে, কাউকে কিছু না-ব'লেই, কারু সঙ্গে কোনো ঝগড়াবিবাদও না-ক'রে। তোর্‌রিকোরা এতদিন ধ'রে তাদের যেভাবে ভুগিয়েছে তার একটা বদলা নিতে চাইতো তারা নিশ্চয়ই, শোধ নেবার জন্যে ঝগড়া পাকাতেও চাইতো হয়তো, তবে তাদের কোনো সাহস ছিলো না। এই-তো ছিলো হালচাল।

তবু, তোর্‌রিকোরা ম'রে যাবার পরেও, কেউ আর এখানে ফিরে আসেনি। আমি তাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসেছিলাম। কিন্তু না, কেউই ফিরে আসেনি। গোড়ায়, আমি তাদের বাড়িঘরগুলোর দেখাশুনো করতাম; ছাতগুলো সারাতাম, গাছের ডাল লাগিয়ে দেয়ালের গর্তগুলো বুজিয়ে দিতাম; তবে যখন বুঝতে পারলাম যে তারা কেউই আর ফিরে আসছে না, আমি

এ সব ফালতু কাজে ইতি টেনে দিলাম। সবসময়েই যা নিশ্চিতভাবে আসতো, তা হ'লো বছরের ঠিক মাঝটায় মুষলধারে বৃষ্টি, আর সেই প্রবল হাওয়া যা তুখোড় ব'য়ে যেতো ফেব্রুয়ারিতে আর ছিনিয়ে নিয়ে যেতো তোমার সারাপে [কম্বল]। কখনো-কখনো কাকেরাও খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসতো, জোর গলায় কা-কা-কা-কা ক'রে ডাকতে-ডাকতে, যেন তারা টের পেয়ে যেতো যে তারা কোনো পরিত্যক্ত নির্জন পোড়ো জায়গায় এসে পৌঁছেছে।

তো তোর্‌রিকোরা ম'রে যাবার পরেও এইভাবেই চলছিলো গোটা ব্যাপারটা।

এখান থেকে, এই যেখানে এখন আমি ব'সে আছি, এককালে তুমি স্পষ্ট দেখতে পেতে সাপোৎলান। কি দিন, কি বা রাত্তির, যে-কোনো সময় এলেই দেখতে পেতে ছোট্ট শাদা ফুটকিটা, যা আসলে সাপোৎলান, অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখন হারিইয়াগুলো গজিয়েছে সত্যি ঘন হ'য়ে, আর যতই না হাওয়া এসে তাদের এ-ধার থেকে ও-ধার নড়াক, তাদের ভেদ ক'রে তুমি আর কিছুই দেখতে পাবে না।

আমার মনে আছে, তোর্‌রিকোরাও কীভাবে এখানে আসতো, উবু হ'য়ে ব'সে থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অন্ধকার না-হওয়া অব্দি, একটুও ক্লান্ত না-হ'য়ে, সরাসরি নিচের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকতো, যেন এ-জায়গাটা তাদের সব ভাবনাচিন্তাকে খেপিয়ে দিয়েছে, কিংবা যেন উশকেই তুলেছে তাদের সাপোৎলানে গিয়ে আউশ মিটিয়ে ফূর্তিফার্তা ক'রে আসতে। শুধু পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তারা 'মোটেই এ-সব কথা ভাবতো না। তারা শুধু তাকিয়ে থাকতো রাস্তার দিকে - সেই চওড়া বালিভরা পায়েচলার পথটার দিকে, যেটাকে তুমি চোখেই দেখতে পেতে কোথায় শুরু হয়েছে, আর কোথায় কখন অর্ধচন্দ্রটিলার পাইন বনে সে-পথ মিলিয়ে গেছে।

রেমিহিয়ো তোর্‌রিকো যতটা দূর অব্দি দেখতে পেতো, আর কারু চোখ অদ্দুর যেতো ব'লে আমি কোনোদিনও জানিনি। কিন্তু আধোবোজা কালো চোখটা—তার ভালো চোখটা—মনে হ'তো সবকিছু এত কাছে নিয়ে আসতো যেন একেবারে তার হাতের মুঠোয়। ফলে রাস্তায় ও-সব কী ন'ড়ে বেড়াচ্ছে সে-সব বুঝতে তার মোটেই অসুবিধে হ'তো না। আর যখন তার চোখ এমন-কিছুর ওপর পড়তো যা তাকে খুশি ক'রে তুলতো, দুজনে তারা ভাখচৌকি থেকে উঠে কিছুক্ষণের জন্যে পাতানো মায়ের পাহাড়ে উধাও হ'য়ে যেতো।

সেই হ'লো গিয়ে কাল, যখন সবকিছু বদলে গেলো এখানে। লোকে তাদের জীবজন্তু বার ক'রে নিয়ে এলো পাহাড়ের গুহা থেকে আর তাদের বেঁধে রাখলে খোঁয়াড়ে। তখনই আমরা দেখতে পেলাম তাদের ভেড়া আর তুর্কিমোরগ আছে। আর এও দেখা সহজ ছিলো রোজ সকালে পাতিওয় শুকোচ্ছে গাদা-গাদা দানাফসল আর হলদে স্কোয়াশ। পাহাড়ের ওপর দিয়ে যে-হাওয়া চ'লে যেতো, সে ছিলো অন্যান্যবারের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা, কিন্তু কেউ জানেনি কেন—সকলেই শুধু বলছিলো চমৎকার আবহাওয়া। আর ভোরবেলায় তুমি শুনতে পেতে মোরগগুলো ডেকে উঠছে কোঁকরকো, যেমন তারা ডাকে যে-কোনো শান্তিসুখে ভরা গাঁয়ে, আর তোমার মনে হ'তো পাতানো মায়ের পাহাড়ে চিরকালই যেন শান্তি ছিলো।

সেই সময়েই একদিন তোর্‌রিকোরা ফিরে এলো। তারা এসে পৌঁছুবার আগেই তুমি টের পেয়ে যেতে যে তারা আসছে, কারণ তাদের কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডাকতে-ডাকতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে সারাটা পথ ছুটে যেতো। আর ঐ ঘেউ-ঘেউ শুনেই প্রত্যেকে মনে-মনে হিশেব ক'রে নিতো দূরত্ব কতটা আর কোনদিক থেকেই বা তারা আসছে। আর তখনই সবাই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে পড়তো যার যা সম্পত্তি সব লুকিয়ে ফেলতে।

যতবারই তোর্‌রিকোরা পাতানো মায়ের পাহাড়ে ফিরে আসতো ততবারই তারা সবখানে এইরকম আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতো।

তবে আমি কিন্তু তাদের কখনো ভয় পাইনি। ওদের দুজনের সাথেই আমার ভারি ভাব ছিলো, আর মাঝে-মাঝে এই ইচ্ছেটাও আমার মধ্যে চাগিয়ে উঠতো যে ঈশ আমি যদি এত বুড়ো না-হতাম তবে আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতাম, সে ওরা যে-ধান্ধাই করুক না কেন। কিন্তু কোনোকিছুর জন্যেই তো আমি আর কাজে লাগবার মতো অবস্থায় ছিলাম না। যে-রাত্তিরে আমি এক খচ্চরের গাড়ির গাড়োয়ানের সব মালপত্র লুঠ করতে ওদের সাহায্য করেছিলাম, তখনই আমি আমার শরীরের হাল হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে গিয়েছিলাম। তখনই আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম যে সে-তাকৎ আর আমার নেই—আমার মধ্যে যে-জানটা আছে তাকে আমি এর মধ্যেই প্রায় বাজেখরচ ক'রে উড়িয়ে দিয়েছি, এখন আর কোনো ঝক্কিঝামেলা পোষায় না, ঝুটঝামেলা সয় না। আমি বুঝে গিয়েছিলাম সত্যটা।

সে নিশ্চয়ই বর্ষার মরশুমের মাঝামাঝি হবে, যখন তোর্‌রিকোরা আমায়

ডেকে পাঠালে: বস্তা-বস্তা চিনি নিয়ে আসবার জন্যে ওদের সঙ্গে হাত লাগাতে। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। একে তো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে—সেইসব ঝড়তুফানের একটা, যখন মনে হয় অঝোর জল তোমার পায়ের তলা থেকে হ্যাঁচকা ছিনিয়ে নিচ্ছে মাটি। তাছাড়া, কোথায় যে যাচ্ছি তাও ছাই জানি না। সে যাই হোক, আমি বুঝে গেলাম যে এ-রকম রগরগে ব্যাপারে বেরুবার মতো তাকৎ আর আমার নেই।

তোর্‌রিকোরা আমায় বলেছিলো ওরা যেখানে যাচ্ছে, সে-জায়গাটা খুব-একটা দূরে নয়। 'মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা ওখানে পৌঁছে যাবো,' ওরা আমায় বলেছিলো। কিন্তু যখন আমরা অর্ধচন্দ্রটিলার রাস্তায় পৌঁছুলাম, তখন অন্ধকার নেমে পড়তে শুরু করেছে, আর খচ্চরের গাড়ির গাড়োয়ান যেখানটায় ছিলো সেখানে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে বেশ রাতই হ'য়ে গিয়েছিলো।

কে আসছে, কারা আসছে—সে দেখবার জন্যে খচ্চরওলা উঠেও আসেনি। সন্দেহ নেই সে তোর্‌রিকোদের জন্যে ঘাপটি মেরেই ছিলো, আর সেইজন্যেই আমাদের দেখে সে মোটেই অবাক হয়নি। অন্তত আমি তা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু যতক্ষণ ধ'রে চিনির বস্তাগুলো তুলে-তুলে নিয়ে আমরা রেখে আসছিলাম, খচ্চরওলা চুপ ক'রে ছিলো, শান্ত, চিৎপাত পড়েছিলো ঘাসের ওপর। তখন আমি তোর্‌রিকোদের সে-কথা ব'লেও ছিলাম, ওদের বলেছিলাম: 'ঐ যে লোকটা চিৎপাত প'ড়ে আছে মনে হচ্ছে ম'রে-ট'রেই গেছে বুঝি।'

'না-না, বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, তা-ই হবে,' ওরা আমায় বলেছিলো, 'আমরা ওকে চারপাশে নজর রাখবার জন্যে এখানে রেখে গিয়েছিলাম, কিন্তু ও নিশ্চয়ই ব'সে-ব'সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আমি গিয়ে লোকটার পাঁজরে একটা লাথি ঝাড়লাম যাতে সে জেগে ওঠে, কিন্তু সে নড়লোই না একফোঁটা।

'পুরোপুরি টেঁশে গিয়েছে', আবার আমি ওদের বললাম।

'না-না, ও-সব বিশ্বাস কোরো না। বোধহয় একটু ঘোরের মধ্যে আছে কারণ ওদিলোন একটা লাঠির বাড়ি মেরেছিলো ওর মাথায়। পরে ঠিক উঠে পড়বে, দেখো তুমি; রোদ উঠলেই, যখন একটু গরম লাগবে ও ঠিক উঠে পড়বে—সোজা বাড়ি চ'লে যাবে। ঐ বস্তাটা তোলো দেখি—চলো, যাওয়া যাক।' রেমিহিয়ো শুধু এই কথাই বললে আমাকে।

শেষটায় মড়াটাকে আমি একটা শেষ লাথি ঝাড়লাম, আর আওয়াজ শুনে

মনে হ'লো আমি যেন একটা শুকনো গাছের গুঁড়িতে লাথি কষিয়েছি। তারপর কাঁধে বোঝাটা তুলে নিয়ে আমি সোজা সামনের পথ ধরলাম। তোর্‌রিকোরা এলো আমার পেছন-পেছন। অনেকক্ষণ ধ'রে ওদের গান গাইতে শুনলাম আমি, একেবারে দিন ফোটা অব্দি। যখন আলো ফুটলো তখন আর ওদের শুনতে পেলাম না। ভোরের আগটায় যে-হাওয়া বয় সে তাদের গলাফাটানো গানকে ব'য়ে নিয়ে চ'লে গিয়েছে – আর এখনও ওরা আমার পেছন-পেছন আসছে:কি না সেটা বোঝবারই জো ছিলো না – যতক্ষণ-না আমি চারপাশে ওদের কুকুরগুলোর ঘেউ-ঘেউ শুনতে পেলাম।

এইভাবেই আমি জেনে গেলাম সে-কার খোঁজে, কীসের খোঁজে তোর্‌রিকোরা রোজ বিকেলে এসে উদয় হয়, যখন তারা এসে আমার বাড়ির পাশে ঠায় ব'সে থাকে পাতানো মায়ের পাহাড়ে।

...

আমি রেমিহিয়ো তোর্‌রিকোকে খুন করেছিলাম।

সে তখন যখন এখানকার র‍্যান্‌চগুলোয় মাত্র অল্পকিছু লোক ছিলো। গোড়ার দিকে তারা এক-এক ক'রে র‍্যান্‌চ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিলো, কিন্তু শেষের দিকে যারা ছিলো তারা প্রায় পড়ি-মরি ক'রে দলে-দলে ছুটেছিলো। কিছু টাকা কামাতো, তারপর যখন প্রথম তুষার এসে হাজির হ'তো তারা এখান থেকে চ'লে যেতো। আগেকার বছরগুলোয় ঝুরিতুষার এসে একরাত্তিরেই সব ফসল নষ্ট ক'রে দিয়ে যেতো। এই বছরও তা-ই হয়েছিলো। পরের বছরও যে এমনই ঘটবে সে-বিষয়ে তাদের আর সন্দেহ ছিলো না, আর আমার অনুমান একদিকে ভীষণ তোর্‌রিকোদের সঙ্গে সবসময়, আর এই ভীষণ আবহাওয়ার সঙ্গে প্রতি বছর, মানিয়ে চলবার কোনো উৎসাহই খুঁজে পাচ্ছিলো না।

কাজেই আমি যখন রেমিহিও তোর্‌রিকোকে খুন করেছিলাম তখন পাতানো মায়ের পাহাড় বা আশপাশের অন্য টিলাগুলোয় লোকজন কেউ ছিলোই না।

এই ঘটনাটা ঘটেছিলো অক্টোবর নাগাদ। আমার মনে আছে, সত্যি একটা মস্ত চাঁদ ছিলো আকাশে, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সবকিছু ভেসে যাচ্ছিলো, কারণ ঐ ধবধবে জ্যোৎস্নার আলোয় আমি আমার বাড়ির সামনে ব'সে-ব'সে একটা ছেঁড়া বস্তা শেলাই করছিলাম, বস্তাটার গায়ে অনেকগুলো ফুটো হ'য়ে গিয়েছিলো। এমন সময় তোর্‌রিকো এসে হাজির হ'লো।

মাতাল ছিলো নিশ্চয়ই। সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, ট'লে একবার ওদিকে পড়ে একবার এদিকে, যে-চাঁদের আলোয় আমি কাজ করছিলাম তাকে একেবারে আটকে দিলে।

'চুপি-চুপি চোরের মতো কিছু করা ঠিক না,' কিছুক্ষণ পরে সে আমায় বললে। 'আমি সোজাসুজি কাজকারবার করা পছন্দ করি। আর তুমি যদি তা না-করো, তবে তোমার পক্ষেই সেটা বিষম খারাপ, কারণ আমি এখানে এসেছি সব সিধে ক'রে দেবার জন্যে।'

আমি আমার ছালাটা শেলাই ক'রেই চললাম। ফুটোগুলো রিফু করার দিকেই সব মনোযোগ দিচ্ছিলাম, আর জিন শেলাই করার বড়ো ছুঁচটা খুবই ভালো কাজ করছিলো, বিশেষত তার ওপর যখন চাঁদের আলো পড়ছিলো। সেইজন্যেই তার নিশ্চয়ই ধারণা হচ্ছিলো যে আমি তার কথায় কোনো কান দিচ্ছি না।

'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি,' চেঁচিয়ে সে বলেছিলো আমায়, এবার একেবারে সত্যি খেপে গিয়েছে। 'তুমি বদমাশ ভালোই জানো কেন আমি এখানে এসেছি।'

যখন সে কাছে এসে প্রায় আমার মুখের ওপর চ্যাঁচালে, তখন আমি একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তার মুখটা দেখতে চাচ্ছিলাম, সঠিক জানতে চাচ্ছিলাম সে কতটা খেপে গিয়েছে, আর আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই রইলাম যেন সে কেন এসেছে, এই প্রশ্নটাই জিগেশ করছি।

তার একটু ফল হ'লো। এখন একটু শান্ত হ'য়ে সে মনের কথাটি ফাঁস ক'রে দিলে: যখন আমরা আর ততটা সজাগ নই শুধু তখনই নাকি আমাদের মতো লোকজনদের সঙ্গে কাজকারবার করতে হয়।

'আমার মুখ শুকিয়ে যায় তোমার সঙ্গে কথা বললে – তুমি যা করেছো তার কথা ভাবলেই মাথাটা কেমন করে,' সে আমায় বললে, 'তবে আমার ভাইটাও তোমারই মতো আমার দোস্ত ছিল, আর সেই জন্যেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, দেখতে এসেছি ওদিলোনের মৃত্যুটা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাও।'

এবার আমি খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে তার কথা শুনছিলাম। ছালাটা আমার একপাশে প'ড়ে আছে, আর, কিছু না-ক'রে, আমি শুধু তার কথাই শুনছি।

বুঝতে পারলাম কেন যেন সে তার ভাইয়ের খুন হওয়াটার জন্যে আমাকেই

দায়ী করছে। খুনটা কে করেছিলো তা আমার মনে ছিলো, হয়তো আমি তাকে তা ব'লেও দিতাম, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'লো সে আমায় কিছুই খুলে বলতে দেবে না।

'ওদিলোন আর আমি প্রচুর ঝগড়া-মারামারি করেছি', সে ব'লেই চললো। 'মাথাটা একটু ঢিলে ছিলো, সবকিছুই বুঝতে-শুঝতে ওর সময় লাগতো—কিন্তু ঐ পর্যন্তই ছিলো তার দৌড়। কয়েকটা কিল-ঘুষি খাবার পর ও শান্ত হ'য়ে যেতো। আর সেটাই আমি জানতে চাচ্ছি: ও কি তোমায় কিছু বলেছিলো, না কি তোমার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিলো—কিংবা সত্যি-সত্যি কী ঘটেছিলো, সেটাই বলো। হয়তো ও তোমাকে মারতে চেয়েছিলো আর তুমি ওকে, ও নিজে কিছু ক'রে বসবার আগেই, এক হাত নিয়েছো। ও-রকম কিছু-একটা ঘ'টে থাকবে নিশ্চয়ই।'

আমি মাথা নেড়ে তাকে বলতে চাইলাম পুরো ব্যাপারটার সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

'শোনো,' তোব্রিকো আমায় বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলে। 'ওদিলোনের জামার পকেটে সেদিন চোদ্দটা পেসো ছিলো। ওকে তুলে ধ'রে আমি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেছি—সেই চোদ্দ পেসো আমি আর খুঁজে পাইনি। তারপর কাল আমি জানতে পেলাম যে তুমি একটা কম্বল কিনেছো।'

তা সত্যি। নিজের জন্যে আমি একটা কম্বল কিনেছি। দেখতে পাচ্ছিলাম তো কী-রকম হুড়মুড় ক'রে শীত আসছে, আর যে-ওভারকোটটা আমার ছিলো সে তো ছিঁড়ে-খুঁড়ে ন্যাকড়া হ'য়ে গিয়েছে; সেইজন্যেই আমি একটা কম্বল কিনতে সাপোৎলানে গিয়েছিলাম। তবে সেটা করবার জন্যে আমার সবেধন যে-দুটি ছাগল ছিলো সে-দুটি বিক্রি ক'রে দিতে হয়েছিলো, ওদিলোনের প'ড়ে-পাওয়া চোদ্দ পেসো দিয়ে আমি কম্বল কিনিনি। সে তো দেখতেই পাচ্ছে বস্তাটার কেমন ফুটো-ফুটো হ'য়ে গিয়েছে, কারণ ছোট্ট ছাগলছানাটাকে আমায় বস্তায় বেঁধে নিয়ে যেতে হয়েছিলো—কেননা এখনো সে ভালো ক'রে হাঁটতেই শেখেনি যে তাল রেখে আমাদের সঙ্গে চলতে পারবে।

'তোমার জানা উচিত, এই শেষবারের মতো, ওরা ওদিলোনকে যা করেছে তার বদলা তার শোধ আমি নেবোই নেবো—তা সে যে-ই ওকে খুন ক'রে থাকুক। আর আমি জানি কে খুন করেছে।' ঠিক আমার মাথার ওপরটায় তাকে একটা শাসানি দিতে শুনলাম।

'অর্থাৎ তার মানে আমি?' আমি ওকে জিগেশ করেছিলাম।

'তাছাড়া আর কে? ওদিলোন আর আমি গুণ্ডা বাঁটপাড় ডাকাত—যা তোমার ইচ্ছে সেই নামেই আমাদের ডাকতে পারো—আর এও বলবো না যে আমরা কাউকেই খুন করিনি—তবে মাত্র এ-ক-টা পেসোর জন্যে আমরা কাউকে জবাই করিনি। সেই কথাটাই তোমায় আমি জানাচ্ছি।'

খোঁয়াড়ের ওপরে, সবখানে, অক্টোবরের মস্ত চাঁদ ঝলমল করছে, রেমিহিয়োর ছায়াটাকে আমার ঘরের দেয়ালে ফেলেছে। দেখলাম কে হর্থর্ন গাছের দিকে গিয়ে, আমি যেখানে আমার মাশেতেটা রাখি, সেটা তুলে নিলে। তারপর আমি তাকে দেখলাম হাতে মাশেতেটা নিয়ে সে আমার দিকে আসছে।

কিন্তু সে যখন আমার সামনে থেকে স'রে গিয়েছিলো, আমি যে মস্ত ছুঁচটা বস্তায় বিঁধে রেখেছিলাম, তার ওপর জ্যোৎস্না ঝকমক করছিলো। আর আমি আজও জানি না কেন, তবে হঠাৎ যেন ঐ ছুঁচটার ওপর আমার অগাধ আস্থা গজাতে শুরু ক'রে দিলো। সেইজন্যেই রেমিহিয়ো তোরিকো যখন আমার পাশে এসে পৌঁছুলো, আমি ছুঁচটা টেনে বার ক'রে নিয়ে কোনোকিছুর জন্যে অপেক্ষা না-ক'রেই তার নাভির কাছে বসিয়ে দিলাম। যদ্দুর যেতে পারে, ঢুকিয়ে দিলাম ছুঁচটা। আর সেখানেই সেটাকে আটকে থাকতে দিলাম।

তক্ষুনি সে এঁকেবেঁকে দুমড়ে গেলো, পেটে আচমকা টান ধরলে যে-রকম তুমি করো, আর সে দুমড়ে যেতেই লাগলো, শেষটায় হাঁটু ভেঙে প'ড়ে গেলো, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ব'সে পড়লো মাটিতে, দুর্বল, টলোমলো, পায়ে কোনো জোর নেই, তার একটা চোখে থিকথিক করছে ভয়।

মুহূর্তের জন্যে মনে হ'লো সে বুঝি সোজা হ'য়ে মাশেতেটা দিয়ে আমায় একটা কোপ মারবে; তবে অনুমান করি মতটা সে তক্ষুনি পালটেছিলো—কিংবা কী যে করা উচিত তা-ই হয়তো ভেবে পায়নি, কারণ মাশেতেটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে পেটটা চেপে ধ'রে সে দুমড়ে-দুমড়ে যেতে লাগলো। বাস, এই সব।

তারপর আমি দেখলাম কী-রকম বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওকে, অসুস্থ, যেন বমি ক'রে সব ভাসিয়ে দেবে। সে অনেকদিন পরে আমি অমনতর কোনো বিষণ্ণ চেহারা দেখলাম কারু, ওর জন্যে আমার ভারি কষ্ট হ'লো। সেই জন্যেই তার পেট থেকে ছুঁচটা আমি টেনে বার ক'রে নিলাম, আর আরেকটু ওপরে বসিয়ে দিলাম, যেখানে আমার মনে হ'লো তার ধুকধুকিটা আছে। আর

হ্যাঁ, ওখানেই ছিলো ধুকধুকিটা, কারণ ও শুধু দু-একটা ঝাঁকুনি দিলে, ছটফট করলে, মুরগির মুণ্ডুটা উড়িয়ে দিলে যেমন হয়, তারপরেই স্থির হ'য়ে গেলো।

সে নিশ্চয়ই ম'রে গিয়েছিলো তখন, যখন আমি তাকে বলেছিলাম, 'দ্যাখো, রেমিহিয়ো, আমাকে তোমায় মাফ করতে হবে, তবে এটা জেনো ওদিলোনকে আমি খুন করিনি। করেছিলো আলকারাসেস। ও যখন মরে, আমি তখন ওখানে ছিলাম। কিন্তু আমার খুব ভালোই মনে পড়ে আমি ওকে খুন করিনি। পুরো আলকারাস পরিবারটাই ওকে সাবাড় করেছিলো। সবাই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তার ওপর, আর যখন আমি বুঝতে পারলাম কী ব্যাপার হচ্ছে, ওদিলোন ততক্ষণে ম'রেই যাচ্ছে। আর, তুমি জানো, কেন? এক, কারণ সাপোৎলানে যাওয়া উচিত হয়নি ওদিলোনের। তুমি সেটা জানো। একদিন-না-একদিন ঐ শহরে কিছু-একটা হ'য়েই যেতো ওর—যেখানে ওর সম্বন্ধে যত পুরোনো কাহন মনে ক'রে রাখার বিস্তর কারণ আছে বিস্তর লোকের। আর আলকারাসেসও ওকে ঠিক ভালোবাসতো না। আমার চেয়ে তুমি তো আর ভালো ক'রে জানো না সেখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে ও কেন অত মাখামাখি করেছিলো।

'সব ঘটেছিলো অতর্কিতে। আমি সবে তখন আমার সারাপেটা কিনেছি আর দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় তোমার ভাই আলকারা-সেসদের একজনের মুখে থুথু ক'রে একমুখ মেস্কাল ছিটিয়ে দিয়েছিলো। শুধু মজা করবার জন্যেই থু-থু দিয়েছিলো। থাকলে দেখতেই পেতে যে নিছক মজা করবার জন্যেই সে ও-রকম করেছিলো, কারণ সবাইকেই বেজায় হাসিয়ে দিয়েছিলো, জবর। তবে ওরা সবাই ছিলো মাতাল—ওদিলোন, আলকারা-সেসরা, সকলেই—আর হঠাৎ তারা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, আচমকা। আর অন্যরা ছুরিগুলো বার ক'রে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলো ওর দিকে, একটার পর একটা ছুরির কোপ বসিয়েছিলো, যতক্ষণ ওর মধ্যে একফোঁটা জীবন ছিলো। এইভাবেই ও মরেছিলো।

'কাজেই বুঝতেই তো পারছো যে বা যারা ওকে খুন করেছিলো, সে আমি নই। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গেই যে আমার কোনো সম্বন্ধ ছিলো না—এটা তুমি জানলে আমার ভালো লাগবে।'

এই কথাই আমি বলেছিলাম মরা রেমিহিয়োকে।

ততক্ষণে চাঁদ ঢ'লে পড়েছে ওকগাছগুলোর অন্যপাশে, যখন আমি পাতানো

মায়ের পাহাড়ে আমার ফাঁকা বাজারের ঝুড়িটা নিয়ে ফিরে এলাম। তবে গোড়ায় আমি কয়েকবার সেটাকে চুবিয়ে ছিলাম ঝরনার জলে, রক্তের দাগ ধুয়ে দেবার জন্যে। ঝুড়িটা আমার এক্ষুনি কাজে লাগবে – আর আমি প্রতিবার সেটার গায়ে রেমিহিয়োর রক্ত দেখতে চাই না।

আমার মনে পড়ে, ঘটনাটা ঘটেছিলো অক্টোবর নাগাদ, সাপোৎলানের ফিয়েস্তার মচ্ছবের সময়। আর এই-যে বলছি আমার মনে পড়ে ঐ সময়েই ঘটনাটা ঘটেছিলো তার কারণ সাপোৎলানে ওরা তখন হাউই পটকা আতশ-বাজি পোড়াচ্ছিলো – আর যখনই কোনো হাউই সেদিকটায় গিয়ে পড়ছিলো যেখানে আমি রেমিহিয়োকে ফেলে রেখে এসেছি, চিলশকুনের একটা বড়ো ঝাঁক উঠে আসছিলো আকাশে।

এইই আমার মনে আছে।

আমরা ভারি গরিব

এখানে সবকিছুই খারাপ থেকে আরো-খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। গত হপ্তায় আমার হাসিস্তা খুড়ি গেলেন, আর শনিবারে, যখন তাঁকে কবর দেয়া হ'য়ে গেছে আর আমরা মনখারাপ কাটিয়ে উঠেছি, এমন তুমুল বর্ষা শুরু হ'লো তেমনটি আর-কখনও হয়নি। সেটা আমার বাবাকে পুরোপুরি খেপিয়ে দিলে, কারণ রাইশস্যের পুরো ফসলটাই ছিলো বাইরে গাদা ক'রে-রাখা, রোদে শুকোচ্ছিলো। আর মেঘ ফেটে পড়লো এমনি আচমকা ইয়া বড়ো-বড়ো সব ফোঁটায় যে হাতে-হাতে আমরা যে একমুঠো ক'রে তুলে নেবো তারও ফুরসৎ দিলে না; আমাদের বাড়ির মধ্যেটায় আমরা শুধু ছাতের তলায় সবাই মিলে কুঁকড়ে-মুকড়ে ব'সে-থাকা ছাড়া আর-কিছুই করতে পারলাম না, শুধু হা ক'রে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলাম আকাশ থেকে অঝোর-ঝরা ঠাণ্ডা জল কেমন ক'রে সদ্য-তুলে-আনা রাইশস্যের সর্বনাশ ক'রে দিলে।

আর এই-তো, কালকেই, যখন আমার বোন তাচা—এই সেদিন সে বারোয় পড়েছে—আর আমি, আমরা আবিষ্কার করলাম তার জন্মদিনে বাবা তাকে যে-গাইটা দিয়েছিলো সে নদীর বানে ভেসে গিয়েছে।

নদী ফুলতে শুরু করেছিলো তিন রাত্তির আগে, ভোর নাগাদ। আমি ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু নদী এমন হল্লা তুলেছিলো যে দুম ক'রে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, লাফিয়ে উঠে আমি কম্বলটা আঁকড়ে ধরি যেন আমাদের বাড়ির ছাতটাই ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, কারণ নদীর শব্দ চিনতে পেরেছিলাম আমি, আর সে-শব্দ চললো তো চললোই যতক্ষণ-না আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে দেখি সকালটা কালো-কালো মেঘে ছাওয়া আর মনে হ'লো একবারও না-থেমে সারাক্ষণই বৃষ্টি পড়েছে। নদী যে-হল্লা তুলেছিলো সেটা ক্রমেই জোরালো হ'য়ে কাছে এগুতে লাগলো। তুমি তার গন্ধটাও পেতে যেমন তুমি গন্ধ পাও আগুনের, কিংবা বদ্ধ ঘোলাজলের পচা গন্ধ।

আমি যখন দেখতে গেলাম নদী ততক্ষণে তীর ছাপিয়ে উঠে এসেছে।

বড়ো রাস্তাটা ধ'রে আস্তে উঠে আসছে আর ঐ যে-মেয়েটাকে ওরা বলে লা তাম্বোরা তার বাড়ির দিকে ধেয়ে চলেছে। তার বাড়ির উঠোনে যখন ঢুকলো তখন জলের ঘর্ঘরটা অব্দি শুনতে পেতে তুমি, বিশেষত যখন দরজা পেরিয়ে বড়ো-বড়ো ধারায় ছুটে বেরিয়ে এলো। লা তাম্বোরা ছুটে ঘর-বার করতে লাগলো—এর মধ্যেই নদী যা হ'য়ে গেছে তার মধ্যেই ছপ-ছপ করতে-করতে তার মুরগিগুলোকে তাড়া দিয়ে ছুটিয়ে সোজা বার ক'রে দিলে রাস্তায়, যাতে তারা গিয়ে এমন-কোথাও গা-ঢাকা দিতে পারে টান যেখানে ওদের ছুঁতে পারবে না।

অন্যদিকে, যেখানে বাঁকটা ছিলো, নদী নিশ্চয়ই তুলে নিয়ে গেছে কে জানে কখন --আমার হাসিন্তা খুড়ির উঠোনের তেঁতুল গাছটা, কারণ এখন আর কোনো তেঁতুল গাছই তোমার চোখে পড়বে না। সারা গাঁয়ে এটাই ছিলো সবেধন একখানি তেঁতুল গাছ, আর তাই দেখেই লোকে বুঝতে পারলে যে নদীতে যতবার বান ডেকেছে তার মধ্যে এই বানটাই সবচেয়ে বড়ো।

আমার বোন আর আমি বিকেলবেলায় জলের পাহাড় দেখতে ফিরে গিয়েছিলাম: সবখানে জল থৈ-থৈ করছে, আরো ঘন জল, ঘন আর কালো, যেখানে সাঁকোটা থাকার কথা ছিলো তারও অনেক ওপরে উঠে এসেছে, এখন, আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম, হা ক'রে তাকিয়ে, একটুও ক্লান্ত লাগলো না। তারপর আমরা নয়ানজুলি বেয়ে উঠে এলাম কারণ আমরা জানতে চাচ্ছিলাম লোকে কী বলাবলি করছে, কেননা নিচে, নদীর পাশে, কেবল একটা গুমগুম আওয়াজ হচ্ছিলো, আর তুমি তখন দেখতে পেতে যে অনেক মুখ কেবল হা হচ্ছে আর বন্ধ হচ্ছে যেন তারা কিছু বলতে চাচ্ছে অথচ কিছুই তুমি শুনতে পাচ্ছো না। সেই জন্যেই আমরা নয়ানজুলি বেয়ে উঠে এলাম, যেখানে অন্য-সব লোকজন নদীর দিকে তাকিয়ে দেখছে আর বলাবলি করছে বানটা কত ক্ষতি করলো। সেইখানেই তো আমরা জানতে পেলাম নদী লা সের্পেন্তিনাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে, ঐ যে গাভীন গোরুটা আমার বোন তাচা পেয়েছিলো বাবার কাছ থেকে তার বারো বছরের জন্মদিনে, গোরুটার একটা কান শাদা, অন্যটা লালচে, আর কী-সুন্দর চোখ!

আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না লা সের্পেন্তিনার মাথায় কেন এই খেয়ালটা চেপেছিলো যে নদী পেরিয়ে ওপারে যাবে যখন সে জানতোই তো এ আর সেই একই নদী নেই যাকে সে রোজ দেখেছে। লা সের্পেন্তিনা

কখনোই এমনতর উদোম খেয়ালের শিকার ছিলো না। সম্ভবত যা ঘটেছিলো তা এই : নিজেকে সে যে ওভাবে ডুবে যেতে দিয়েছে তাতে মনে হয় সে নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কতবারই তো আমাকে ওকে গোয়ালঘরের দরজা খুলে দেবার জন্যে জাগাতে হয়েছে, কারণ না-যদি জাগাতাম তবে সারাদিন ধ'রেই ও হয়তো চোখ বুজেই সেখানে থেকে যেতো, সত্যি শান্ত, আর ঘন-ঘন শ্বাস ফেলতো, যেমনটা তুমি শুনতে পাও ঘুমের ঘোরে গোরুরা কেমন শ্বাস ফ্যালে।

নিশ্চয়ই তাহ'লে ও ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তাই হবে। হয়তো যখন জেগে উঠেছিলো ততক্ষণে জল এসে ওর পাশ ছুঁয়েছে। হয়তো ও তখন বিষম ভয় খেয়ে গিয়েছিলো, চেষ্টা করেছিলো ফিরে আসতে ; কিন্তু ফিরতে গিয়ে হয়তো পথ ভুল ক'রে বসেছিলো, আর আড় ধ'রে গিয়েছিলো গায়ে ঐ জলের মধ্যে, ধস-নামা মাটির মতো কঠিন আর কালো যে-জল ফুঁসছিলো। হয়তো সে হাম্বা-হাম্বা ক'রে সাহায্যের জন্যে ডেকেছিলো। ভগবানই শুধু জানেন সে কেমন ক'রে ডাক ছেড়েছিলো তখন।

নদী যে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ-দৃশ্য যে দেখেছিলো সেই লোকটাকে আমি জিগেশ করেছিলাম সঙ্গে যে-বাছুরটা ছিলো তাকে সে দেখেছে কি না। কিন্তু লোকটা বললে যে দেখেছে কি না তার মনে নেই। সে শুধু বললে যে সে একটা ফুটফুট-কাটা গোরুকে ভেসে যেতে দেখেছে, পাগুলো শূন্যে তোলা, ঠিক যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো তার পাশ দিয়েই যাচ্ছিলো, তার পরেই গোরুটি নাকি ডিগবাজি খেয়ে উলটে যায়, তারপর আর সে তার শিং বা কোনো-কিছুরই কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি। অজস্র গাছ ওপড়ানো শেকড়শুদ্ধ ডালপালাশুদ্ধ ভেসে যাচ্ছিলো নদী দিয়ে, আর সে জ্বালানি কাঠ তুলে নিতেই ব্যস্ত ছিলো, ফলে সে ঠিক ক'রে জানে না কখন কে ভেসে গিয়েছে—গাছপালা, না গোরু-বাছুর।

সেই জন্যেই আমরা জানি না: বাছুরটা এখনও বেঁচে আছে কি না, না কি সেও তার মার সঙ্গে-সঙ্গে নদীতে ভেসে গিয়েছে। যদি গিয়ে থাকে, তবে ভগবান যেন দুই বেচারির ওপরই তাঁর কৃপা রাখেন।

আমার বাড়িতে আমরা যা নিয়ে বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম তা হ'লো, এখন যখন আমার বোন তাচার কোনো সম্পত্তিই আর নেই তখন যে-কোনো-দিনই যা-খুশি ঘ'টে যেতে পারে। লা সের্পেন্তিনাকে জোগাড় করবার জন্যে

বাবাকে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হয়েছিলো, যখন সে বাছুর ছিলো তখনই তাকে আনেন যাতে আমার বোনকে দিতে পারেন, যাতে তাচার অন্তত একটু পুঁজি থাকে, সম্বল থাকে, যাতে ও আমার অন্য দুই দিদি যেমন নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে তেমন না-হয়।

বাবা বলেন ওরা যে খারাপ হয়েছে তার কারণ আমরা আমাদের বাড়িতে সবাই ভারি গরিব—আর ওদের স্বভাবটাও ছিলো দুরন্ত। যখন ওরা বাচ্চা মেয়ে তখন থেকেই ওদের ধিঙ্গিপনা আর খেয়ালখুশি সামলানো কঠিন ছিলো। আর একটু বড়ো হ'তেই ওরা বজ্জাতের ধাড়ি সব লোকজনের সঙ্গে মিশতে শুরু করে, তারাই ওদের খারাপ-খারাপ কাজ শিখিয়েছিলো। ওরা শিখেও ছিলো চটপট, আর নিশুত রাতে শিশের শব্দ শুনলেই কীভাবে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে যেতে হয় তাও শিখে ফেলেছিলো। পরে তারা দিনের বেলাতেও বেরিয়ে যেতো। সারাক্ষণই জল আনতে যাচ্ছে নদীতে, আর মাঝে-মাঝে, যখন তুমি একেবারেই আশা করোনি, তাদের তুমি দেখতে পেতে উঠোনে, মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, উদোম ন্যাংটো, একেকজনের ওপর একেকটা লোক।

তারপর আমার বাবা তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। গোড়ায় যতক্ষণ পারেন ওদের ধিঙ্গিপনা সহ্য করেছিলেন, কিন্তু পরে আর সহ্য করা কঠিন হ'য়ে উঠলো, ওদের বাবা রাস্তায় বার ক'রে দিলেন। ওরা চ'লে গেলো আইয়ুৎলো, জানি না আর কোথায় গেছে; তবে ওরা নষ্ট মেয়েছেলে।

সেই জন্যেই বাবা এখন তাচাকে নিয়েও বেদম ঘাবড়ে গিয়েছেন—কারণ বাবা চান না যে সেও তার দুই দিদির পথ ধ'রে চলুক। বাবা বুঝতে পারলেন গোরুটা হারানোয় তাচা কী ভয়ানক গরিব হ'য়ে পড়েছে, বিশেষত এই দেখে যে সে যখন বড়ো হবে তখন তার এমনকিছুই থাকবে না যাতে কোনো ভালো লোককে বিয়ে করতে পারে, যে তাকে সবসময় ভালো-বাসবে। আর এখন ব্যাপারটা ভারি কঠিন হ'য়ে উঠবে। যখন তার গোরুটা ছিলো সে ছিলো অন্য কথা, কারণ তখন তাকে বিয়ে করতে কারু-না-কারু সাহস হ'তো, শুধু ঐ চমৎকার গাই-গোরুটাকে পাবার জন্যেই।

আমাদের একমাত্র আশা বাছুরটা যদি এখনও বেঁচে থাকে। ভগবানের নামে আশা করি তার মায়ের পেছন-পেছন সেও নদী পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। কারণ যদি গিয়ে থাকে তবে আমার বোন তাচা নষ্ট মেয়ে হ'য়ে-যাওয়া থেকে

এখন মাত্র এক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আর মা চান না যে ও নষ্ট হোক।

আমার মা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না ভগবান কেন তাঁকে এমন-সব মেয়ে দিয়ে সাজা দিয়েছেন—যখন তাঁর কুলে-ঠাম্মা থেকে শুরু ক'রে কেউই খারাপ লোক ছিলো না। সকলেই ভগবানের ভয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছে, ভারি বাধ্য আর অনুগত, কাউকে কখনও অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করেনি। তারা সকলেই এইরকম ছিলো। কে জানে এই দুটো মেয়ে কোত্থেকে এই বদ স্বভাবগুলো পেয়েছে। তাঁর তো বোধে কুলোয় না। বারে-বারে মনের মধ্যে পুরোনো কাসুন্দি ঘাটেন, স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন—আর কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না কোনখানে তাঁর ভুল হয়েছিলো কিংবা কেনই বা একটার পর একটা মেয়ে এমন নষ্ট হ'য়ে যাবে। এমন-কোনো উদাহরণই তাঁর মনে পড়ে না। আর যখনই তিনি তাদের কথা পাড়েন দু-চোখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে কাঁদেন, 'ভগবান যেন ওদের দুটোকে ছাখেন।'

কিন্তু আমার বাবা বলেন ওদের সম্বন্ধে এখন আর কিছুই করার নেই। এখন যার সবচেয়ে বড়ো বিপদ, সে এখনও ঘরেই আছে, তাচা, যে ফনফন ক'রে ডাঁটার মতো বেড়ে উঠছে, যার মাই দুটো ফুলে ভ'রে যেতে শুরু করেছে, তার দিদিদের মতোই হবে ব'লে ভাবটা—উঁচু-উঁচু, চোখা, এমন জাতের যা লোকের চোখে পড়বার জন্যে সবসময় নাচতে থাকে।

'হ্যাঁ,' বাবা বলেন, 'যারই চোখে পড়বে, তারই নজরে ধ'রে যাবে। আর তারও শেষ হবে নষ্ট হ'য়ে গিয়ে; মনে ক'রে রেখো আমার কথা—সেও নষ্ট হ'য়ে যাবে।'

সেইজন্যেই আমার বাবার মেজাজ এমন বিগড়ে গিয়েছে।

আর তাচা খালি কাঁদে যখন বোঝে তার গাইটা আর ফিরে আসবে না কেননা নদী তাকে খুন ক'রে ফেলেছে। এই তো আমার পাশেই আছে তাচা, তার গোলাপি ঘাগরা পরা, নয়ানজুলি থেকে তাকিয়ে দেখছে নদীটাকে, আর কিছুতেই থামাতে পারছে না হাপুশ অঝোর কান্না। গাল বেয়ে নোংরা জল গড়িয়ে পড়ছে কেবল—যেন নদীটাই তার শরীরটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধ'রে তাকে আমি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু বেচারা বোঝেও না। সে আরো জোরে কেঁদে ওঠে। তার মুখ দিয়ে এমন-এক শোর বেরিয়ে আসে, যে-আওয়াজ নদী করে পাড়ের কাছে, আর তাকে

কাঁপায়, তার সারা শরীরটাকে কাঁপায় তার কান্না—আর সারাক্ষণই নদী শুধু ফুলেই উঠতে থাকে। নোংরা ঘোলা জল ফোঁটায়-ফোঁটায় ছিটকে পড়ে তাচার ভিজে মুখে আর তার ছোট্ট দুটি মাই শুধু নাচে, ওপর-নিচ করে, একবারও না-থেমে, যেন তারাও, এখন ভরাট হ'য়ে ফুলে উঠতে শুরু করেছে, এক্ষুনি রওনা দেবে ব'লে, সর্বনাশের পথে।

লোকটা

লোকটার পা বালির মধ্যে ডুবে গেলো, রেখে গেলো এক আকারহীন পথরেখা, যেন কোনো জন্তুর খুরের ছাপ। ওরা পাহাড়ের ওপর বেয়ে উঠলো, উৎরাইয়ের ঢালে পা চেপে বসিয়ে, তারপর ধুঁকতে-ধুঁকতে উঠলো ওপরদিকে, দিগন্তটাকে হাৎড়ে।

'চেটালো পা,' তাকে যে অনুসরণ করছিলো সে বললে। 'পায়ের একটা আঙুল নেই—বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল। তা এ-রকম লোক বেশি নেই আশ-পাশে। ফলে কাজটা সহজ হবে।'

কাঁটা আর কাঁটাঝোপে ভর্তি পথটা উঠে গিয়েছে ঘাসের টুকরো-টুকরো ফালির মধ্য দিয়ে। এত সরু যে মনে হয় সে যেন পিঁপড়েদের পথ। না-থেমেই পথটা উঠে গিয়েছে সোজা আকাশের দিকে। সেখানে পথটা হারিয়ে গেছে, তারপর ফের দেখা দিয়েছে দূরে, আরো-কোনো সুদূর আকাশের তলায়। লোকটা হাঁটছিলো তার কড়-পড়া গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে-দিয়ে, পায়ের নখে পাথরগুলোয় আঁচড় কেটে, ড্যানা চুলকোতে-চুলকোতে, প্রতিটি দিগন্তের কাছে এসে থেমে প'ড়ে তার গন্তব্যটা কত দূরে হিশেব ক'রে নিচ্ছিলো: 'আমার নয়, কিন্তু তার,' সে বললে। আর সে মাথা ফেরালো কথাটা কে বলেছে দেখতে।

একফোঁটাও হাওয়া নেই, শুধু ভাঙা ডালপালার মধ্যে সে যে-আওয়াজ তুলছে, তারই শোর। হাৎড়ে-হাৎড়ে পথ বার ক'রে যেতে-যেতে সে ক্লান্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে দম আটকে হিশেব করতে হচ্ছে, আর সে ফের আওড়ালে: 'শুধু এটাই আমি করবো।' আর তখনই সে টের পেলে যে কথাটা বলেছে সে নিজেই।

'ওখানে বেয়ে উঠেছিলো, পাহাড়ের গায়ে আঁকশি ঠেকিয়ে-ঠেকিয়ে,' বললে লোকটা যে তার পেছন নিয়েছে। 'মাশেতে দিয়ে সে ডালপালা কেটেছে। দেখেই তুমি বুঝতে পারবে যে ভয়ে একেবারে শিঁটিয়ে আছে। ভয় সবসময়েই চিহ্ন রেখে যায়। সেটাই তার পতন ঘটাবে।'

তার সাহস মিলিয়ে যেতে শুরু করে, যখন ঘণ্টাগুলো পর-পর ছড়িয়ে গিয়ে লম্বা হ'য়ে যায় সামনে, আর একটা দিগন্তের পরপারে ঘাপটি মেরে থাকে আরেকটা দিগন্ত; আর যে-পাহাড়টাকে সে বেয়ে উঠছে, তার যেন আর কোনো শেষ মাথা নেই। সে তার মাশেতে বার ক'রে নিয়ে শেকড়ের মতো শক্ত ডালপালাগুলো কাটে, একেবারে শেকড় অব্দি ঘাসগুলোকে এক হ্যাঁচকা কোপে কেটে ফ্যালে। চটচটে একটা কাদামাখা ঘাসের গুচ্ছ মুখে পোরে সে, তারপরেই রেগে থু-থু ক'রে ছিটিয়ে দেয় মাটিতে। সে তার দাঁত চোষে, তারপর আবার থু-থু ছেটায়। ওপরের আকাশ শান্ত, চুপচাপ, পাতা-ঝরা লাউগাছের ফাঁকে-ফাকে আকাশের মেঘকে দেখায় ঈষদচ্ছ। এটা নতুন পাতার মরশুম নয়। শুকনো আর কাঁটার ঘায়ে ভরা বুনো ফণিমনসার ঋতু এটা। উৎকণ্ঠায় ভ'রে গিয়ে সে তার মাশেতে দিয়ে কাঁটাঝোপগুলোয় একের পর এক ঘা কষায়: 'এ-ধরনের কাজ করতে-করতে শেষে একঘেয়ে লাগতে শুরু করবে, তার চেয়ে বরং সে যেমন আছে তাকে তেমনি শান্তিতেই রেখে দেয়া ভালো।'

সে তার নিজের গলার স্বর শুনতে পেলে পেছনে।

'তার নিজের রাগই তাকে ধরিয়ে দেবে,' বললে তার অনুসরণকারী। 'সে তো আমাদের ব'লেই দিয়েছে সে কে, এখন আমাদের শুধু জানতে হবে সে কোথায় আছে, কোনখানে। সে যেখান দিয়ে বেয়ে উঠেছে, সেখান দিয়েই বেয়ে উঠবো আমি, আর যে-ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছে সেখান দিয়েই নেমে যাবো; যতক্ষণ-না তাকে আমি ক্লান্ত ক'রে ফেলবো ততক্ষণ শুধু তার পায়ের চিহ্ন ধ'রে-ধ'রেই এগুবো। আর যেখানে গিয়ে আমি থামবো, সে থাকবে সেখানে। সে হাঁটু গেড়ে বসবে আমার সামনে, অনুনয় করবে, কাকুতি-মিনতি করবে তাকে ক্ষমা করবার জন্যে। আর আমি তার ঘাড়ের পেছনে বুলেট ঢুকিয়ে দেবো একটা—শুধু এটাই হবে, জানো, যখন তোমায় আমি বাগে পাবো।'

সে গিয়ে পৌঁছুলো শেষ সীমায়। শুধু বিশুদ্ধ আকাশ, ছাইধুসর, রাত্তিরের কালোমেঘে আধোপোড়া। পৃথিবী প'ড়ে গিয়েছে অন্যপাশে। সে তার সামনের বাড়িটার দিকে তাকায়, অঙ্গারগুলো থেকে শেষ ধোঁয়া উঠছে। সে ধপ ক'রে ব'সে পড়ে নরম, নতুন হাল-চষা জমিতে। একটা কুকুর বেরিয়ে এসে তার হাঁটু চাটে, আরেকটা ল্যাজ নেড়ে-নেড়ে তার চারপাশে পাক খেয়ে-খেয়ে ছোটে। তারপর সে ঠেলে খুললো দরজা, শুধু রাতের কাছেই যা ছিলো বন্ধ।

তাকে যে অনুসরণ করছিলো সে বললে: 'বাহাদুর কাজ করেছে সে।

তাদের এমনকী জাগায়ওনি। নিশ্চয়ই রাত একটা নাগাদ এসে পৌঁছেছিলো, যখন তুমি সবচেয়ে গাঢ় গভীর ঘুমে ঢ'লে পড়েছো ; "শান্তিতে বিশ্রাম করো" প্রার্থনার পরে ; যখন জীবন গড়িয়ে গিয়ে পড়ে রাত্তিরের হাতে, যখন শরীরের ক্লান্তি অবিশ্বাসের দড়ি জীর্ণ ক'রে ফ্যালে আর ছিঁড়ে দেয়।'

'ওদের সব ক-টাকে জবাই করা আমার উচিত হয়নি,' লোকটা বললে, 'অন্তত সব ক-টাকে নয়।' সে শুধু এইটুকুই বললে।

উষা ছিলো ধূসর, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভরা। ঘাসের ওপর দিয়ে পিছলে নেমে সে অন্যপাশে চ'লে গেলো। যে-মাশেতেটা তখনও সে আঁকড়ে ধ'রে ছিলো সেটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, যখন ঠাণ্ডাহিম তার হাতে আড় ধরিয়ে গেলো। সে সেটাকে ওখানেই ফেলে রেখে গেলো। শুকনো কাঁটাগুলোর মধ্যে একটা মরা সাপের টুকরোর মতো তাকে সে চকচক ক'রে উঠতে দেখলো।

অনেক নিচে, নদী ব'য়ে যায় ; নিঃশব্দে তার ঘন স্রোতটাকে কোল দিয়ে তার জল ছলছল ক'রে ছুঁয়ে যায় সাইপ্রেস গাছগুলো। সে বেঁকে, ঘুরে, মোড় ঘুরে নিজের মধ্যেই পাক খায়। সে কুণ্ডলি পাকায় সবুজ মাটিতে যেমন কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে সাপ। সে কোনো শব্দ করে না। তুমি ঘুমোতে পারো এখানে, তার কাছে, আর কেউ হয়তো কান পাতলে তোমার নিশ্বাস শুনতে পাবে, কিন্তু নদীর নয়। ঢ্যাঙা সাইপ্রেসগুলো থেকে জড়িয়ে-জড়িয়ে নেমেছে আইভিলতা, নেমে এসে ডুবে গিয়েছে জলে, হাতগুলো জড়ো ক'রে, মাকড়শার জাল বানিয়ে, নদী কখনও যার জট ছাড়ায় না।

সাইপ্রেসগুলোর হলুদ রং দেখে লোকটা নদীর ধারা টের পেয়েছিলো, নদীকে সে শোনেনি। সে শুধু দেখতে পেলে তাকে ছায়ার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে যেতে। সে দেখতে পেলে চাচালাকারা এলো, কিচিরমিচির-তোলা সব পাখি। আগের বিকেলে তারা অনুসরণ করছিলো সূর্যকে, ঝাঁক বেঁধে উড়ছিলো আলোর পেছন-পেছন। এখন সূর্য আবার বেরিয়ে আসছে, আর তারাও আবার ফিরে আসছে।

তিন-তিনবার সে বুকে ক্রুশ আঁকলে। 'ক্ষমা, কোরো আমায়,' তাদের সে বললে। আর সে তার কাজ শুরু ক'রে দিলে। যখন সে তৃতীয়টায় গিয়ে পৌঁছুলো, দরদর ক'রে চোখের জল পড়ছে তার মুখ বেয়ে। কিংবা হয়তো ঘামই হবে বুঝি। মারাটা কঠিন কাজ। চামড়াটা পেছল। সে হার স্বীকার ক'রেই ব'সে আছে, তবু সে হারের ভাবটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করে। আর

মাশেভেটা ভোঁতা : 'তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো,' সে আবার বললে তাদের।

'সে তীরের বালিতে ব'সে ছিলো,' বললে তার পেছন-নেয়া। 'সে এখানে ব'সে ছিলো আর অনেকক্ষণ কোনো নড়াচড়া করেনি। অপেক্ষা করছিলো কখন মেঘগুলো স'রে যায়। কিন্তু সূর্য সেদিন বেরোয়ইনি, তার পরের দিনও না, আমার মনে আছে। সেই রোববারেই আমার সদ্যোজাত বাচ্চাটা মরেছিলো, আমরা তাকে গোর দিতে গিয়েছিলাম। মন খারাপ হয়নি আমাদের। আমার শুধু মনে আছে যে আকাশ ছিলো ধূসর আর যে-ফুলগুলো আমরা নিয়ে যাচ্ছিলাম তারা সব বিবর্ণ হ'য়ে গুটিয়ে যাচ্ছিলো, যেন তারাও টের পেয়েছিলো সূর্যের গরহাজিরা।

'সে-লোকটা এইখানে ছিলো, অপেক্ষায়। তার পায়ের চিহ্ন ছিলো সবখানে। ঘন ঝোপের কাছে বাসা বেঁধে ছিলো সে, ভিজে মাটিতে তার শরীর বানিয়ে দিয়েছিলো ডেবে-যাওয়া এক গর্ত।'

'পথটা ছেড়ে-আসা উচিত হয়নি আমার,' লোকটা ভাবলে। 'এতক্ষণে আমার সেখানে পৌঁছে-যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সবাই যেখানে যায় সেখানে যাওয়াটাই বিপজ্জনক, বিশেষ ক'রে এই-যে বোঝা আমি ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমার দিকে একবার তাকিয়েই যে-কেউ এই ভারটা দেখতে পারবে, যেন এ এক আজব ফুলে-ওঠা স্ফীতাবস্থা। এইভাবেই পুরো ব্যাপারটাকে মনে হচ্ছে আমার। যখন আমি টের পেলাম ওরা আমার পায়ের পাতা থেকে বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেলছে, ওরা দেখেছিলো ব্যাপারটাকে, কিন্তু আমি পরে ছাড়া সেটা দেখিনি। আর, যদিও আমি চাই না, তবু তা-ই, কোনো-একটা চিহ্ন থাকা দরকার আমার। এইই আমার মনে হয়, এই বোঝাটার জন্যেই; না কি পুরো চেষ্টাটাই আমাকে হা-ক্লান্ত ক'রে ফেলেছে।' তারপর সে জুড়ে দিলে: 'সব ক-টাকে খুন ক'রে ফেলা আমার উচিত হয়নি; একজন, যাকে মারতে হ'তোই তাকে মেরেই আমার তুষ্ট হওয়া উচিত ছিলো; কিন্তু অন্ধকার ছিলো সব, সব ক-টারই আকৃতি ছিলো এক মাপের।— যাক গে, একসঙ্গে অতজন যখন তখন তাদের গোর দিতে আর বাড়তি খরচ হবে না।'

'তুমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে, আমার আগেই। তুমি যেখানে যেতে চাচ্ছো আমি সেখানেই যাবো, তোমার আগেই,' যে তাকে অনুসরণ ক'রে আসছিলো সে বললে। 'তোমার সব মৎলব আমি টের পেয়ে গেছি বুকের মধ্যে: তুমি কে, কোত্থেকে এসেছো, কোথায় যাচ্ছো। তুমি গিয়ে পৌঁছুবার আগেই আমি ওখানে পৌঁছে যাবো।'

'এটা তো জায়গাটা নয়,' বললে লোকটা যখন সে দেখতে পেলে নদী। 'এটাকে পেরুবো আমি এখানে, তারপর দূরে গিয়ে আবার, হয়তো ফিরে আসবো আবার একই তীরে। অন্যপাশে যেতেই হবে আমাকে ; যেতে হবে সেখানে যেখানে কেউ আমাকে চেনে না ; তারপর আমি সোজা চলবো সামনে, যতক্ষণ-না সেখানে গিয়ে পৌঁছুই। সেখান থেকে কেউ আমাকে আর বার ক'রে আনতে পারবে না।'

চাচালাকাদের আরো ঝাঁক উড়ে গেলো, কিচিরমিচির ক'রে, চেঁচিয়ে কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে।

'আরো ভাঁটির দিকে যেতে হবে আমায়। নদীটা এখানে বাঁক ফিরে-ফিরে জট পাকিয়ে গেছে, হয়তো যেখানে আমি যেতে চাই না, সেখানেই আবার আমায় ফিরিয়ে আনবে।'

'কেউ তোকে ছোঁবে না, ছেলে। আমি এখানে আছি তোকে রক্ষা করবার জন্যে। সেইজন্যেই আমি তোর আগে জন্মেছি, আর তোর আগেই আমার হাড়গুলো শক্তপোক্ত হয়েছে!'

কেন সে বলছে এই কথা? এখন তার ছেলে নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। কিংবা করছে না হয়তো। 'হয়তো ও তেতো হ'য়ে আছে আমার বিরুদ্ধে—আমাদের শেষ প্রহরে ওকে একা ফেলে-রেখে-আসার জন্যে। কারণ এটা তো আমারও ; শুধু আমার। সে এসেছিলো আমার পেছন নিয়ে। সে তোর খোঁজ করছিলো না, শুধু আমাকেই সে খুঁজছিলো, সে স্বপ্ন দেখেছিলো শুধু আমার মুখটাকেই মরা দেখবে ব'লে, কাদায় ঘষটে দেয়া, লাথির পর লাথি, গায়ের ওপর উঠে দাপাদাপি, যতক্ষণ-না বিকৃত কিমাকার হ'য়ে যায় শরীরটা। ঠিক যেমন আমি করেছিলাম তার ভাইকে ; তবে আমি করেছিলাম সামনাসামনি, মুখোমুখি, হোসে আলকানসিয়া, তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর তুই—তুই শুধু যা করেছিলি, আতঙ্কে কেঁপে উঠে আর্ত চীৎকার করা। আর সেই থেকে, ওহে, আমি জানি তুমি কে, আর কেমন ক'রে তুমি আসবে আমার পেছন নিয়ে। আস্ত একটা মাস, একটা গোটা মাস আমি অপেক্ষা করেছিলাম তোমার জন্যে, জেগে-জেগে, দিনরাত জেগে-জেগে, এই জেনে যে তুমি আসবে হামাগুড়ি দিয়ে, গোপনে, চুপিচুপি, লুকিয়ে-লুকিয়ে, যেন অলুক্ষুণে কোনো সাপ। আর তুমি এলে দেরি ক'রে। আর আমিও দেরি ক'রেই এসেছিলাম। আমি এসে পৌঁছেছিলাম তোমারও পরে। আমার বাচ্চার গোর দেয়ার ব্যাপারটা

আমার দেরি করিয়ে দিয়েছিলো, এখন আমি জানি। এখন আমি জানি, ফুলগুলি কেন শুকিয়ে গিয়েছিলো আমার হাতে।'

'ওদের সবাইকেই মেরে-ফেলা আমার উচিত হয়নি,' লোকটা ভাবছিলো। 'অত বড়ো একটা বোঝা নিজের পিঠে চাপানোর কোনো মানে হয় না। মরা মানুষের ওজন জ্যান্তদের চেয়ে বেশি; তারা তোমায় পেড়ে ফ্যালে, পিষে ফ্যালে। আমার উচিত ছিলো এক-এক ক'রে তাদের ছেড়ে রেখে-আসা যতক্ষণ-না আমি তাকে পাই; তার গোঁফ দেখেই আমি তাকে চিনতে পারতাম; অন্ধকার হ'লেও আমি বুঝতে পারতাম ঘা-টা কোথায় দেয়া উচিত—সে উঠে পড়বার আগেই—শেষ অব্দি, অবশ্য, যা হ'লো ভালোই হ'লো আরো। তাদের জন্যে ডুকরে কাঁদবার জন্যে কেউ আর রইলো না—আর আমি শান্তিতে বাঁচবো। মোদ্দা ব্যাপারটা এখন, রাত্তির আমার নাগাল ধ'রে ফেলার আগেই, এখান থেকে সটকে-পড়া।'

বিকেলবেলায় লোকটা নদীর সরু অংশটায় গিয়ে পৌঁছুলো। সারাদিনে একবারও সূর্য বেরিয়ে আসেনি, তবে আলো ছায়াগুলোকে নাড়িয়েছে; তাই দেখেই সে বুঝতে পেরেছে যে এ বিকেলবেলা।

'ধরা প'ড়ে গিয়েছো তুমি,' যে তাকে অনুসরণ করছিলো সে বললে, এখন সে ব'সে আছে নদীর তীরে। 'তুমি একটা কানাগলির শেষে এসে পৌঁছেছো। প্রথমে ঐ ভয়ংকর কাজটি ক'রে, আর এখন যেখানে গিয়ে পৌঁছেছো সে-জায়গাটা নদী দিয়ে বাক্সের ডালার মতো আটকানো, যেন নিজের কফিনটাতেই ঢুকে গিয়েছো। ওখানে তোমাকে অনুসরণ ক'রে যাবার কোনো মানে আছে ব'লে আমার মনে হয় না। চারপাশে সব তোমায় ঘিরে ধরেছে, যাবার জায়গা কোথাও নেই, এটা দেখলেই তুমি আবার এ-পথে ফিরে আসবে। আমি তোমার জন্যে এখানে ঠায় ব'সে থাকবো; সময়টা ব্যবহার করবো আমি টিপ অভ্যাস ক'রে-ক'রে, মৎলব এঁটে-এঁটে, ঠিক কোনখানে বুলেটটা তোমার গায়ে লাগবে, সেটা ভেবে-ভেবে। আমি ধৈর্য ধরতে জানি, তুমি জানো না—আর তাতে আমারই সুবিধে! আমার বুক স্বাস্থ্যসবল, তার নিজের রক্তেই ঘোরে-ফেরে; তোমারটা জীর্ণ, শুকনো, কুঁচকে-যাওয়া—প'চে যাচ্ছে। আমারই সুবিধে। কাল তুমি মরবে, কিংবা পরশু, কিংবা একহপ্তা বাদে। সময়ে কিছুই এসে যায় না। আমার ধৈর্য আছে।'

লোকটা দেখতে পেলে নদীটা দু-ধারের খাড়া পাহাড়ের মধ্যে সরু হ'য়ে যাচ্ছে, আর সে থেমে পড়লো। 'আমাকে ফিরে যেতে হবে', সে বললে।

এখানটায় নদী চওড়া আর গভীর আর কোনো তুমুল চোরা টান নেই। ঘন, নোংরা তেলের মতো খালের জলে সে পিছলে পড়ে। মাঝে-মাঝে জল তার পাকে ডালপালা গিলে খায়, কোনো প্রতিবাদের আওয়াজ তুলতে না-দিয়েই তার আবর্তে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে খেয়ে ফ্যালে।

'বাছা,' যে ব'সে-ব'সে অপেক্ষা করছিলো সে বললে, 'কিছুই এসে যায় না, যদি আমি তোকে বলি যে যে-লোকটা তোকে মেরেছে সে ঐ মুহূর্ত থেকেই নিজেই ম'রে গিয়েছে। কিছু কি আমি লাভ করবো তা থেকে? মোদ্দা ব্যাপারটা হ'লো আমি তোর সঙ্গে ছিলাম না। তবে কোনোকিছুই বা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে ফায়দা কী? আমি সেখানে তোর সঙ্গে ছিলাম না। ব্যাপারটা শুধু এই। মেয়েটির সঙ্গেও ছিলাম না, ছেলেটির সঙ্গেও ছিলাম না। আমি কারু সঙ্গেই ছিলাম না, কেননা সদ্য-জন্মানো বাচ্চাটা আমার মনটাকে বাকি সমস্ত কিছু থেকে আটকে রেখেছিলো।'

লোকটা উজান বেয়ে এগুলো লম্বা অনেকটা রাস্তা।

তার মনের মধ্যে রক্ত ফুটছে টগবগ ক'রে। 'আমি ভেবেছিলাম প্রথমজন তার মৃত্যুর ঘড়ঘড়ে আওয়াজে অন্যদের জাগিয়ে দেবে, সেইজন্যেই আমি এত তাড়াহুড়ো করছিলাম।' 'আমার তাড়াকে ক্ষমা কোরো,' সে তাদের বললে। আর তারপর তার মনে হ'লো গলার শুকনো ঘর্ঘর শব্দটা শুনিয়েছিলো কারু নাক ডাকার মতো; সেইজন্যেই সে অত শান্ত হ'য়ে ছিলো, যখন সে বাইরে চ'লে গিয়েছিলো, বাইরে, রাতের মধ্যে, সেই মেঘলা রাতের ঠাণ্ডায়।

...

সে মনে হচ্ছিলো পালিয়ে যাচ্ছে। তার পায়ের নলিতে এমনভাবে চাপ-চাপ কাদা লেগেছিলো যে তার পাৎলুনের রং কী, সেটাও আপনি ধরতে পারতেন না।

যে-মুহূর্তে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, তখন থেকে আমি তার ওপর নজর রেখে আসছিলাম।

সে গুটিয়ে নিয়েছিলো তার শরীর, তারপর সে ভেসে গিয়েছিলো ভাঁটিতে, তার ড্যানা একবারও না-নেড়ে, যেন সে পাতাল দিয়ে হেঁটে চলেছে। তারপর সে গিয়ে পৌঁছেছিলো তীরে, জামাকাপড় খুলে শুকোতে দিয়েছিলো। দেখতে পাচ্ছিলাম সে ঠাণ্ডায় ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। হাওয়া দিচ্ছিলো জোর, মেঘলাও ছিলো।

বেড়ার মধ্যকার একটা ফাঁক দিয়ে আমি উঁকি দিচ্ছিলাম, আমার মালিক

আমাকে সেখানেই রেখেছিলেন ভেড়াগুলোকে পাহারা দেবার জন্যে। আমি ফিরে সেই লোকটার দিকে তাকিয়েছিলাম; কেউ যে গোপনে তার ওপর নজর রাখছে, এটা সে সন্দেহই করতে পারেনি।

সে তার বাহু দুটি ওপর-নিচ করলে, ছড়িয়ে দিলে, ঢিলে ক'রে দিলে শরীর, যাতে হাওয়া বয় শরীরে, জল শুকিয়ে যায়। তারপর সে তার ছেঁড়া জামা-পাৎলুন প'রে নিলে। দেখতে পেলাম তার কাছে কোনো মাশেতে বা অন্যকোনো হাতিয়ার নেই। শুধু পিস্তল রাখার ফাঁকা খাপটা, তার বেল্ট থেকে ঝুলছে।

বারে-বারে তাকিয়ে দেখলে সে চারপাশে, তারপর সে চ'লে গেলো। আর আমিও ঠিক তখন ভেড়াগুলোকে জড়ো ক'রে আনবার জন্যে উঠবো ব'লে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় দেখলাম সে আবার ফিরে এলো, তেমনি একটা সবহারা চেহারা তার।

আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে, মাঝখানে, যেখানে স্রোত দু-ভাগ হ'য়ে গেছে, ফিরতি পথে, উজানে।

'লোকটার ব্যাপার কী, অ্যাঁ?' নিজেকে আমি শুধোলাম।

শুধু এইটুকুই। স্রোতের মুখোমুখি পড়েছে সে, আর স্রোত তাকে চারপাশ থেকে চাবকাচ্ছে যেন সে একটা হালকা পালকের বল; প্রায় ডুবেই যেতে বসেছিলো সে। দু-হাত দিয়ে সে জল আছড়ালে, কিন্তু জল কেটে এগুতে পারছিলো না কিছুতেই, সে ফিরে এলো তীরে, আরো ভাঁটির দিকে; কেশে-কেশে জল বার করছে। মনে হচ্ছিলো কাশির দমকে তার ভেতর থেকে বুঝি নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে।

আবার সে নিজেকে শুকোবার পুরো চেষ্টাটার মধ্য দিয়ে গেলো, উদোম ন্যাংটো, তারপর সে আবার ফিরে গেলো নদীর তীর ধ'রে, যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকেই।

সে যাতে এখন এখানে থাকে, সেটাই আমি চাচ্ছিলাম। যদি জানতাম সে কী করেছে তবে পাথর ঠুকে-ঠুকে তাকে আমি গুঁড়ো ক'রে ফেলতাম, তাতে আমার কোনো দুঃখও হ'তো না।

ভেবে-ভেবে বুঝতে পারলাম, সে পালাচ্ছে। আপনার শুধু তার মুখখানা দেখলেই চলতো। তবে, সেনিওর লিসেনসিয়াদো, আমি তো কারু মনের কথা পড়তে পারি না। আমি শুধু ভেড়া চরাই, মাঝে-মাঝে মনে হয় ভয়-টয়ও পাই।

যদিও, আপনি যেমন বলছেন, আমি তাকে সহজেই অসাবধান অবস্থায় পাকড়ে ফেলতে পারতাম, আর কোনো পাথর তার মাথা তাগ ক'রে ছুঁড়তে পারলে সে একটা তক্তার মতো আড় ধ'রে প'ড়ে যেতো। ঠিকই বলেছেন আপনি, যেদিক থেকে যেভাবেই হোক দেখুন না কেন, এটাই ঠিক হ'তো।

ঐ যে আগে ও অতগুলো খুনখারাবি করেছে, এই কিছুক্ষণ আগেও নাকি আবার, আপনার কাছ থেকে এটা শোনা অব্দি নিজেকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না। খুনীদের খুন করতে আমার ভালো লাগে, বিশ্বাস করুন। সাধারণত তা যে করা হয়, তা নয়, তবে শয়তানের এই বাচ্চাগুলোকে খতম ক'রে দিয়ে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে পারলে ভালো অনুভূতিই হয় ভেতরে।

এটা কিন্তু মোটেই পুরো কাহিনটা নয়। পরদিন তাকে আমি আবার ফিরে আসতে দেখেছি। কিন্তু তখনও তো আমি কিছুই জানতাম না। যদি জানতাম--

দেখলাম সে আসছে, আগের দিনের চাইতেও রোগা, হাড্ডিসার, চামড়ার মধ্য থেকে হাড়গুলো ফুটে বেরিয়ে আছে, জামাটা ছেঁড়া। গোড়ায় কিন্তু সে ব'লেই ভাবিনি, এত অন্যরকম লাগছিলো দেখতে।

তাকে চিনতে পেরেছিলাম শুধু তার চোখের চাউনি দিয়ে—এত কঠিন দৃষ্টি যে মনে হয় আপনাকে তা আঘাত করতে পারে। দেখলাম সে জল খেলে, তারপর মুখ ভর্তি ক'রে জল নিলে, যেন কুলকুচো করবে; কিন্তু আসলে সে কতগুলো কাদার পোকা গিলে ফেলেছিলো, মুখভর্তি, কারণ যে-জল থেকে সে জল খাচ্ছিলো তাতে কিলবিল করছিলো পোকাগুলো। নিশ্চয়ই ভীষণ খিদে পেয়েছিলো তার।

তার চোখের দিকে তাকালাম আমি, যেন দুটো কালো গর্ত, গুহার মতো।

সে আমার কাছে এসে বললে, 'এ-সব তোমার ভেড়া নাকি?' আমি তাকে বললাম, আমার না। 'ওরা ওদের মায়ের ছানাপোনা,' এই কথাই আমি তাকে বলেছিলাম।

কথাটা তার কাছে মজার ঠেকেনি। সে এমনকী হাসেওনি। মাদিগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে নধরটাকে সে পাকড়ালে, আর সাঁড়াশির মতো তার পা জাপটে ধ'রে তার বাঁটগুলো চুষতে লাগলো। মাদিটার ব্যা-ব্যা এই অ্যাদ্দুর থেকেও শুনতে পেতেন আপনি; কিন্তু সে তাকে ছেড়ে দেয়নি মোটেই, চুষতেই থাকে, যতক্ষণ-না তার পেট ভ'রে যায়। আপনি আন্দাজ করতে পারবেন সে

কেমন চুষেছিলো যদি বলি যে তার বাঁটের ফোলা কমাবার জন্যে আমাকে তেল মালিশ ক'রে দিতে হয়েছিলো, যাতে তার দাঁতের কামড়ে ভেড়ীটার কোনো অসুখ না-করে।

আপনি বলছেন সে গোটা উবৃকিদি পরিবারকে খুন করেছে? আমি যদি জানতাম তাহ'লে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তার পালিয়ে-যাওয়া বার ক'রে দিতাম।

তবে আপনি যদি একা-একা এই উঁচু পাহাড়ে থাকেন, কোথায় কী ঘটছে আপনি তা জানবেন কী ক'রে—বিশেষ ক'রে আপনার সঙ্গী যদি হয় একপাল ভেড়া আর ভেড়ারা তো কোনো কেচ্ছা-গুজব জানে না।

সে আবার এসেছিলো পরের দিন। আমি যখন এলাম, সেও চ'লে এলো। আর, আমাদের মধ্যে এমনকী দোস্তিও হয়েছিলো।

সে বলেছিলো সে এদিককার কোনো লোক নয়—অনেক দূর থেকে এসেছে; তবে সে আর হাঁটতে পারছে না, হাঁটুর জোড়গুলো তার যেন খুলে আসছে: 'আমি হাঁটি আর হাঁটি অথচ কোনো জমিই পেরুতে পারি না। পা দুটো এমন দুর্বল যে দুমড়ে ভেঙে পড়তে চায় দ হ'য়ে। আর আমার দেশ অনেক দূরে, ঐ পাহাড়গুলোর চাইতেও দূরে।' সে আমায় বলেছিলো দু-দুটো দিন সে শুধু আগাছা ছাড়া আর-কিছু খেতে পায়নি। এই কথাই সে আমাকে বলেছিলো।

আপনি বলছেন যে উবৃকিদি পরিবারকে খুন ক'রেও তার কোনোই দুঃখ হয়নি? আমি যদি জানতাম, তবে তাকে তক্ষুনি দুঃখ পেতে হ'তো, টেঁশেই ফেলতাম তাকে, যখন সে হাঁ ক'রে আমার ভেড়ীর দুধ টানছিলো।

কিন্তু তাকে মন্দ লোক মনে হয়নি। সে আমাকে তার বৌ আর বাচ্চার কথা বলেছিলো। আর এখন তারা তার চাইতে কত দূরে আছে। তাদের কথা মনে হ'তেই সে নাক টেনে-টেনে ফুঁপিয়েছিলো।

আর বড্ড হাড়জিরজিরে ছিলো সে, রেললাইনের মতো রোগা। এই তো গতকালই সে একটা জন্তুর মাংস খেলে, বাজ প'ড়ে যেটা ঝলশে পুড়ে গিয়েছিলো। ভেড়াটার একটা অংশ নিশ্চয়ই পিঁপড়েরা খেয়ে সাবাড় ক'রে দিয়েছিলো, আর বাকি যা পড়েছিলো সে তোর্‌তিয়া গরম করবার জন্যে যে-আগুন জেলেছিলাম তাইতে ঝলশে খেয়ে ফেললে। হাড়গোড়গুলো অব্দি চিবিয়ে সাবাড় ক'রে দিয়েছিলো।

'বেচারা ভেড়াটা রোগে ভুগে মারা গেছে,' তাকে আমি বলেছিলাম।

কিন্তু সে যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি। সব সে গবগব ক'রে খেয়ে ফেললে। খিদে পেয়েছিলো তার।

কিন্তু আপনি বলছেন যে সে অত লোককে খুন করেছিলো। শুধু যদি আমি জানতাম। অজ্ঞান বিশ্বাসপরায়ণ হবার ফল যে কী হয় দেখছেন তো। আমি তো শুধু ভেড়া চরাই, এই একটা কাজই আমি জানি। জানিনা আপনি কী ভাববেন যখন বলবো যে সে আমার নিজের তোর্‌তিয়া থেকেও খেয়েছে, আমারই রেকাবি থেকে ঝোলে ভিজিয়ে নিয়ে।

তো এখন যখন আমি আপনাকে যা জানি বলতে এসেছি, আমি কি তার দোসর হ'য়ে ছিলাম নাকি—একই খাতের লোক? তা-ই তো মনে হচ্ছে। আর এখন কি না আপনি আমায় বলছেন সে-লোকটাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে আপনি আমায় হাজতে পুরে দেবেন! যেন আমিই ঐ পুরো পরিবারটাকে সাবাড় করেছি। আমি শুধু আপনাকে বলতে এসেছি নদীর জলে একটা মড়া ভাসছে। আর আপনি আমায় জিগেশ করছেন কবে থেকে ভাসছে, কেমন দেখতে লোকটা, তার সম্বন্ধে যাবতীয় কাহন, আর যখন আপনাকে সব বললাম, আপনি বলছেন আমি তার দোষ ঢাকছি! বেশ, তাহ'লে এইরকমই হয় ব্যাপারটা।

বিশ্বাস করুন আমায়, সেনিওর লিসেনসিয়াদো, যদি আমি জানতাম লোকটা কে তাহ'লে তাকে খতম করবার একটা উপায় আমি বার করতামই। কিন্তু আমি কী জানতাম বলুন? আমি তো আর কারু মন পড়তে পারি না। শুধু যা সে করেছিলো তা এই: কিছু খাবার চেয়েছিলো আমার কাছে, তার বাল-বাচ্চার কথা বলেছিলো, চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল ঝরছিলো।

আর এখন সে ম'রে প'ড়ে আছে! আমি ভেবেছিলাম জামাকাপড়গুলো বুঝি নদীর পাথরে শুকোতে দিয়েছে, কিন্তু প'ড়ে ছিলো সে-ই, উপুড় হ'য়ে, জলের মধ্যে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম সে উপুড় হ'য়ে পড়েছে বুঝি এই জন্যেই যে ঝুঁকে জল খেতে চাচ্ছিলো নদীতে, আর মাথা তুলতে পারেনি, জলের মধ্যে শ্বাস নিতে গিয়ে খাবি খাচ্ছিলো; কিন্তু পরে দেখি তার কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, আর তার ঘাড়ের পেছনে গর্ত-গর্ত, যেন তারা র‍্যাঁদা চালিয়েছে তার ঘাড়ে। আমি শুধু আপনাকে বলতে এসেছি সত্যি কী হয়েছিলো, কিছু জুড়েও দিইনি, কিছু রেখে-ঢেকে বাদ দিয়েও বলিনি। আমি নিছকই ভেড়া চরাই—শুধু ভেড়া চরাতেই জানি আমি, শুধু তা-ই জানি।

ভোরবেলায়

সান্ গাব্রিয়েল থেকে কুয়াশা বেরিয়ে এলো শিশিরভেজা। রাতের মেঘেরা গাঁয়ের ওপর ঘুমিয়েছিলো লোকের গা থেকে ওম খুঁজে। এখন সূর্য প্রায় বেরিয়ে আসতে চলেছে আর কুয়াশা আস্তে-আস্তে উঠে যাচ্ছে, গুটিয়ে নিচ্ছে তার চাদর, রেখে যাচ্ছে ছাতের ফালি-ফালি শাদা। আর ভিজে মাটি থেকে এক ধূসর ভাপ, প্রায় চোখেই পড়ে না, উঠে আসছে গাছে, মেঘের টানে, কিন্তু সে পরক্ষণেই উধাও হ'য়ে যায়। তারপর রান্নাঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে কালো ধোঁয়া, পোড়া ওকের গন্ধ নিয়ে, আকাশকে ছাইয়ে ঢেকে দিয়ে।

দূরে পাহাড়গুলো এখনও ছায়ার মধ্যে।

একটা সোয়ালো ছোঁ দিয়ে নামে রাস্তায়, তারপরেই ভোরবেলার প্রথম ঘণ্টা বেজে ওঠে।

আলোগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়। তারপর একটা মাটিরঙা ছোপ কাফনের মতো ঢাকে গ্রামকে, যেটা এখনও আরো-একটু নাক ডাকায়, দিন ফুটে-ওঠার রঙের মধ্যে ঢোলে।

...

দু-পাশে ডুমুরগাছ, হিকিলপান রাস্তা ধ'রে চ'লে আসে বুড়ো এস্তেবান একটা গোরুর পিঠে চ'ড়ে, তাড়িয়ে নিয়ে আসে তার দুধেল গাইগুলো। সে যে গোরুর পিঠে চ'ড়ে আসে তার কারণ ফড়িংরা তাতে তার মুখে এসে তিড়িংতিড়িং ক'রে লাফায় না। টুপি দিয়ে সে ভয় দেখিয়ে তাড়ায় মশার পাল আর মাঝে-মাঝে তার ফোগলা মুখে শিশ দেবার চেষ্টা করে গাইগুলোকে লক্ষ্য ক'রে, যাতে তারা পেছিয়ে না-পড়ে। জাবর কাটতে-কাটতে তারা দুলকি চালে এগোয়, ঘাসের শিশির ছিটকে তোলে গায়ে, আলো হ'য়ে আসছে। সে শুনতে পায় সান্ গাব্রিয়েলের দিন ফোটার ঘণ্টা, আর গোরুটা থেকে নেমে পড়ে, হাঁটু মুড়ে বসে মাটিতে, তার দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে দিয়ে ক্রুশের চিহ্ন বানায়। গাছের কোটর থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে ওঠে, তারপর এস্তেবান আবার লাফিয়ে উঠে পড়ে

গোরুর পিঠে, গা থেকে জামা খুলে নেয় যাতে হাওয়া চাবকে হটিয়ে দিতে পারে তার ভয়, আর ফের চলতে শুরু করে।

'এক, দুই···দশ', শহরের মুখে গোরুপাহারা পেরিয়ে যাবার সময় সে গোনে। একটার কান পাকড়ে ধরে সে, তার মুখটা টেনে ঘুরিয়ে বলে, 'এখন ওরা তোর বাছুরটাকে নিয়ে যাবে, ওরে হাঁদা! ইচ্ছে করে তো এইভাবেই চল, তবে আজকেই তুই তোর বাছুরকে শেষবারের মতো দেখতে পাবি।' গোরুটি শান্ত চোখে তার দিকে তাকায়, ল্যাজের ঝাপট মারে তার গায়ে, তারপর এগিয়ে যায়।

তারা সকালবেলার শেষ ঘণ্টা বাজাচ্ছে এখন।

এটা জানা নেই সোয়ালোগুলো আসে কোথা থেকে—হিকিলপান না সান্ গাব্রিয়েল থেকে; তবে তারা ছোঁ দিয়ে নামে, এঁকেবেঁকে ঘোরে সামনে-পিছনে, বুকশুদ্ধ ডুবিয়ে দেয় কাদাজলে, উড়াল না-থামিয়েই; তারা কেউ-কেউ ঠোঁটে ক'রে টুকিটাকি ব'য়ে নিয়ে যায়, তারা কাদার গা ঘেঁষে যায় ল্যাজের ডগা দিয়ে কাদা ছুঁয়ে, তারপরেই সোঁ ক'রে উড়ে যায়, রাস্তা থেকে দূরে, উধাও হ'য়ে যায় কালো দিগন্তে।

মেঘেরা এখন পাহাড়ের ওপর, এত দূরে যে তাদের দেখে মনে হয় ঐ নীল টিলাগুলোর ঢালে যেন এককেটা ধূসর পলেস্তারার টুকরো।

বুড়ো এস্তেবান তাকিয়ে ছাখে রঙেরা বিসর্পিল ঝ'রে পড়ছে আকাশের মধ্যে—লাল, কমলা, হলুদ। তারারা শাদা হ'য়ে যাচ্ছে। শেষ ঝিকিমিকিটাও নিভে যায় আর সূর্য ফেটে পড়ে, ঘাসের ডগাগুলোকে চকচকে ক'রে দেয়।

'বাইরে হাওয়ায় ছিলো ব'লে আমার খালি পেটটা ঠাণ্ডা ছিলো, এখন জানি না কেন। আমি সময়মতোই পৌঁছেছিলাম খোঁয়াড়ের দুয়ারে—ওরা আমার জন্যে দোর খোলেনি। যে-পাথরটা তুলে নিয়ে দরজায় ঘা দিচ্ছিলাম সেটা ভেঙে গেলো, তবু কেউ বেরিয়ে এলো না। তারপর আমার মনে হ'লো হয়তো আমার মালিক দোন হুস্তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি গোরুদের কিছুই বলিনি অথবা কোনো ব্যাখ্যাই দিইনি তাদের; আমি সটকে পড়েছিলাম যাতে তারা আমায় দেখতে না-পায় কিংবা পিছু না-নেয়। বেড়াটা কোনখানে নিচু হ'য়ে আছে খুঁজলাম, তারপর সেটা বেয়ে উঠে লাফিয়ে নামলাম অন্যপাশে, বাছুরগুলোর মধ্যে। আর যেই খিল তুলে দরজা খুলে দেবো, দেখি আমার মালিক দোন হুস্তো চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে আসছেন, ছুকরি মার্গারিতা তাঁর বুকে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে—আর আমাকে দেখতে না-পেয়েই খোঁয়াড় পেরিয়ে তিনি চ'লে গেলেন। আমি

দেয়ালের গায়ে লেপটে লুকিয়ে রইলাম, ঠিক জানি আমাকে উনি দেখতে পাননি। অন্তত তা-ই আমি ভেবেছিলাম।'

বুড়ো এস্তেবান এক-এক ক'রে গোরুগুলোকে ঢুকতে দিলে, তাদের দুধ দুইতে-দুইতে। শেষটার বেলায় দুধ দোয়া বাকি রইলো, সেই যার বাছুর নেই এখন, এখন যে একাই ষাটজনের মতো হাম্বা রব জুড়ে দিয়েছে, শেষটায় দয়ার বশে সে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলে।

'আচ্ছা, শেষবারের মতো,' সে তাকে বললে, 'ভালো ক'রে দেখে নে তোর বাছুরকে, গাটা চাট, এমনভাবে শেষ দেখা দেখে নে যেন মরতে চলেছে। তোর তো আবার বাচ্চা হবে, অথচ এই বড়োটাকে নিয়ে এখনও তোর কত আদিখ্যেতা।' আর, বাছুরটাকে: 'এখনই যত পারিস মজা ক'রে নে, কারণ ও আর তোর নেই; তুই দেখতেই পাবি যে এই দুধ নতুন দুধ, নতুন জন্মাবে যে-বাছুর তার জন্যে দুধ।' আর সে বাছুরটাকে ক'ষে লাথি ঝাড়লে যখন দেখলে যে চারটে বাঁট ধ'রেই সে চুষছে। 'তোর থোতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেবো আমি, হতচ্ছাড়া বন্দুকের বাচ্চা!'

'আর আমি তার নাকটাই ভেঙে দিতাম, যদি-না মালিক দোন হুস্তো কোত্থেকে উদয় হ'য়ে আমাকে শান্ত করার জন্যে লাথি কষাতেন। আমায় এমন ঠ্যাঙালেন যে আমি পাথরের মধ্যে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ি আর-কি, হাড়-গোড়গুলো সব যন্ত্রণায় মটমট করছে এমন ঠ্যাঙানি খেয়েছে। সেদিন সারাদিন ধ'রে, আমার মনে আছে, আমি ভারি দুর্বল বোধ করেছিলাম, নড়তে-চড়তে পারছিলাম না—যা ফুলে গিয়েছিলো গা-হাত-পা আর কী ভীষণ ব্যথা করছিলো—এখনও ব্যথাটা আছে।

'তারপর কী হ'লো? জানতেই পাইনি। আর আমি তাঁর জন্যে কাজ করিনি। অন্য-কারু জন্যেও নয়, কারণ তিনি সেদিনই মারা গিয়েছিলেন। কী, তুমি জানতে না? ওরা আমার বাড়ি এসেছিলো আমাকে বলতে, আমি তখন খাটিয়ায় চিৎপাত প'ড়ে আছি, আর আমার বুড়ি পুলটিশ লাগিয়ে ভেজা কাপড় বোলাচ্ছে গায়ে। ওরা আমায় খবরটা দিতে এসেছিলো। আর বলেছিলো আমিই নাকি তাঁকে খুন করেছি। লোকে নাকি সে-কথাই বলাবলি করছে। হ'তেও পারে, তবে আমার কিছু মনে নেই। তোমার কি মনে হয় না কাউকে খুন করলে একটা-না-একটা বলবার মতো চিহ্ন থেকে যেতো? নিশ্চয়ই যেতো, বিশেষত সে যদি তোমার মালিক হ'তো। তবে ওরা যেহেতু আমাকে এই

হাজতে রেখেছে তার মানে নিশ্চয়ই কিছু-একটা হবে। কিন্তু ভাখো, বাছুরটাকে আমি মারলাম আর মালিক আমার কাছে এলেন—এ-পর্যন্ত সবকিছুই খুব ভালো ক'রে মনে আছে, পরে সবকিছু কেমন যেন আবছা, ঝাপশা। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর যখন আমার খাটিয়ায় আমি জেগে উঠলাম দেখি পাশে আমার বুড়ি আমার যত্ন-আত্তি করছে—আমার সারা গায়ের জ্বালা আর ব্যথার জন্যে আমি যেন একটা বাচ্চা ছেলে হ'য়ে গিয়েছি, যেন আর এই ভাঙাচোরা বুড়ো মানুষ নই। আমি এমনকী বুড়িকে বলেছিলাম, "হয়েছে, এখন চুপ করো।" স্পষ্ট মনে পড়ে এই কথাই আমি তাকে বলেছিলাম; তা একটা লোককে খুন করলে আমার তা মনে থাকবে না কেন? অথচ, তবু, ওরা বলে আমি নাকি দোন হুস্তোকে খুন করেছি। তো, ওরা বলে আমি দোন হুস্তোকে খুন করেছি? কী, একটা পাথর দিয়ে অ্যাঁ? তা, হবেও বা, কারণ ওরা যদি বলতো ছুরি মেরে খুন করেছি সেটা পাগলের প্রলাপ হ'তো, কারণ ছেলেবেলার পর থেকে আমি কখনও সঙ্গে ছুরি নিয়ে বেরুইনি—আর আমি ছেলেমানুষ ছিলাম—সে এখন থেকে অনেক, অনেক, অ-নে-ক বছর আগে।'

...

হুস্তো ব্রাম্‌বিলা তার ভাগ্নী মার্গারিতাকে বিছানায় শোয়ালে, একটুও আওয়াজ যাতে না-হয় সে-সম্বন্ধে ভারি সজাগ। পাশের ঘরটাতেই তার বোন ঘুমোচ্ছে, আজ দু-বছর হ'লো পঙ্গু, নিশ্চল, একটা ছেঁড়া তেনার মতো শরীর, কিন্তু সারাক্ষণ জেগেই থাকে। সে শুধু ভোরবেলার দিকে একটু ঘুমোয়; তখন একেবারে মড়ার মতো ঘুমোয়।

সে জাগবে সূর্য বেরিয়ে এলে, এখন। যখন হুস্তো ব্রাম্‌বিলা মার্গারিতার ঘুমন্ত দেহ বিছানায় শুইয়ে দিলে, তখন তার বোন তার চোখ খুলতে শুরু করেছে। সে তার মেয়ের নিশ্বাস শুনতে পেলে, জিগেশ করলে: 'কাল রাতে তুই কোথায় ছিলি, মার্গারিতা?' আর চ্যাচামেচি শুরু হবার আগে যা কিনা মার্গারিতাকেও জাগিয়ে দেবে, হুস্তো ব্রাম্‌বিলা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

তখন সকাল ছ-টা বাজে।

সে খোঁয়াড়ে এলো বুড়ো এস্তেবানের জন্যে দরজা খুলে দিতে। চিলে-কোঠাতেও যাবার কথা সে ভেবেছিলো, বিছানাটা ঝেড়ে ঠিক করে দেবে ব'লে, যেখানে সে আর মার্গারিতা রাতটা কাটিয়েছে। 'পাদ্রি যদি এটা মানতে দেয়

তবে আমি ওকে বিয়ে করবো; কিন্তু আমি ঠিক জানি তাকে জিগেশ করলেই সে একটা হুলুস্থুল বাঁধিয়ে বসবে। সে বলবে এ হ'লো অনাচার আর আমাদের দুজনকেই ধর্মচ্যুত ক'রে একঘরে ক'রে দেবে। বরং গোপনই থাকুক ব্যাপারটা।' এই কথাই সে ভাবছিলো যখন সে দেখতে পেলে বুড়ো এস্তেবান বাছুরটাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে, তার শক্ত হাতে বাছুরটার মুখ চেপে ধ'রে তার মাথায় লাথি কষাচ্ছে। মনে হ'লো বাছুরটার পিঠ এর মধ্যেই ভেঙে গিয়েছে, কারণ সে তার পা দাপাচ্ছে মাটিতে, অথচ কিছুতেই পারছে না।

সে ছুটে গিয়ে বুড়োর ঘাড় ধ'রে তাকে পাথরের গায়ে ছুঁড়ে ফেললো, লাথি কষালো, চেঁচিয়ে এমন সব কথা তাকে বলতে লাগলো সে নিজেই জানতো না এমন খিস্তি সে উচ্চারণ করতে পারে। তারপর তার মনে হ'লো নিজেই বুঝি অজ্ঞান হ'য়ে যাবে, আর খোঁয়াড়ের বাঁধানো শানে চিৎপাত মাথা ঠুকে প'ড়ে গেলো। ওঠবার চেষ্টা করলে সে একবার, আবারও প'ড়ে গেলো, আর তৃতীয় বারে সে প'ড়েই রইলো নিশ্চল। যখন সে চোখ খোলবার চেষ্টা করলে এক মস্ত কালো মেঘ ঢেকে দিলে তার দৃষ্টি। কোনো ব্যথা লাগছিলো না তার, শুধু একটা কালো জিনিশ তার চিন্তাকে ঝাপশা ক'রে দিচ্ছে যতক্ষণ-না অস্পষ্টতা হ'য়ে উঠলো চরম, পুরোপুরি।

...

বুড়ো এস্তেবান যখন উঠে পড়লো সূর্য তখন ওপরে উঠে এসেছে। সে টলতে-টলতে চললো, কাৎরাতে-কাৎরাতে। ওরা জানতেও পারেনি কেমন ক'রে দরজা খুলতে পেরেছিলো, কেমন ক'রে বেরিয়ে এসেছিলো রাস্তায়। ওরা জানতেও পারেনি কেমন ক'রে সে পৌঁছেছিলো বাড়ি, দু-চোখ আঁটো ক'রে বোজা, সারা রাস্তায় ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের ছিটে ঢালতে-ঢালতে সে চলেছিলো। বাড়ি এসেই সে ধপ ক'রে শুয়ে পড়েছিলো খাটিয়ায় আর ঘুমিয়ে পড়েছিলো আবার।

তখন নিশ্চয়ই বেলা এগারোটা হবে, মার্গারিতা খোঁয়াড়ে ঢুকলো হুস্তো ব্রাম্‌বিলার খোঁজে, কাঁদতে-কাঁদতে, কারণ তার মা বিস্তর গালাগাল ও বক্তৃতার পর বলেছে সে হ'লো গিয়ে বেশ্যা।

সে হুস্তো ব্রাম্‌বিলাকে দেখতে পেলে মৃত।

...

'তা, ওরা বলে আমি তাঁকে মেরেছি। হবেও বা। কিন্তু তিনিও রাগের চোটেও মরতে পারেন। বড্ড বদমেজাজি ছিলেন, রগচটা। সবকিছু তাঁর

চোখে মন্দ ঠেকতো: খোঁয়াড়গুলো নোংরা, জলের জালায় জল নেই, গোরুগুলো হাড়জিরজিরে। সব তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিতো। আর আমি কেন হাড়-জিরজিরে হবো না যখন দু-বেলা খাওয়াই জোটে না। আমি তো সারা জীবনটাই তাঁর গোরু চরিয়ে কাটিয়েছি: তাদের হিকিলপান নিয়ে গেছি, সেখানে তিনি গোরু চরাবার মাঠ কিনেছিলেন; ওরা গোগ্রাসে পেটপুরে খাওয়া অব্দি অপেক্ষা করেছি, তারপর ভোর-ভোর আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। এ যেন এক অন্তহীন তীর্থযাত্রাই ছিলো।

'আর এখন ছাখো, কী হ'লো—ওরা আমায় হাজতে পুরেছে, আর আগামী হপ্তায় আমার বিচার করবে। কেন? না, আমি নাকি দোন হুস্তোকে খুন করেছি। আমার তা মনেই নেই—তবে তা হ'য়ে থাকতে পারে। হয়তো আমরা দুজনেই অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম আর বুঝতেই পারিনি যে পরস্পরকে খুন ক'রে ফেলেছি। এও হ'তে পারে। স্মৃতি, আমার এই বয়সে, অদ্ভুত সব রঙ্গ করে; সেইজন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি খুব-কিছু-একটা হারাবো না যদি তারা আমার সব চেৎভেদই খতম ক'রে দেয়—কারণ সে-আমার কীই বা অবশিষ্ট আছে? আর আমার আত্মার কথা বলছো – তা সেও আমি ঈশ্বরকেই সমর্পণ ক'রে দেবো।'

...

সান্ গাব্রিয়েলের ওপর আবার কুয়াশা জড়ো হ'তে শুরু করেছে। এখনও রোদ ঝলশাচ্ছে নীল পাহাড়গুলোয়। একটা বাদামি ঝোপ গ্রামটাকে ঢেকে দিলে তারপর অন্ধকার এলো। সে-রাত্তিরে তারা আলো জ্বালায়নি আর, শোকে, কারণ আলোগুলোরও মালিক ছিলেন তিনি—দোন হুস্তো। ভোর না-হওয়া অব্দি কুকুররা সারারাত ডুকরে-ডুকরে উঠলো। চার্চের রং-করা কাচ ভোর অব্দি মোমের আলোয় আলো হ'য়ে উঠলো, আর তারা মৃতদেহ ঘিরে নিশি জাগলো। মেয়েরা অস্বাভাবিক রিনরিনে গলায় রাত্তিরের অর্ধেক স্বপ্নের ঘোরে গাইলো: 'বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো যাতনাহত আত্মা'। আর চার্চের ঘণ্টা বাজলে সারা রাত, মৃতের উদ্দেশে, ভোর হওয়া অব্দি, যতক্ষণ-না দিনফোটার ঘণ্টা বেজে উঠে তাদের ঝমঝম আচমকা থামিয়ে দিলে।

নাতালিয়া আছড়ে ফ্যালে নিজেকে তার মায়ের কোলে, কেঁদে আকুল, নীরবে শুধু কেঁদেই যায়। কান্নাটা সে অনেকদিন ধ'রেই জমিয়ে রেখেছিলো, যতক্ষণ-না আজ আমরা ফিরে আসি সেন্‌সোন্‌ৎলায় আর সে দেখতে পায় তার মাকে, আর তার মনে হয় অবিশ্রাম সান্ত্বনা চাই তার।

কিন্তু ঐ যে দিনগুলো গেছে, যখন আমাদের এত-সব কঠিন কাজ করার ছিলো—তানিলোকে যখন আমাদের গোর দিতে হ'লো তাল্‌পার কবরখানায়, তখন আমাদের আশপাশে সাহায্য করবার বা সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ ছিলো না, কেউ না, যখন শুধু সে আর আমি, শুধু আমরা দুজনই একা-একা, দুজনের শক্তি জড়ো ক'রে কবর খুঁড়তে শুরু করি, চাপড়া-চাপড়া মাটি তুলি আমি হাত দিয়ে, তানিলোকে কবরের মধ্যে চট ক'রে লুকিয়ে ফেলবার জন্যে, যাতে সে আর লোককে ভয় দেখাতে না-পারে তার গন্ধ দিয়ে, এমনই মৃত্যুতে ভরা ছিলো তার গন্ধ—তখন কিন্তু সে কাঁদেনি।

পরেও না, ফেরার পথে সারারাত ধ'রে আমরা যখন হাঁটছিলাম, কোথাও না-জিরিয়ে, হাৎড়ে-হাৎড়ে পথ ক'রে নিয়ে যেন ঘুমের ঘোরে চলেছি, আচ্ছন্ন, আর এমনভাবে পা ফেলে-ফেলে পা টেনে-টেনে চলেছি যেন প্রত্যেকটি পদক্ষেপ মস্ত আঘাতের মতোই পড়ছে তানিলোর কবরের ওপর, তখন মনে হচ্ছিলো নাতালিয়া যেন কী-রকম শক্ত হ'য়ে উঠেছে, এমনভাবে বুকের মধ্যটা সে কঠিন ক'রে রেখেছে যাতে ভেতরে যা টগবগ ক'রে ফুটছে তাকে কিছুতেই টের পেতে না-হয়। একফোঁটাও চোখের জল সে ফ্যালেনি।

তারপর সে এসেছে এখানে, তার মায়ের কাছে শুধু কাঁদবে ব'লে, শুধু তাঁর মেজাজ খারাপ ক'রে দেবার জন্যে, যাতে তার মা বুঝতে পারেন যে সে কষ্ট পাচ্ছে, নিদারুণ কষ্ট, সেইসঙ্গে আমাদের সকলের মেজাজও বিগড়ে দিতে চাচ্ছে। আমার মনে হ'লো তার এই কান্না যেন চলেছে আমারও ভেতরে, যেন আমাদের দুজনের পাপের কাপড় নিংড়ে-দুমড়েই চোখের জল ঝরাচ্ছে।

কারণ ব্যাপারটা হয়েছে কী, নাতালিয়া আর আমি, আমরা দুজনে মিলেই

তানিলো সান্তোসকে খুন করেছি। আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে তাল্‌পা যাবার জন্যে উশকে দিয়েছিলাম, যাতে সে মরে। আর সে মরেছেও। আমরা জানতাম এতটা রাস্তার ধকল সে কিছুতেই সইতে পারবে না ; কিন্তু তবু, আমরা দুজনে মিলে তাকে প্রায় তাড়া ক'রেই চলেছিলাম ; ভেবেছিলাম, আমরা তাকে চিরকালের মতো সাবাড় ক'রে দেবো। আমরা তা-ই করেছি।

তাল্‌পা যাবার ভাবনাটা এসেছিলো আমার ভাই তানিলোর কাছ থেকেই। অন্য-কারু মাথায় খেলে যাবার আগেই ভাবনাটা ছিলো তার। কত বছর ধ'রেই সে আমাদের মিনতি করেছিলো তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সে যে কত বছর ধ'রে। সেই যেদিন সে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলো হাতে-পায়ে লাল-লাল ফোস্কা নিয়ে। আর পরে ফোস্কাগুলো হ'য়ে উঠলো ঘা যা থেকে রক্ত পড়ে না—শুধু একটা হলদেটে আঠালো রস যেন ঘন পরিস্রুত জলের মতো তা থেকে বেরিয়ে আসে। সেই সময় থেকে—আমার খুব ভালোই মনে আছে—সে বলতো সে কেমন ভয় খেয়ে গেছে, যে কিছুতেই তার আর সেরে-ওঠার উপায় নেই। সেইজন্যেই সে তাল্‌পার কুমারীর কাছে যেতে চাচ্ছিলো, যাতে তার দিকে একবার তাকিয়েই তিনি তাকে সারিয়ে তুলতে পারেন। যদিও এটা সে জানতো যে তাল্‌পা এখান থেকে অনেক দূরে আর দিনের বেলায় খটখটে রোদ্দুরে আর মার্চ মাসের রাত্তিরের কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, সে তবু যেতেই চাচ্ছিলো। তাল্‌পার কুমারীর থানে। ধন্য কুমারী সারিয়ে তুলবেন তার সেই ঘা যা কখনোই শুকোয় না। তিনিই জানেন কেমন ক'রে তা করতে হয়, ঘাগুলো ধুয়ে-পুঁছে, সব সাফ ক'রে টাটকা আর নতুন ক'রে দেয়া, যেন নতুন বৃষ্টি-পড়া শস্যখেত। একবার যদি সে তাঁর কাছে যেতে পারে, তার সব রোগব্যারাম সেরে যাবে, কিছুই তখন তাকে আর কষ্ট দেবে না—কিংবা আর-কখনো যন্ত্রণা দেবে না। এই কথাই সে ভেবেছিলো। আর এই ধারণাটাকেই নাতালিয়া আর আমি কুটোর মতো আঁকড়ে ধরেছিলাম যাতে তাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি। আমাকে তো তানিলোর সঙ্গে যেতে হবেই কারণ আমি তার ভাই। নাতালিয়াকেও তার সঙ্গে যেতে হবে কেননা সে তার বৌ। তাকে তো সাহায্য করতে হবে তানিলোকে, হাতে ধ'রে নিয়ে যেতে হবে তাকে, নিজের কাঁধে বইতে হবে তার শরীরের ভার—যাবার সময় সারাটা পথ, আর হয়তো ফেরার পথেও; আর সে তার আশায় ভর দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবে।

আগে থেকেই জানতাম ভেতরে-ভেতরে নাতালিয়া কী ভাবছে। কিছু-কিছু

তো জানি আমি নাতালিয়ার। জানি, যেমন, তার গোল পাগুলো, দুপুরবেলার রোদ্দুরে পাথর যেমন তেতে থাকে, তেমনি তেতে-ওঠা, তেমনি দৃঢ়; সেই পা দুটি কতদিন ধ'রে যে একা আছে! আমি তা জানতাম। অনেকবারই কাছাকাছি এসেছি আমরা, কিন্তু প্রতিবারই তানিলোর ছায়া আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে; আমাদের মনে হয়েছে তার খোশপাঁচড়ায় ভরা হাত আমাদের মাঝখানে ঢুকে প'ড়ে নাতালিয়াকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে যাতে নাতালিয়া সবসময়ে তার সেবা ক'রে যেতে পারে। আর যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিনই অবস্থাটা থাকবে এইরকম।

এখন আমি জানি যা ঘটেছে তার জন্যে নাতালিয়া বিষম দুঃখ পাচ্ছে। আমিও পাচ্ছি; কিন্তু সে তো আর আমাদের গ্লানি বা পাপবোধ থেকে রেহাই দেবে না—কিংবা শান্তিও দেবে না আর-কোনোদিন। এই ভেবে প্রবোধ পাওয়া যাবে না যে তানিলো এমনিতেই মরতো, কারণ তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছিলো, যে অতদূরে তালপায় গিয়ে কোনো লাভই হয়নি—কারণ এটা প্রায় নিশ্চিতই ছিলো যে সে সেখানে না-হ'লে এখানেই মরতো, হয়তো আরো কিছুকাল পরে, কারণ রাস্তায় যা কষ্ট পেয়েছে বেচারি, আর যত রক্ত পড়েছে ঘা থেকে, আর রাগ-টাগ সবকিছু—এইসব একজোট হ'য়েই তাকে আগেই সাবাড় ক'রে দিয়েছে। যেটা খারাপ তা হ'লো এটাই যে মাঝপথে, যখন সে আর যেতে চাচ্ছিলো না, যখন সে বুঝতে পেরেছিলো যে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না, যখন আমাদের বলেছিলো তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তখন আমরাই তাড়া দিয়েছিলাম, তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলাম। নাতালিয়া আর আমি। আমরা তাকে মাটি থেকে হ্যাঁচকা টেনে তুলেছি যাতে সে হেঁটেই চলে, বারে-বারে বলেছি এখন আর আমরা ফিরে যেতে পারি না।

'সেন্‌সোন্‌ৎলার চেয়ে তাল্‌পাই এখন কাছে,' এই কথাই আমরা তাকে বলেছি। কিন্তু তাল্‌পা ছিলো তখনও অনেক দূরে, অনেক দিন দূরে।

আমরা চেয়েছিলাম সে মরুক। এটা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে সেন্‌সোন্‌ৎলা থেকে রওনা হবার আগেই আমরা তা চেয়েছিলাম—তাল্‌পার রাস্তায় যত রাত কাটিয়েছি প্রতি রাত্রেই এটা আমরা চেয়েছি। এই ব্যাপারটা এখন আর আমরা বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু তখন আমরা তা-ই চেয়েছি। খুব ভালো মনে আছে আমার।

সে-রাতগুলোও আমার ভালো মনে আছে। প্রথমে আমরা কাঠকুটো

জালিয়ে কিছু আলো পেতাম। পরে আগুনটাকে নিভে যেতে দিতাম আমরা, তারপর নাতালিয়া আর আমি খুঁজে বার করতাম ছায়া, আকাশের আলো থেকে লুকোবার জন্যে, আশ্রয় নিতাম দেশগাঁয়ের নিঃসঙ্গতায়, তানিলোর চোখ থেকে দূরে, আর আমরা উধাও হ'য়ে যেতাম রাতের মধ্যে। আর সেই নিঃসঙ্গতা আমাদের ঠেলে নিয়ে আসতো পরস্পরের কাছে, নাতালিয়া তার শরীর ঠেলে দিতো আমার দু-বাহুর মধ্যে, বুকে, আর তাকে মুক্তি দিতো। তার মনে হ'তো সে যেন বিশ্রাম করছে, অনেক জ্বালার যেন উপশম হ'তো; অনেক কিছু ভুলে যেতো সে আর তারপর তার শরীর যখন গভীর আরাম আর উপশম পেতো সে ঘুমিয়ে পড়তো।

যে-মাটির ওপর আমরা শুতাম, সবসময় সব সময় তা গরম থাকতো। আর নাতালিয়ার শরীর, আমার ভাই তানিলোর বউয়ের শরীর, মুহূর্তে তেতে উঠতো মাটির গরমে। আর তারপর এই দুই তাপ একসঙ্গে পুড়তো, আর স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিতো যেন কাউকে। তারপর আমার হাত তাকে হাৎড়াতো, তার তেতে-রাঙা শরীরটার সবখানে ছুটতো হাতেরা, প্রথমে হালকা আলতো ছোঁয়া, কিন্তু তারপর জড়িয়ে ধরতো তাকে আঁটো ক'রে, যেন নিংড়ে তার শরীর থেকে রক্ত বার ক'রে নিয়ে আসবে। এইই হয়েছিলো বারে-বারে, আবার, আরো-একবার, রাতের পর রাত, যতক্ষণ-না ভোর আসতো আর ঠাণ্ডা হাওয়া নিভিয়ে দিতো আমাদের শরীরের আগুন। এইই করেছি, নাতালিয়া আর আমি, তাল্‌পার রাস্তার পাশে, যখন আমরা তানিলোকে নিয়ে গিয়েছিলাম যাতে কুমারী তার জ্বালাযন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারেন।

এখন সব শেষ হ'য়ে গেছে। এমনকী বেঁচে-থাকার যন্ত্রণা থেকেও তানিলো নিস্তার পেয়েছে। আর সে বলবে না বেঁচে-থাকা তার পক্ষে কী ভীষণ কষ্টকর, যখন তার শরীর এ-রকম বিষভরা, পচাজলে ভরা ভেতরটা, যে-পচাজল তার হাত-পায়ের প্রতিটি চিড় প্রতিটি ফাটল থেকে বেরিয়ে আসে। এত বড়ো-বড়ো সব ঘা, যা হা করে, আস্তে, খুবই আস্তে, তারপর বার ক'রে দেয় দুর্গন্ধে-ভরা হাওয়ার বুড়বুড়ি যা আমাদের এত ভয় খাইয়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু এখন যখন সে মারা গেছে সব বদ্‌লে গিয়েছে। এখন নাতালিয়া তার জন্যে কাঁদে, হয়তো এইজন্যে যে সে হয়তো দেখতে পাবে, যেখানেই সে থাকুক-না কেন, কেমন শোচনা ও অনুতাপে ভরা তার আত্মা। সে বলে সে নাকি এই গত ক-দিনে তানিলোর মুখ দেখেছে। তার শরীরের শুধু এই অংশটার জন্যেই

মমতা ছিলো নাতালিয়ার—তানিলোর মুখ, সবসময়েই ঘামে চকচকে, যন্ত্রণা সহ্য করবার চেষ্টায় সবসময়েই যা ঘামে ভেজা। নাতালিয়ার মনে হয় তার মুখের কাছে এসে পড়েছে এই মুখ, তার চুলে মুখ ডুবিয়েছে, মিনতি করছে তাকে, এমন-এক স্বরে যা সে প্রায় শুনতেই পায় না, ফিশফিশ ক'রে মিনতি করেছে তাকে সাহায্য করবার জন্যে। নাতালিয়া বলে তানিলো বলেছে, সে নাকি এখন, অবশেষে, সেরে গিয়েছে, আর তার কোনো জ্বালাযন্ত্রণা ব্যথাবেদনা নেই। 'এখন আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারবো, নাতালিয়া। তোমার সঙ্গে যাতে থাকতে পারি সেজন্যে সাহায্য করো আমায়,' নাতালিয়া বলে এই কথাই নাকি তানিলো তাকে বলেছে।

আমরা তখন সদ্য তাল্পা ছেড়ে বেরিয়েছি। সবেমাত্র তাকে কবর দিয়েছি আমরা, যে-গর্ত ওখানে খুঁড়েছিলাম তাকে গোর দেবার জন্যে তার গভীরে সবে তাকে আমরা রেখে এসেছি তখন।

সেই থেকে নাতালিয়া আমাকে ভুলেই গিয়েছে। আমি জানি কেমন ক'রে তার চোখ দুটো চকচক ক'রে উঠতো দিঘির ওপর জ্যোৎস্নার মতো। কিন্তু হঠাৎ তা মিইয়ে গিয়েছে, মুছে গিয়েছে সেই চাউনি, যেন তাকে কেউ মাটিতে থেঁৎলে দিয়েছে। আর যেন কিছুই তার চোখে পড়ে না এখন। তার কাছে একমাত্র যার অস্তিত্ব আছে সে তার তানিলো, যতদিন বেঁচে ছিলো ততদিন সে যার সেবা করেছে আর তার আয়ু শেষ হ'লে যাকে সে কবর দিয়েছে।

...

তাল্পা যাবার বড়ো রাস্তাটায় পৌঁছুতে আমাদের বিশদিন লেগেছিলো। তার আগে অব্দি আমরা তিনজনই শুধু ছিলাম, একলা; বড়ো রাস্তায় পড়বামাত্র সবখান-থেকে-আসা লোক দলে-দলে যোগ দিয়েছিলো আমাদের সঙ্গে, আমাদেরই মতো লোকজন, যারা অন্যসব ছোটো রাস্তা থেকে এসে পড়েছে এই চওড়া পথটায়, যেন কোনো নদীর স্রোত, আমাদের পেছিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। চারপাশ থেকে ঠেলাঠেলি ক'রে ঢুকছে, যেন আমরা তাদের সঙ্গে বাঁধা আছি ধুলোর সুতোয়। কারণ মাটি থেকে পাক-খেয়ে-খেয়ে উঁচুতে উড়ছিলো ফিনফিনে শাদা ধুলো, ঝাঁক-বাঁধা লোকজনের পায়ে-পায়ে ধুলো উড়ছিলো, ভুট্টার মিহি আঁশের মতো, তারপর আবার নেমে আসছিলো নিচে, অজস্র পায়ের বিশৃঙ্খল চলায় আবার উঠে আসছিলো ধুলো, তার ফলে সবসময় আমাদের ওপরে ছিলো

ধুলো, আমাদের নিচে ছিলো ধুলো। আর এই মাটির ওপরেই ছিলো খোলা আকাশ, ফাঁকা, নির্মেঘ, শুধু ধুলো আর ধুলো. কখনোই ছায়া দিতো না।

রাত অব্দি অপেক্ষা করতে হ'তো আমাদের রৌদ্র আর রাস্তার সেই শাদা আলোর কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

তারপর দিনগুলো লম্বা হ'তে শুরু করলো। আমরা সেন্‌সোন্‌ৎলা ছেড়েছিলাম ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ, আর এখন যখন আমরা মার্চের গোড়ায়, খুব ভোরেই সব আলো হ'য়ে ওঠে। রাত্তিরে চোখের পাতা বুজেছি কি বুজিনি অমনি সূর্য আমাদের জাগিয়ে দেয়, যে-সূর্য মাত্র একটু আগে ডুবেছিলো।

জীবন এত মন্থর আর এত উগ্র ঠেকেনি আগে আমার কাছে, সেই যখন আমরা টলতে-টলতে হাঁটছিলাম এত লোকের সঙ্গে, যেন আমরা পঙ্গপালের একটা ঝাঁক, রৌদ্রের মধ্যে গুটুলি পাকিয়ে গেছি, ধুলোর মেঘের মধ্যে কিলবিল ক'রে এগুচ্ছি যে-ধুলো সেই একই রাস্তায় চারপাশ থেকে আমাদের আটকে রেখেছে, খোঁয়াড়ে পুরে রেখেছে। ধুলোর পেছন-পেছন যায় আমাদের দৃষ্টি, ধুলোয় ঘা মারে, যেন কিছুর গায়ে ধাক্কা খেয়েছে ওরা, কিছুতেই তার মধ্য দিয়ে যেতে পারছে না। আর আকাশ সবসময়েই ধূসর, যেন কোনো ভারি ধূসর ছোপ আমাদের সবাইকে ওপর থেকে পিষে মারছে। শুধু মাঝে-মাঝে, যখন আমরা কোনো সোঁতা পেরুই, বা নদী, ধুলো একটু স'রে যায়। আমরা আমাদের জরাতুর কালো-হওয়া মাথাগুলো ডুবিয়ে দিই সবুজ জলে আর মুহূর্ত খানেক এক নীল ধোঁয়া, ঠাণ্ডায় যেমন তোমার মুখ থেকে ভাপকুয়াশা বেরিয়ে আসে তেমন, আমাদের সবাইকার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু একটু পরেই আমরা আবার দৃষ্টির বাইরে চ'লে যাই, মিশে যাই ধুলোর সঙ্গে, ধৌদ্র থেকে পরস্পরকে আড়াল দিই, রোদ্দুরের তাপ থেকে—যে-তাপ আমাদের সবাইকেই সহ্য ক'রে যেতে হবে।

একসময় না একসময় রাত আসবেই। শুধু তা-ই আমরা ভাবতাম: রাত আসবে, আর আমরা খানিকটা বিশ্রাম পাবো। এখন আমাদের দিন ফুঁড়েই চলতে হবে, তার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে যে ক'রে হোক, রৌদ্র আর উত্তাপ থেকে পালাবার জন্যে। তারপর আমরা থামবো—পরে। এখন আমাদের যা করতে হবে তা শুধু লেগে-থাকা, টলতে টলতে চলা, ধুঁকতে-ধুঁকতে চলা. আমাদেরই মতো অতজন লোকের পেছন-পেছন, আমাদেরই মতো আরো-কত লোকের সামনে দিয়ে, শুধু এটাই আমাদের ক'রে যেতে হবে। ক'রে চলতে

হবে। আমরা শুধু তখনই ভালো ক'রে বিশ্রাম পাবো যখন আমরা ম'রে যাবো।

এই কথাই নাতালিয়া আর আমি ভেবেছিলাম—আর হয়তো তানিলোও ভেবেছিলো—যখন আমরা তাল্‌পার বড়ো রাস্তা ধ'রে হেঁটে চলছিলাম, জলুশের মাঝখানে মিছিলের ভিড়ের মধ্য দিয়ে, কুমারীর থানে পৌঁছুতে চাচ্ছিলাম সকলের আগে, তিনি তাঁর অলৌকিক আর অঘটনের ঝুলি শূন্য ক'রে ফেলার আগেই।

কিন্তু তানিলোর দশা আরো-খারাপ হ'তে শুরু করলো। একটা সময় এলো যখন সে আর একপাও এগুতে চাইলো না। তার পায়ের মাংস ফেটে খুলে গিয়েছে, হা ক'রে আছে, রক্ত পড়তে শুরু করেছে। সে একটু ভালো না-হওয়া অব্দি আমরা তার সেবাশুশ্রূষা করলাম। কিন্তু সে মনস্থির ক'রে ফেলেছে আর একপাও এগুবে না।

'দিন দু-এক আমি এখানে ব'সে থাকবো, তারপর সেন্‌সোন্‌ৎলা ফিরে যাবো,' এই কথাই সে বললে আমাদের। কিন্তু নাতালিয়া আর আমি তাকে তা করতে দিতে চাইনি। আমাদের ভেতরে কিছু-একটা তানিলোর জন্যে কিছুতেই আমাদের দয়া বা করুণা বোধ করতে দিলে না। আমরা তাকে নিয়েই তাল্‌পা যেতে চাচ্ছিলাম, কেননা অন্তত সেই মুহূর্তেও তার মধ্যে প্রাণ ছিলো, আয়ু ছিলো। সেইজন্যেই কোহল দিয়ে তার পা মালিশ করতে-করতে—যাতে ফোলা ভাবটা ক'মে যায়—নাতালিয়া তাকে ওশকাতে লাগলো। তাকে বললো কেবল তাল্‌পার কুমারীই তাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন। তিনিই একমাত্র যিনি তাকে চিরকালের মতো ভালো ক'রে দিতে পারবেন। শুধু তিনি, তা ছাড়া আর-কেউ নয়। কিছু নয়। আরো অনেক কুমারী আছেন, কিন্তু তাল্‌পার কুমারীর মতো কেউ নন। এই কথাই নাতালিয়া তাকে বললে।

তখন তানিলো কেঁদে ফেলেছিলো, তার ঘামে-ভেজা মুখের মধ্যে সুতোর মতো ধারা তৈরি ক'রে দিলো চোখের জল, আর সে নিজেকে গাল দিলো, অভিশাপ দিলো কেন সে খারাপ হয়েছিলো। নাতালিয়া তার শাল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলো, আর আমরা দুজনে মিলে তাকে ধ'রে তুললাম, যাতে রাত নেমে-পড়ার আগে আরো-কিছু পথ সে এগিয়ে যেতে পারে।

কাজেই তাকে টেনে-হিঁচড়ে জোর ক'রেই তাকে নিয়ে গিয়ে আমরা পৌঁছেছিলাম তাল্‌পায়।

শেষ কয়েকদিন আমরাও ক্লান্ত হ'য়ে পড়তে শুরু করেছিলাম। নাতালিয়া আর আমার মনে হচ্ছিলো আমাদের পা যেন ভেঙে নুয়ে পড়ছে। যেন কিছু-একটা টেনে রাখতে চাচ্ছে আমাদের, আমাদের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে ভারি কোনো বোঝা। তানিলো আরো প'ড়ে-প'ড়ে যায়, আগের চাইতে বেশি, আমাদের তাকে তুলে ধ'রে কখনো এমনকী আমাদের পিঠে ক'রেও ব'য়ে নিয়ে যেতে হয়। হয়তো সেইজন্যেই আমাদের ও-রকম মনে হচ্ছিলো, গা-হাত-পা ঢিলে, হেঁটে চলবার আর-কোনো ইচ্ছেই যেন ভেতরে নেই। কিন্তু আমাদের পাশ কাটিয়ে যে-লোকজন যাচ্ছিলো তারাই আমাদের জোরে-জোরে হাঁটতে উশকে দিলে।

রাত্তিরে সেই ক্ষিপ্ত জগৎ যেন শান্ত হ'য়ে যায়। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কাঠকুটোর কুণ্ড ঝলশায়, আর আগুনের চারপাশে ঘিরে ব'সে তীর্থযাত্রীরা তাদের মালা জপে, আড়াআড়ি থাকে হাত বুকের ওপর, দৃষ্টি থাকে আকাশে, তাল্‌পার দিকে ফেরানো। আর তুমি শুনতে পেতে বাতাস কেমনভাবে তুলে নিচ্ছে সেই গুঞ্জন, মেশাচ্ছে একটার সঙ্গে আরেকটা, সবটা মিলে হ'য়ে ওঠে একটাই কোলাহলের আওয়াজ। একটু পরেই সবকিছু আস্তে-আস্তে চুপচাপ হ'য়ে আসে। মাঝরাত নাগাদ তুমি শুনতে পাবে দূরে কে যেন গান গাইছে। তারপর তুমি তোমার চোখ বুজে ফ্যালো, কোনো ঘুম আসে না, শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকো কখন ভোর হয়।

...

আমরা তাল্‌পায় পৌঁছেছিলাম সদাপ্রভুর স্তব গাইতে-গাইতে।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ আমরা রওনা হয়েছিলাম, এখন তাল্‌পায় এসে পৌঁছেছি মার্চের শেষে, যখন বিস্তর লোক ফিরতি পথে রওনা দিয়েছে। তানিলো তার মাথায় ঠিক করেছিলো অনুতাপ করবে, শোচনা করবে—সব শুধু সেইজন্যেই। যক্ষুনি সে দেখতে পেলে তাকে ঘিরে আছে ফণিমনসার পাতা-পরা লোকজন, পাতাগুলো ঝুলছে খ্রীস্টানদের পোশাকের অংসফলকের মতো, সে ঠিক করলে সেও ও-রকম কিছু করবে। সে তার দু-পা জামার হাতা দিয়ে বাঁধলে, যাতে তার পদক্ষেপ হ'য়ে ওঠে আরো-হতাশ, আরো-মরীয়া। তারপর সে চাইলে কাঁটার একটা মুকুট মাথায় পরবে। একটু পরে সে তার চোখে পট্টি বেঁধে নিলে, আর আরো পরে, পথের একেবারে শেষাশেষি, সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে, ঐভাবেই ঘষটে-ঘষটে, এগুলো, পেছনে হাত দুটি আড়াআড়ি বাঁধা; ফলে

যে-জিনিশটা ছিলো আমার ভাই তানিলো সান্তোস, সে যখন তাল্‌পায় পৌঁছুলো, সেই জিনিশটা তখন রক্তের শুকনো চাপ-চাপ প্রলেপে এমনভাবে ঢাকা যে হাওয়ায় সেটা একটা কটু গন্ধ ছড়িয়ে গেলো, যেমন ছড়ায় যখন কোনো মরা জন্তু যায় পথ দিয়ে।

যখন আমরা একটুও আশা করিনি তখন তাকে আমরা দেখতে পেলাম নাচিয়েদের মধ্যে। আমরা গোড়ায় প্রায় বুঝতেই পারিনি সে-ই হাতে একটা লম্বা ঝুমঝুমি নিয়ে তার জখম খালি পায়ে মাটিতে দাপাদাপি করছে। কী-রকম একটা তীব্র খ্যাপা ঘোরের মধ্যে আছে যেন সে, যেন সে ঝাঁকিয়ে বার ক'রে দিতে চাচ্ছে তার সব রাগ তার সব বিষ এতদিন ধ'রে ভেতরে-ভেতরে যা সে পুষে রেখেছে—কিংবা হয়তো আরো-একটুক্ষণ বাঁচবার জন্যে শেষ মরীয়া চেষ্টায় নেমেছে।

হয়তো নাচগুলো দেখেই তার মনে প'ড়ে গেছে প্রতি বছর সে তোলিমানে যেতো সদাপ্রভুর পুনরুত্থানের উৎসবে আর সারা রাত ধ'রে নেচেই চলতো যতক্ষণনা তার হাড়গোড় সব যেন জোড় থেকে খুলে আসতে চাইতো একটুও ক্লান্ত না-হ'য়েই। হয়তো সে-কথাই তার মনে প'ড়ে যাচ্ছিলো আর সে ফিরে পেতে চাচ্ছিলো সেই শক্তি একদিন যা তার ছিলো।

মুহূর্তের জন্যে নাতালিয়া আর আমি তাকে এইভাবে দেখলাম। পরক্ষণেই আমরা দেখলাম সে দু-হাত তুলে ধপ ক'রে প'ড়ে গেলো মাটিতে, তার রক্তমাখা দু-হাতে তখনও ঝুমঝুমি আওয়াজ ক'রে চলেছে। আমরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে বার ক'রে নিয়ে এলাম, যাতে অন্য নাচিয়েদের পায়ের তলায় সে থেঁৎলে না যায়, তাকে নিয়ে এলাম সেই খ্যাপা নাচিয়েদের দাপাদাপি থেকে যা হুড়কে পড়ে পাথরে, লাফঝাঁপ দেয় মাটিতে, কে পড়লো না পড়লো সেদিকে কোনো দৃক্‌পাত না-ক'রেই।

দু-পাশ থেকে আমরা তাকে ধ'রে আছি যেন সে নুলো ঠুঁটো কেউ, এইভাবে তাকে নিয়ে আমারা চার্চে গেলাম। তাল্‌পার কুমারীর ছোট্ট সোনালি মূর্তির সামনে নিজের পাশেই তাকে নতজানু ক'রে বসালে নাতালিয়া। আর তানিলো শুরু করলে প্রার্থনা, মস্ত বড়ো একফোঁটা চোখের জল বেরিয়ে এলো তার চোখ বেয়ে, যেন তার ভেতরে একেবারে গভীর থেকে উঠছে, ফোঁটা প'ড়ে নিভিয়ে দিলে তার হাতের মোমবাতিটা যেটা নাতালিয়া ধরিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু সে তা টেরও পেলে না; অন্য আরো অতগুলো মোমবাতির আলো তাকে

বুঝতেই দিলে না যে এখানে ঠিক কী ঘটেছে। সে নেভানো মোমবাতি হাতেই প্রার্থনা ক'রে চললো। চেঁচিয়ে, জোর গলায়, যাতে নিজেই শুনতে পায় যে সে প্রার্থনা করছে।

কিন্তু তাতে তার ভালো কিছু হ'লো না। সব সত্ত্বেও সে মরলো।

…'বেদনায় ভরপুর হৃদয়ে আমরা সকলে তাঁর কাছে একই বিনতি জানাই, আশায় মাখামাখি অনেক বিলাপ, অনেক মিনতি। বিলাপ কিংবা অশ্রুর কাছে তো তাঁর মমতা বধির নয়, কারণ কুমারী স্বয়ং আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই বেদনা পান। তিনি জানেন কী ক'রে মোচন ক'রে দিতে হয় সব কলঙ্ক, কেমন ক'রে হৃদয়কে কোমল ও শুদ্ধ ক'রে দিতে হয় যাতে তাঁর দয়া ও করুণা ও দান গ্রহণ করতে পারে। আমাদের কুমারী, আমাদের মাতা, যিনি আমাদের পাপের কোনো কথাই জানতে চান না, আমাদের পাপের জন্যে যিনি শুধু নিজেকেই দায়ী করেন, যিনি আমাদের তাঁর কোলে ক'রে রাখতে চান যাতে জীবন আমাদের কোনো ব্যথা না-দেয়, তিনি এখানেই আছেন, আমাদেরই সঙ্গে, দূর ক'রে দিচ্ছেন আমাদের শ্রান্তি, আমাদের আত্মার অসুখ, আমাদের কাঁটায়-ভরা শরীর, ক্ষতবিক্ষত ও কাকুতি কাতর। তিনি জানেন প্রতিদিন আমাদের অবস্থা আরো দৃঢ় ও বর্ধিত হয়, কেননা সে-আস্থা তৈরি হয় ত্যাগে, আত্মত্যাগে…'

বেদির ওপর থেকে এই কথাই বলছিলেন যাজক। তারপরে তিনি কথা বন্ধ করলে লোকেরা সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা শুরু ক'রে দিলে, এমন এক শোর তুলে যেন ধোঁয়ায় ভয় পেয়ে রাশি-রাশি ভিমরুল গুঞ্জন ধরেছে।

কিন্তু তানিলো আর শুনছিলো না যাজক কী বলছেন। সে স্থিরনিশ্চল হ'য়ে গিয়েছে, তার মাথাটা বিশ্রাম করছে দুই হাঁটুতে। আর যখন নাতালিয়া তাকে তোলবার জন্যে ধ'রে টান দিলে, সে ততক্ষণে ম'রে গিয়েছে।

বাইরে তুমি তখনও শুনতে পেতে নাচের আওয়াজ, ঢাক আর রামশিঙা, ঘণ্টার আর করতালের শব্দ আর সেই তখনই আমার মনখারাপ হ'য়ে গেলো। এত-সব জীবন্ত মানুষ দেখে, সেখানে, স্বয়ং কুমারীকে দেখে, সেখানে, আমাদের সামনেই, সেখানে, তিনি দাঁড়িয়ে, মুখে মৃদু হাসি, আর অন্যদিকে তানিলোকে ঐভাবে দেখে, সেখানে, মনে হ'লো সে যেন পথের কাঁটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে তা বিষণ্ণ ক'রে দিলে।

কিন্তু আমরা তো তাকে সেখানে মরতেই নিয়ে গিয়েছিলাম, আর সেই কথাটাই আমি কিছুতেই আর ভুলতে পারছি না।

এখন আমরা দুজনেই সেন্‌সোন্‌ৎলায়। তাকে ছাড়াই—তাকে ফেলে রেখেই—আমরা ফিরে এসেছি। আর নাতালিয়ার মা আমাকে কিছুই জিগেশ করেননি, আমার ভাই তানিলোকে নিয়ে আমি কী করেছি কিংবা অন্যকিছু,—কিছুই জিগেশ করেননি। নাতালিয়া তাঁর কাঁধে মুখ গুঁজে কেঁদে-কেঁদে আস্ত কাহিনীটাই ফাঁস ক'রে দিলে।

আমি টের পেতে শুরু করেছি যেন আমরা কোথাও গিয়েই পৌঁছুইনি যে, আমরা এখানে শুধু ক্ষণিকের জন্যেই পথে থেমে পড়েছি, তার পরেই আমরা আবার চলতে শুরু করবো। জানি না কোথায় যাবো, কিন্তু আমাদের চলতেই হবে, কারণ এখানে আমরা আমাদের অপরাধবোধ আর তানিলোর স্মৃতির বড্ড-বেশি কাছাকাছি আছি।

হয়তো যতক্ষণ-না আমরা পরস্পরকে ভয় পেতে শুরু করবো। তাল্‌পা থেকে ফেরবার সময় পথে যে একটাও কথা হয়নি তার মানে হয়তো তা-ই দাঁড়ায়। হয়তো তানিলোর শরীর আমাদের গায়েই লেপটে আছে, বড্ড-বেশি কাছে, যেমনভাবে সেটা ছড়ানো ছিলো ভাঁজ-খোলা ঘাসের মাদুরে, পেতাতেতে, ভেতরে-বাইরে ভনভন করছিলো নীল মাছির ঝাঁক, যেন তার মুখ থেকে নাকের ডাক হ'য়ে বেরিয়ে এসেছে ঐ ভনভন, যে-মুখটা আমরা অতভাবে সবরকম চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই বুজিয়ে দিতে পারিনি, মনে হচ্ছিলো সে যেন হা ক'রে সারাক্ষণ ঐভাবে শ্বাস টেনেই চলবে—কোনো শ্বাস না-পেলেও। সেই তানিলো, যে আর কোনো কষ্ট পাচ্ছে না, অথচ যাকে দেখাচ্ছে এখনও যেন ব্যথায় দুমড়ে আছে, হাত আর পা দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে, চোখ দুটো খোলা—যেন সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে নিজেরই মৃত্যুকে। আর এখানে-সেখানে তার সব ঘা থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় ঝ'রে পড়ছে এক হলদে জল, সেই বিকট গন্ধে ভরা যা ছড়িয়ে গিয়েছে সবখানে, যার স্বাদ পাও তোমার মুখে, যেন ঘন তিক্ত মধুর একটা দলা গ'লে গিয়ে মিশে যাচ্ছে তোমার রক্তে, তোমার প্রতিটি মুখভরা হাওয়া গেলার সঙ্গে-সঙ্গে।

অনুমান করি এখানে আমরা সেটাই বারে-বারে মনে ক'রে রাখছি—যে-তানিলোকে আমরা গোর দিয়েছি তাল্‌পার কবরখানায়, সেই তানিলো—যার মৃতদেহের ওপর আমরা মাটির চাপড়া আর পাথর ছড়িয়ে দিয়েছি, যাতে বুনো জন্তুরা এসে তাকে মাটি খুঁড়ে বার ক'রে না-নেয়,—আমাদের শুধু মনে আছে তার সেই অন্তহীন শেষ মুহূর্তটাই।

জ্বলন্ত প্রান্তর

ওরা গিয়ে খুন করেছে ক্ষিপ্ত সে-কুক্কুরী
অথচ তার বাচ্চাগুলো দিব্যি আছে আজও...
লোকগীতি

'ভিভা পেত্রোনিলো ফ্লোরেস!'

চীৎকারটা বার্‌রান্‌কার দেয়ালে-দেয়ালে ঘা খেয়ে উঠে এলো ওপরে, আমরা যেখানে ছিলাম। তারপর সে মিলিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ ধ'রে তলা থেকে ছুটে-আসা-হাওয়া জড়াজড়ি-করা গলার তুমুল শোরগোল নিয়ে এলো আমাদের কাছে, এমনই তার আওয়াজ যেন বন্যার জল ফেঁপে-ফুলে আছড়ে পড়ছে পাথুরে পরিসরে। তারপর, একই জায়গায় উৎপত্তি, এলো আরেকটা চীৎকার, বার্‌রান্‌কার[১] বাঁক থেকে দোমড়ানো, আবার প্রতিধ্বনিত হ'লো দেয়ালে-দেয়ালে আর আমাদের কাছে এসে যখন পৌঁছুলো, তখনও তার কী জোর: '¡ভিভা মি হেনেরাল পেত্রোনিলো ফ্লোরেস!'

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম।

লা পের্‌রা[২] আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ায়, বন্দুক থেকে বার ক'রে নেয় কার্তুজ, জামার পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। তারপর সে এসে দাঁড়ায় যেখানে ছিলো লোস্‌ কুয়াত্রোরা[৩], তাদের বলে, 'ছেলেরা, তোমরা আমার পেছন-পেছন এসো, গিয়ে দেখে আসি কোন-সে ষাঁড়গুলোর সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে।' চার বেনেভিদেস ভাই তার পেছন-পেছন হেঁটে যায়, ঝুঁকে, নুয়ে প'ড়ে; শুধু লা পের্‌রা কুচকাওয়াজ ক'রে এগোয় খুব আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, খাড়া, বেড়ার ওপরে তার রোগা শরীরটার আদ্ধেকটা দেখা যায়।

আমরা সেখানেই রইলাম, নিশ্চল। বেড়ার নিচে আমরা সার বেঁধে আছি, চিৎপাত, হাত-পা ছড়িয়ে, যেন একদল ইগুয়ানা রোদ পোহাচ্ছে।

পাথরের বেড়াটা সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে উঠেছে-নেমেছে পাহাড়গুলোয়, আর লা পের্‌রা আর চারজন বেনেভিদেসই এঁকেবেঁকে সাপের মতো চলেছে,

যেন তাদের পাগুলো সব একসঙ্গে বাঁধা। যখন আমাদের দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলো, তখন তাদের এইরকমই দেখাচ্ছিলো। তারপর আমরা মুখ ঘুরিয়ে আবার ওপরে তাকাই, তাকিয়ে দেখি নিচু-নিচু চিনাজামের গাছের ডাল, যেগুলো একটু ছায়া দিচ্ছে আমাদের।

এটাই-তার গন্ধ—ছায়া, রোদে তপ্ত। পচা চিনাজাম।

আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে দেয় দ্বিপ্রাহরিক তন্দ্রা।

ছোটো-ছোটো বিরতির পর নিচে থেকে বারুরান্কা বেয়ে উঠে আসে হৈ-হৈ, আর আমাদের শরীরগুলোকে এমনভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায় যে আমরা আর ঘুমোতে পারি না। আর যদিও আমরা কান খাড়া ক'রে শোনবার চেষ্টা করি, উৎকর্ণ, শুধু যেটা শুনতে পাই তা এই হৈ-হৈ, কোলাহলের একটা হিল্লোল, যেন কোনো পাথুরে রাস্তায় বলদে-টানা গাড়ি চলবার শব্দ শুনছি!

হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ। আওয়াজটার পুনরাবৃত্তি করলে বারুরান্কা, মনে হ'লো আস্ত বারুরান্কাই যেন ছিঁড়ে ফালি-ফালি হ'য়ে যাচ্ছে। আওয়াজটা সবকিছুকে জাগিয়ে দিলে: তোতোচিলো, সেই লাল পাখিগুলো যাদের আমরা দেখছিলাম চিনাজামের গাছে খেলা করতে, আর পঙ্গপালের দল—যারা দুপুরের খর উত্তাপে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, জেগে উঠলো—পৃথিবী ভ'রে দিলে তাদের তীক্ষ্ণ ঝিনঝিনে চীৎকারে।

'কী ওটা?' সিয়েস্তায়[৪] তখনও আদ্ধেক আচ্ছন্ন, জিগেশ করে পেদ্রো সামোরা।

তারপর এল্ চিউইলা উঠে দাঁড়ায়, তার বন্দুকটাকে টেনে—যেন সেটা একটা জ্বালানি কাঠ, তারপর যারা চ'লে গিয়েছে তাদের উদ্দেশে সে বেরিয়ে পড়ে।

'গিয়ে দেখছি কী ব্যাপার,' সে বলে, তারপর অন্যদের মতো দৃষ্টির বাইরে চ'লে যায়।

পঙ্গপালের ঝিনঝিনে ডাক বেড়ে যায়, শেষটায় মনে হয় যেন কানে তালা ধরিয়ে দেবে, আর আমরা টেরই পাইনি কখন তারা এসে ওখানে হাজির হয়েছিলো। যখন তাদের আমরা সবচেয়ে কম প্রত্যাশা করছি, তখনই, এই-তো তারা, এরই মধ্যে এসে হাজির, ঠিক আমাদের সামনে, আর আমরা সবাই অপ্রস্তুত। মনে হ'লো তারা শুধু এখানটা দিয়ে যাচ্ছিলো, এই মুখোমুখি পড়াটার জন্যে তারাও মোটেই তৈরি নয়।

আমরা ফিরে বন্দুকের তাগ-কোটর দিয়ে তাদের দিকে তাকালাম।

প্রথম দলটা চ'লে গেলো, তারপর দ্বিতীয়-একটা, তারপর আরো, তাদের শরীর সামনের দিকে নোয়ানো, তন্দ্রায় বেঁকে গিয়েছে। মুখগুলো চকচক করছে, ঘামে, যেন আরুরোইয়ো[৫] পেরিয়ে তারা জলে ঝাঁপ দিয়ে এসেছে।

তারা পাশ দিয়ে চলতেই থাকে—দলের পর দল।

সংকেত এলো। একটা লম্বা শিশের শব্দ, তারপর দূরে শুরু হ'য়ে যায় রাইফেলের ইয়াক-ইয়াক, যেদিকটায় লা পের্‌রা গিয়েছে। তারপর এখানেও গুলিগোলা শুরু হ'য়ে যায়।

দারুণ সহজ ছিলো। তারা যেন বন্দুকের তাগ-ফোকর আটকে দিয়েছে, এমন ঠাশাঠাশি ভিড়, ফলে এ যেন কাছে থেকে কেবল খটখট ক'রে ঘোড়া টিপে-যাওয়া, তারা কিছু টের পাবার আগেই তাদের প্রায় খোলামকুচির মতো পেড়ে ফেলা হচ্ছে।

কিন্তু এমন অবস্থা শুধু একটুক্ষণই থাকে—সম্ভবত প্রথমত দুই ঝাঁক গুলি চালানো অব্দি। শিগগিরই, বন্দুকের তাগের ফোকর দিয়ে যখন তাকাই, আমরা দেখতে পাই শুধু যারা রাস্তার মাঝখানে প'ড়ে আছে, আদ্ধেক-দোমড়ানো সব শরীর, যেন কেউ এসে ওদের ওখানে ছুঁড়ে ফেলে রেখে গেছে। তারপর তারা আবার উদয় হ'লো অতর্কিতে, পরক্ষণেই তারা কেউই আর এখানে নেই।

পরের দফা গুলি চালাবার আগে আমাদের অপেক্ষা করতে হ'লো।

আমাদের একজন চেঁচিয়ে ওঠে: '¡ ভিভা পেদ্রো সামোরা!'

অন্যদিক থেকে তারা সাড়া দেয়, প্রায় যেন ফিশফিশ ক'রে, 'বাঁচান আমায়, কত্তা! বাঁচান, সেনিওর! আতোচার ধন্য শিশু, প্রভু, বাঁচাও আমায়!'

পাখিরা উড়ে যায়। পাহাড় লক্ষ ক'রে উড়ে যায় ঝাঁকে-ঝাঁকে দোয়েল।

তৃতীয় দফার গুলি এলো আমাদের পেছন থেকে। তারা ছুঁড়েছে, আমরা লাফিয়ে বেড়ার ওপাশে চ'লে যাই, যাদের আমরা মেরেছি তাদের ডিঙিয়ে, ওপাশে।

তারপর আমরা ছুটতে শুরু করি, ঝোপের আড়ালে গা ঢেকে। আমাদের মনে হচ্ছিলো বুলেটগুলো যেন আমাদের ছুটন্ত পায়ের কাছে ফাটছে, মনে হচ্ছিলো আমরা যেন একঝাঁক ফড়িঙের ওপর এসে পড়েছি। আর মাঝে-মাঝে, ক্রমেই ঘন-ঘন, বুলেটগুলো আমাদের ঠিক গায়ে এসে লেগে আমাদের কাউকে পেড়ে ফ্যালে, হাড় ভাঙার আওয়াজ হয়।

আমরা ছুটি। বার্রান্‌কার কিনারে গিয়ে পৌঁছোই, আর তারপর কোনো দৃক্‌পাত না-ক'রে যে যেদিকে পারি নিজেকে গড়িয়ে দিই।

তারা তখনও গুলি ছুঁড়ছে। তারা গুলি ক'রেই চলে, যতক্ষণ-না আমরা হামাগুড়ি দিয়ে অন্যদিকে বেয়ে উঠি, যেন আলো দেখে আতঙ্কে ছুটছে একপাল ভোঁদড়।

...

মস্ত কতগুলো গোল পাথরের আড়ালে আমরা গুঁড়ি মেরে রইলাম, এতটা ছোটাছুটির পর এখনও আমরা ঘন-ঘন শ্বাস নিচ্ছি। আমরা শুধু পেদ্রো সামোরার দিকে তাকালাম, চোখে-চোখেই জিগেশ করলাম আচম্বিতে কী হ'লো আমাদের। কিন্তু সে, কিছু না ব'লেই, আমাদের দিকে তাকালে। যেন আমাদের সব কথাই ফুরিয়ে গিয়েছে কিংবা আমাদের জিভগুলো যেন গুটুলি পাকিয়ে গিয়েছে যেমন তোতাদের হয়, আর কিছু বলবার জন্যে সেই জট খুলতে গিয়ে আমাদের বিস্তর বেগ পেতে হ'লো।

তখনও পেদ্রো সামোরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে; সে আমাদের চোখ দিয়ে গুনছিলো, তার ঐ চোখদুটি দিয়ে, টকটকে লাল, যেন সে কখনও ঘুমোয়নি। সে আমাদের এক-এক ক'রে গুনলে। আমরা কতজন ছিলাম সেখানে তা সে ঠিকই জানে, তবু সে যেন এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হ'তে পারছে না; সেই জন্যেই সে বারে-বারে আমাদের গুনে দেখছে।

বেশ কয়েকজনেরই পাত্তা নেই—এগারো-বারোজন—লা পের্‌রা, এল্‌ চিউইলা এবং অন্য যারা তাদের সঙ্গে গিয়েছে তাদের হিশেবে না-ধ'রেই। এল্‌ চিউইলা হয়তো ওপরে কোথাও কোনো চিনেজাম গাছের আড়ালে গুঁড়ি মেরে আছে, বন্দুকের বাঁটের ওপর ভর দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে, অপেক্ষা করছে কখন ফেডারেল সেনারা এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চ'লে যায়।

লা পের্‌রার দুই ছেলে লাস্‌ হোসেসরাই প্রথম তাদের মাথা তুললে, তারপর তাদের শরীর। অবশেষে তারা একধার থেকে অন্যধারে হেঁটে গেলো, পেদ্রো সামোরা তাদের কী বলে শোনবার জন্যে তারা অপেক্ষা করছে। আর সে বললে, 'আরেকবার এমনতর জবাই হ'লেই আমাদের দফারফা!'

তারপর, তৎক্ষণাৎ, যেন একগাল রাগ গিলে ফেলতে গিয়ে খাবি খাচ্ছে, এমনভাবে সে লাস্‌ হোসেসদের দিকে চেঁচিয়ে বললে, 'আমি জানি তোমাদের

বাবার কোনো খোঁজ নেই, কিন্তু সবুর, আরেকটু সবুর করো! আমরা তার খোঁজে বেরুবো!'

ওপাশে, ওপরে, দূর থেকে একটা গুলির আওয়াজ একঝাঁক বাজপাখিকে অন্যপাশে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। পাখিরা বাবুরান্‌কার ওপর ছোঁ মেরে নামলে, আমাদের বেশ কাছেই ঝটপট করলে ডানা, তারপর আমাদের চোখে পড়তেই, ভয় পেয়ে গিয়ে, আধখানা পাক খেয়ে, রোদ্দুরে ঝলশালো, আর আবার অন্য-পাশের গাছগুলো তাদের কলরবে ভ'রে দিলো।

লাস্‌ হোসেসরা তাদের আগেকার জায়গায় ফিরে এলো, চুপচাপ, আবার উবু হ'য়ে বসলো।

সারা বিকেলটাই আমরা ওখানে থেকে গিয়েছিলাম। রাত নামতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গেই এল্‌ চিউইলা লোস্‌ কুয়াত্রোদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। তারা আমাদের বললে যে তারা নিচে থেকে আসছে, পিয়েদ্রা লিসা থেকে, কিন্তু ফেডারেলরা চ'লে গেছে কিনা সে-সম্বন্ধে তারা কিছুই বলতে পারলে না। সবকিছুই এমনিতে বেশ শান্ত ঠেকছে। মাঝে-মাঝে তুমি দূর থেকে শুনতে পাবে কয়োটির ডাক।

'শোনো, পিচোন!' পেদ্রো সামোরা আমায় বললে। 'আমি তোমার ওপর একটা কাজের ভার দিচ্ছি—লাস্‌ হোসেসদের সঙ্গে পিয়েদ্রা লিসায় গিয়ে দেখে এসো না লা পের্‌রার কী হ'লো। যদি সে ম'রে গিয়ে থাকে, হুম, তাহ'লে তাকে গোর দিয়ে এসো। অন্যদের বেলাতেও তা-ই কোরো। জখমদের ওপরে কোথাও তুলে রেখো যাতে সৈন্যরা তাদের দেখতে পায়, তবে কাউকেই সঙ্গে ক'রে ফিরিয়ে এনো না।'

'তা-ই করবো আমরা।'

আর আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

যেখানে আমরা ঘোড়াগুলোকে রেখে এসেছিলাম সেখানে আস্তাবলটায় পৌঁছুলে কয়োটির ডাক তুমি আরো কাছে থেকে শুনতে পেতে। একটাও আর ঘোড়া নেই সেখানে, শুধু একটা হাড়-জিরজিরে খচ্চর রয়েছে—আমরা এখানে আসার আগেও সে এই আস্তাবলটাতেই থাকতো। বলাই বাহুল্য, ফেডারেলরাই আমাদের সব ঘোড়া নিয়ে চ'লে গিয়েছে।

লোস্‌ কুয়াত্রোদের বাকিদের আমরা একটা ঝোপের আড়ালে আবিষ্কার করলাম, একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে আছে তিনজন, একজনের ওপর আরেকজন

চাপানো, স্তূপ-করা, যেন ঐভাবেই কেউ তাদের রেখে গিয়েছে। আমরা তাদের মাথা তুলে নিয়ে একটু ঝাঁকালাম এটাই দেখতে যে তাদের মধ্যে জীবনের কোনো লক্ষণ আছে কি না, কিন্তু না, তারা ম'রে পাথর হ'য়ে আছে। দ্রোণীটায় প'ড়ে আছে আমাদের দলের আরেকজন, তার পাঁজরগুলো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, যেন তাকে কোনো মাশেতে দিয়ে কোপানো হয়েছে। বেড়াটার আগাপাশতলা খুঁজে আমরা আরো কয়েকজনকে এখানে-ওখানে দেখতে পেলাম, প্রায় সকলেরই মুখ যেন কালিলেপা।

'ওরা সত্যিই এদের সাবাড় করেছে; এদের আর কোনো আশাই নেই,' বললে লোস্ হোসেসদের একজন।

অন্যদের দিকে কোনো দৃক্‌পাত না-ক'রে আমরা লা পেব্‌রারই খোঁজ করতে শুরু করলাম, শুধু বিখ্যাত পেব্‌রার সন্ধান চাচ্ছি। আমরা তাকে কোথাও পেলাম না।

'ওরা নিশ্চয়ই তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে,' আমরা ভাবলাম, 'ওরা নিশ্চয়ই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে সরকারবাহাদুরকে দেখাতে।' কিন্তু তা হ'লেও ঐ উবড়োখাবড়ো জমিতে আমরা তাকে খুঁজেই চললাম। আর কয়োটিরা সারাক্ষণ ডুকরে-ডুকরে ডাকলো।

তারা সারারাত ধ'রে ডুকরেই চললো।

কয়েকদিন পরে, এল্ আর্মেরিয়ায়, যেখানে তুমি নদী পেরোও, আমরা পেত্রোনিলো ফ্লোরেসের মুখোমুখি পড়লাম। পেছন ফিরতে গিয়ে দেখি ততক্ষণে বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে। যেন ওরা আমাদের গুলি ক'রে মারবে। পেদ্রো সামোরাই এগিয়ে গেলো, তার শাদা-ফুটফুট-পাটকিলে রঙের খচ্চরটার পেটে নালের ঠোক্কর মেরে সে গতি বাড়িয়ে দিলে তার, তার খচ্চরটার মতো সেরা জীব আমি আর একটাও দেখিনি। আর তার পেছন-পেছন, দল বেঁধে ছুটলাম আমরা, আমাদের ঘোড়ার ঘাড়ে ঝুঁকে, মুখ গুঁজে; জবাইটা সাংঘাতিক হ'লো। ঠিক তক্ষুনি অবশ্য আমি তার ভয়াবহতা টের পাইনি, কারণ আমি আমার মড়া ঘোড়াটার তলায় নদীতে ডুবে গিয়েছিলাম আর স্রোত আমাদের দুজনকেই অনেক দূর টেনে এনেছিলো, বালিভরা একটা অগভীর ডোবায়।

পেত্রোনিলো ফ্লোরেসের সৈন্যদের সঙ্গে সেই আমাদের শেষ লড়াই। তারপর আমরা যুদ্ধ ছেড়ে দিই। কিংবা, তুমি বলতে পারো, আমরা কিছুকাল কাটালাম যুদ্ধ না-ক'রেই, শুধু আত্মগোপন ক'রে থাকার চেষ্টা ক'রে; সেইজন্যেই আমাদের

মধ্যে যে-ক-জন তখনও বাকি ছিলো সবাই মিলে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়াই ঠিক করেছিলাম, তাড়া আর নির্যাতন থেকে রেহাই পাবার জন্যে পাহাড়ের ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। আর আমাদের শেষ হয়েছিলো এমনি সব ছোটো-ছোটো ছত্রভঙ্গ দলে যে কেউই আমাদের আর ভয় করতো না। এখন আর আমাদের দেখে কেউই চেঁচিয়ে পালায় না— 'ঐ রে, সামোরার দলবল এলো !'

মস্ত প্রান্তরটায় শান্তি ফিরে এসেছে আবার।

তবে বেশি দিনের জন্যে নয়।

আমরা প্রায় আটমাস তোসিন ক্যানিয়নের একটা গোপন আস্তানায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম, যেখানে আর্মেরিয়া নদী নয়ানজুলিটায় অনেকঘণ্টা বাক্সবন্দী হ'য়ে থাকার পর হুড়মুড় ক'রে নিচে গড়িয়ে নেমে উপকূলের দিকে ছোটে। আমরা ভেবেছিলাম জগতে ফিরে আসার আগে কয়েকটা বছর নিরুপদ্রবে কেটে যেতে দেবো, তখন আর আমাদের কথা কারুরই মনে থাকবে না। আমরা মুরগি পালতে শুরু করেছিলাম, মাঝে-মাঝে পাহাড়ের ওপর উঠে হরিণ মারি। আমাদের মধ্যে পাঁচজনই শুধু আছে, আসলে বরং চারজনই বলা যায়, কারণ লোস্ হোসেসদের একজনের পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়েছে, পাছার ঠিক তলায় গুলি ঢুকেছিলো যখন ওরা আমাদের তাগ ক'রে পেছন থেকে গুলি করছিলো।

তা, এইভাবেই আমরা আছি আর ভাবতে শুরু করেছি যে আমরা আর কোনোকিছুরই যোগ্য নই। আর ওরা যে আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাবে এটা যদি না-জানতাম, তবে আমরা শান্তির খোঁজে গিয়ে আত্মসমর্পণই করতাম।

কিন্তু এই সময়ে, কে-এক আর্মানসিও আলকালা— সে পেদ্রো সামোরার জন্যে খোঁজখবর চিঠিপত্তর নিয়ে আসতো —এসে হাজির হ'লো।

তখন সবে সকাল হয়েছে কি হয়নি, আমরা একটা গোরু মেরেছিলাম, সেটাকে তখন কাটতে ব্যস্ত, এমন সময় আমরা বাঁশির আওয়াজটা শুনতে পেলাম। প্রান্তরের দিক থেকে অনেক দূর থেকে শব্দটা আসছে। একটু পরেই আবার আওয়াজটা শোনা গেলো। যেন কোনো ষাঁড়ের হাম্বা ডাক—গোড়ায় রিনরিনে, তারপর গাঢ় ফ্যাশফেঁশে, শেষটায় আবার তীক্ষ্ণ। প্রতিধ্বনি সেটাকে টেনে ছড়িয়ে দিলে যতক্ষণ-না আওয়াজটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছুলো, তারপর নদীর কল্লোল সেটাকে চাপা দিয়ে দিলে। আর ঠিক যখন সূর্য বেরিয়ে আসবে এমন সময় সাইপ্রেস গাছগুলোর মধ্যে স্বয়ং আলকালা এসে উদিত হ'লো। তার

কাঁধে চুয়াল্লিশটা কার্তুজ সমেত দুটি কার্তুজের বেল্ট, আর তার ঘোড়ার পিঠে বাক্স-প্যাটরার মতো একপাহাড় রাইফেল ঝুলছে।

ঘোড়া থেকে নামে সে। আমাদের প্রত্যেককে একটা ক'রে রাইফেল দেয়, তারপর ফের ঘোড়ার পিঠে বাকি রাইফেলগুলো গুছিয়ে রাখে।

'যদি তোমাদের হাতে আজ আর কাল কোনো জরুরি কাজ না-থাকে তবে সান্ বুয়েনভেনতুরায় যাবার জন্যে তৈরি হ'য়ে নাও। পেদ্রো. সামোরা সেখানে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি এই ফাঁকে পাহাড়ের ঢাল ধ'রে আরেকটু দূর যাচ্ছি, লোস্ সানাতেস্‌দের খোঁজে। তারপর আমি ফিরে আসবো।'

পরের দিন সে ফিরে আসে শেষ বিকেলে। আর হাঁ, লোস্ সানাতেস্‌রাও তার সঙ্গে আছে। বিকেলের আবছা আলোয়ও তাদের কালো মুখগুলো তোমার চোখে পড়তো। তাদের সঙ্গে আরো কেউ-কেউও এসেছে যাদের আমরা চিনতাম না।

'রাস্তায় ঘোড়া জোগাড় ক'রে নেবো আমরা,' তারা আমাদের জানায়। আর আমরা তাদের পেছন-পেছন রওনা হই।

সান্ বুয়েনভেনতুরায় পৌঁছুবার অনেক আগেই আমরা টের পাই র‍্যান্‌চের বাড়িগুলোয় আগুন লেগেছে। আসিয়েন্দার গোলাবাড়িগুলো থেকেই দাউ-দাউ শিখা উঠেছে অনেক ওপরে, দেখে মনে হচ্ছে একটা তেলের পুকুরেই যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে। ফুলকি উড়ছে, শিখা পেঁচিয়ে উঠছে কালো আকাশে, মেঘগুলো মস্ত আলো ঝলশাচ্ছে।

আমরা এগিয়েই যেতে থাকি, কুজকাওয়াজ ক'রে, সান্ বুয়েনভেনতুরার দাবানলে উদ্দীপিত, যেন কিছু-একটা আমাদের ব'লে দিয়েছে যে এখানেই আমাদের কাজ; যা বাকি আছে তা সারতেই আমাদের আসা।

কিন্তু আমরা তখনও ওখানে গিয়ে উঠতে পারিনি, যখন ঘোড়ায়-চড়া প্রথম দলটার সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো—তারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, তাদের দড়িগুলো তাদের জিনের সামনেটায় বাঁধা, তাদের কেউ কেউ যে-সব লোকজন গুলি খেয়েছে তাদের টেনে আনছে, তবে এখনও কিছু দূর হাতে ভর দিয়ে যেতে পাবে। অন্যরা টেনে আনছে তাদের যাদের হাতগুলো এখন গেছে, যাদের মাথা নিচে ঝুঁকে পড়েছে।

আমরা তাকিয়ে-তাকিয়ে তাদের যাওয়া দেখি। অনেক পেছনে আসে

পেদ্রো সামোরা, আর ঘোড়ায় চ'ড়ে অনেক লোক। আগে যত লোক ছিলো তার চেয়ে ঢের বেশি। সেটা আমাদের খুশিই করে।

মস্ত প্রান্তরটা পেরিয়ে যাচ্ছে লোকজনের লম্বা সার, আবার; দেখে আমরা খুশিই হই, যেন আবার ফিরে এসেছে হারানো সুদিন, ঠিক যেমন ছিলো গোড়ায় যখন আমরা মাটি থেকে উঠে এসেছিলাম পাকা কাঁটাঝোপের মতো, হাওয়ায় দুলতে-দুলতে, সারা প্রান্তরটায় আতঙ্ক জাগিয়ে দিতে। আর এখন মনে হচ্ছে সেই দিনগুলোই আবার ফিরে আসছে।

...

সেখান থেকে সান্ পেদ্রোর দিকে আমরা ফেটে পড়েছি। আমরা সেখানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি, তারপর ছুটেছি পেতাকাল-এর উদ্দেশে; এ সেই সময় যখন ফসল তোলা হবে খেত থেকে, মকাই আর ভুট্টা; আর ভুট্টাখেতগুলো শুকিয়ে আছে আর প্রান্তরে বছরের এই সময়ে যে-প্রবল হাওয়া বয় তা নুইয়ে দিয়েছে ফসল। দেখতে ভারি ভালো লাগে। কাজেই খেত ধ'রে-ধ'রে যেমন ক'রে আগুন কুচকাওয়াজ ক'রে চ'লে যায়, সারা প্রান্তরটাই যেন এক দাবানলে জলন্ত কয়লার স্তূপ হ'য়ে ওঠে, ওপরে বুনে-বুনে পেঁচিয়ে ওঠে ধোঁয়া, যে-ধোঁয়া গন্ধ ছড়ায় আখ আর মধুরও, কারণ আগুন এতক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে আখের খেতগুলোতেও।

ধোঁয়া থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি একদঙ্গল কাকতাড়ুয়ার মতো, আমাদের মুখগুলো ঝুলকালিতে ভরা। হেথায়-হোথায় গোরুমোষগুলোকেও তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছি তাদের সবক-টাকে এক জায়গায় জড়ো ক'রে রাখার জন্যে – তারপর তাদের ছাল ছাড়ানো হবে। আমাদের ব্যাবসা এটাই – গোরুমোষের চামড়া। কারণ পেদ্রো সোমোরা যেহেতু আমাদের বলেছে, 'আমরা এই বিপ্লবকে গ'ড়ে তুলবো বড়োলোকদের টাকায়। অস্ত্রশস্ত্রের দাম, বিপ্লবের যাবতীয় খাই-খরচা বড়োলোকদেরই দিতে হবে। আর এখন যদি লড়াই করবার জন্যে কোনো বিশেষ ঝাণ্ডা আমাদের না-ও থাকে, আমাদের তাড়াহুড়ো ক'রে চটপট টাকার স্তূপ তৈরি করতে হবে, যাতে সরকারের ফৌজ যখন আসবে তারা দেখতে পাবে যে আমরা খুবই শক্তিশালী।' এই কথাই সে বলেছে।

আর অবশেষে যখন ফৌজ এসেছে, তারা আবার আমাদের মধ্যে লাগামছেঁড়া খুনকে ছেড়ে দিয়েছে, যেমন তারা আগেও করেছিলো, তবে আগেকার মতো

এতটা সহজে নয়। এখন ক্রোশ-ক্রোশ দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা আমাদের ভয় পাচ্ছে।

তবে আমরাও তাদের ভয় করি। তাদের জিনলাগানোর আওয়াজ পেলেই অথবা কোনো রাস্তায় পাথরের গায়ে তাদের ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ শুনলেই, যখন কিনা আমরা ঝোপেঝাড়ে আড়ালে ওৎ পেতে আছি আচমকা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে, এমনকী তখনও আমাদের বিচিগুলো কীভাবে গলায় আটকে যেতো সে এক দেখবার মতো দৃশ্য বটে। পাশ দিয়ে তারা যখন চ'লে যায় আমাদের মনে হয় তারা যেন আড়চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে চাচ্ছে: 'আমরা তোমাদের শুঁকে-শুঁকে বার ক'রে ফেলেছি, আমরা শুধু ভান করছি, ব্যাস, আর-কিছু নয়।'

সেই রকমই মনে হচ্ছিলো পুরো ব্যাপারটা, কারণ আচমকা তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে, তাদের ঘোড়াগুলোর আড়াল তাদের ঢাল, আর আমাদের তারা সেখানে ঠেকায়, আর এই ফাঁকে অন্যরা আমাদের ঘিরে ধরতে থাকে, আমাদের পাকড়ে ফ্যালে ফাঁদে-পড়া মুরগির মতো। সেই তখনই আমরা বুঝতে পেরে যাই আমরা আর বেশিক্ষণ টিঁকবো না—আমাদের দলে যদি অজস্র লোক থাকে, তবুও না।

তার কারণ এটাই যে এরা আর হেনেরাল উর্বানোর লোক নয় মোটেই, গোড়ায় তাদেরই আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যারা কিছু চ্যাচামেচি শুনলে বা টুপি নেড়ে সম্ভাষণ জানালেই ভির্মি খেয়ে যেতো; তারা ছিলো নতুন রংরুট, তাদের জোর ক'রে ধ'রে আনা হ'তো র‍্যান্‌চগুলো থেকে, তারা শুধু তখনই আমাদের ওপর হামলা করতে সাহস পেতো যদি দেখতো আমাদের দলে বেশি লোক নেই। এখন আর বাহিনীতে সে-রকম লোক নেই। পরে অন্যরা তাদের জায়গা নিয়েছে, আর এই হতচ্ছাড়াগুলো হচ্ছে সকলের অধম। এখন কে-এক ওলাচেয়া নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের, আর তার দলবল সাহসী, অনেক সইতে পারে, তেওকালতিচে থেকে তারা এসেছে, এই পাহাড়িরা, সঙ্গে আছে উত্তর থেকে আসা তেপেউয়ান ইণ্ডিয়ানরা—এই ইণ্ডিয়ানদের ভারি ভরাট মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দিনের পর দিন খাদ্য বিনাই চলতে তারা অভ্যস্ত, আর তারা কখনো-কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার ওপর নজর রাখতে পারে, চুপচাপ, অপলক চোখে, একবারও চোখের পাতা না-ফেলে, অপেক্ষা করতে পারে কখন তুমি তোমার মাথাটা তোলো, যাতে দেখবামাত্র তারা

গুলি করতে পারে, সরাসরি তোমাকে ভাগ ক'রে, ঐ দূরপাল্লার বন্দুকে ৩০-৩০ বুলেটে যেটা তোমার শিরদাঁড়া এমনভাবে চুরমার ক'রে দেয় যেন কোনো গাছের পচা ডাল ভেঙে পড়ছে।

কেন আমরা তবে এভাবে চলবো যখন অনেক সহজ কাজ ফেডেরাল বাহিনীর মোকাবিলা না-ক'রে অতর্কিতে র‍্যান্‌চগুলোয় ছোঁ মেরে পড়া? সেইজন্যেই আমরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেলাম, একবার ওখানে ঘা দিই, অরেকবার সেখানে ছোঁ মারি, তাতে আগের চাইতেও অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারি আমরা, সবসময়েই ছুটছি, গুলি ছুঁড়ছি, আর বনবন ঘুরছি খ্যাপা সব খচ্চরের মতো।

আর তাই, যখন আমাদের কেউ-কেউ আগ্নেয়গিরির ঢালে হাসমিন র‍্যান্‌চে আগুন ধরাচ্ছে, অন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দলছুট কোনো সামরিক বাহিনীর ওপর, সঙ্গে টেনে নিয়ে এসেছে উইসাচে গাছের ডালপালা, আওয়াজ তুলে তাদের ভাবাচ্ছে যে দলে অনেক লোক আছে আমাদের, লুকিয়ে, ধুলোর মেঘের আস্তরে ঢাকা, সমানে চেঁচিয়ে যাই আমরা।

অগত্যা সেনাদের তরফে অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কোনো উপায় ছিলো না। একসময় তারা এপাশ থেকে ওপাশ ছুটে গিয়েছে, সামনে পেছনে, খ্যাপার মতো। এখান থেকে তুমি দেখতে পেতে পাহাড়ের ওপর দাবানল, বিশাল সব আগুন যেন এমনকী ফাঁকা জায়গাকেও পোড়াচ্ছে। এখান থেকে আমরা দেখতে পাই সারাদিন দাউ-দাউ জ্বলছে র‍্যান্‌চগুলো, ছোটো-ছোটো গাঁ-গঞ্জ, কখনো-কখনো তুসামপিলা আর সাপোতিৎলানের তুলনায় বড়ো শহরও আকাশ আলো ক'রে দেয়। আর তখন ওলাচেয়ার বাহিনী সে-সব জায়গার উদ্দেশে হানা দেয়, জোর ক'রে কুচকাওয়াজ করায় দলের লোকদের, তবে যখন তারা সেখানে পৌঁছোয়, তোতোলিমিস্পা, অনেক দূরে এখানে, তাদের পেছনে, আগুন জ্বলতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

চমৎকার দৃশ্য বটে, চোখের পক্ষে ভারি তৃপ্তিকর। মেস্‌কিতে গাছের ঝোপঝাড় থেকে আচমকা বেরিয়ে এসে এই যা দেখা, বিশেষত যখন লড়বার জন্যে নিশপিশ করতে-করতে সৈন্যরা জায়গাটা ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, পেরিয়ে যাচ্ছে ফাঁকা প্রান্তর, কোনো শত্রু দুশমন কেউ কোথাও নেই ঢালে, যেন তারা ঝাঁপ খাচ্ছে গম্ভীর-কোনো তলবিহীন জলে, সেই বিশাল ঘোড়ার নালের মতো প্রান্তরে, যার গা ঘেঁষে উঠে গিয়েছে পাহাড়।

...

এল্ কোয়াস্তেকুমাতে পুড়িয়ে দিয়েছি আমরা, তারপর সেখানে ষাঁড়ের লড়াই খেলেছি। পেদ্রো সামোরার এ-খেলাটা ভারি পছন্দ।

ফেডেরাল বাহিনী গেছে আউৎলানের দিকে, লা পুরিফিকাসিওন ব'লে একটা জায়গার উদ্দেশে; তারা ভেবেছিলো আমরা যেখান থেকে এসেছি এটাই সেই জায়গা—দস্যুদলের গা-ঢাকা দিয়ে থাকার আস্তানা।. তারা চ'লে গেলো আর আমাদের একা রেখে গেলো এল্ কুয়াস্তেকুমাতেয়।

সেখানেই আমরা ষাঁড়ের লড়াই খেলবার সুযোগ পেয়েছি। তারা আটজন সৈন্যকে রেখে গিয়েছিলো পাহারায়, তাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলো তারা, তাছাড়া ছিলো অ্যাডমিনস্ট্রের আর আসিয়েন্দার সর্দার। আমরা দু-দিন ধ'রে ষাঁড়ের লড়াই খেললাম।

আমাদের একটা ছোট্ট গোল খোঁয়াড় বানাতে হয়েছিলো, সেই যে-রকম থাকে ছাগলদের রাখবার জন্যে, সেটাই আমাদের বুল রিং। আর আমরা ব'সে থাকি বেড়ায় যাতে লড়িয়েরা বেরুতে না-পারে, কারণ পেদ্রো সামোরার হাতের ক্ষুরটা দেখবামাত্র—এটা দিয়েই সে তাদের এফোঁড়-ওফোঁড় করবে—তারা সত্যি পাই-পাই ক'রে ছুটতে শুরু করে।

আটজন সৈন্য একটা বিকেলের পক্ষে ভালোই হ'লো। অন্য দুজন আরেকটা বিকেলের। আর যে-লোকটা সবচেয়ে ঝামেলা পাকিয়েছে সে ছিলো আসিয়েন্দার সর্দারটি, বাঁশের মতো ঢ্যাঙা আর রোগা, যে সবসময় নাগাল থেকে স'রে এসেছে পাশে একটু পিছলে গিয়ে। অন্যদিকে অ্যাডমিনস্ট্রেটর খতম হ'লো খেল শুরু হবামাত্রই। সে ছিলো দারুণ বেঁটে আর ভুঁড়োপেট, আর সে ক্ষুরের ঘা এড়াবার জন্যে কোনো ফন্দিফিকির আঁটেনি। সে শান্তভাবেই মরলো, প্রায় একপা-ও না-ন'ড়েই যেন সে নিজেই চাচ্ছিলো ক্ষুরের ঘা খেতে। কিন্তু ঝামেলা পাকিয়েছে সর্দারটিই।

পেদ্রো সামোরা তাদের দুজনকেই একটা ক'রে কম্বল দিয়েছিলো, আর সেইজন্যেই সর্দারটি ক্ষুরের ঘা থেকে নিজেকে এত ভালোভাবে বাঁচাতে পেরেছে, সেই ভারি পুরু কম্বলটার সাহায্যে; কারণ যখনই সে টের পেয়ে গিয়েছে কী ঘটছে, সে কম্বলটা নাড়িয়েছে সামনে, ক্ষুরটা তাকে লক্ষ্য ক'রে সোজা এগিয়ে আসবার সময় আর এইভাবে সে অনেকক্ষণ ক্ষুরের ঘা এড়িয়েছে, যতক্ষণ-না পেদ্রো সামোরা ব্যাপারটায় ক্লান্তি বোধ করলে। তুমি স্পষ্ট দেখতে পেতে

সর্দারটাকে ধাওয়া ক'রে-ক'রে সে কতটা হয়রান হ'য়ে পড়েছে, কয়েকটা আঁচড় কেটেছে বটে তবে সত্যিকার কোনো মোক্ষম ঘা বসাতে পারেনি, আর শেষটায় তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। সে কিন্তু তবু আরো-কিছুক্ষণ একই কৌশলে চালিয়ে গেলো, তারপর, অতর্কিতে, ষাঁড় যেমন ক'রে সোজা সামনের দিকে তেড়ে না-গিয়ে পাশ দিয়ে যায় তেমনিভাবে সে ক্ষুর দিয়ে সর্দারের পাঁজরের দিকে ঘা কষিয়েছে, আর অন্যহাতে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়েছে কম্বলটা, সর্দার টেরই পায়নি কী ঘটেছে, কারণ সে কম্বলটা নাড়াতেই থাকে, সামনে, ওপরনিচে, অনেকক্ষণ, যেন সে ভয় দেখিয়ে ভিমরুলদের তাড়াচ্ছে। সে শুধু তখনই নাড়াচাড়া থামিয়েছে যখন দেখেছে তার কোমর বেয়ে দরদর ক'রে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে। দেখেই সে ভয় পেয়ে গেছে, আঙুল দিয়ে পাশের গর্তটা বোজাবার চেষ্টা করেছে সে যেখান থেকে অমনভাবে লাল তরল বেরিয়ে আসছে, আর তাকে ফ্যাকাশে ক'রে তুলেছে, পাণ্ডুর, আর এখন গলগল ক'রে ধারার মতো বেরুচ্ছে রক্ত। তারপর সে খোঁয়াড়ের মাঝটায় থুবড়ে পড়েছে, আমাদের সকলের দিকে হা ক'রে তাকিয়ে থেকেছে। আর যতক্ষণ-না আমরা তাকে লটকে দিলাম ততক্ষণ ঐ ভাবেই প'ড়ে থেকেছে সে—লটকে না-দিলে মরতে সে অনেকক্ষণ সময় নিতো।

সেই থেকে পেদ্রো সামোরা আগাগোড়া ষাঁড় খেলে গিয়েছে, সুযোগ পাবামাত্রই।

ঐ সময়ে আমরা যারা ছিলাম প্রায় সবাই এসেছিলাম নিচের সমতল থেকে, পেদ্রো সামোরা থেকে দলের সবাই; পরে, অন্যান্য অঞ্চল থেকেও লোকজন এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো—সাকোয়ালকোর ফরশা সব ইণ্ডিয়ান, ঢ্যাঙা, লম্বা-লম্বা পা, ছানার তালের মতো মুখ, আর অন্যরা ঠাণ্ডা পাহাড়ি জায়গা মাসামিৎলার থেকে এসেছে, তারা সবসময় সারাপেস্ প'রে থাকতো যেন সারাক্ষণ গায়ে তুষার ঝরছে। গরমের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের খাবার ইচ্ছেও চ'লে গিয়েছিলো, আর সেই কারণেই পেদ্রো সামোরা তাদের পাঠিয়েছিলো আগ্নেয়-গিরিগুলোয় যাবার পথের গিরিসংকটের মুখে পাহারা দিতে, ঐ অনেক ওপরে, যেখানে শুধু বালি আর পাথর আর বালি, হাওয়া যাদের সবসময় ধোলাই ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ ফরশা ইণ্ডিয়ানরা অল্প দিনের মধ্যেই পেদ্রো সামোরার ভক্ত হ'য়ে উঠলো, তাকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাইলো না। সবসময় তারা আছে তার পায়ে পায়ে, তাকে রক্ষা করছে সব বিপদ-আপদ থেকে, সে তাদের যা

করতে বলেছে বন্দবামাত্র সব হুকুম তামিল ক'রে আসছে। মাঝে-মাঝে তারা এমনকী শহর থেকে সেরা সব মেয়েকেও ধ'রে নিয়ে আসতো তার ভোগে লাগাবার জন্যে।

আমার খুব ভালো মনে আছে সব। পাহাড়ে আমরা যত রাত কাটিয়েছি, কোনো আওয়াজ না-ক'রে সার বেঁধে চলেছি, আর ঘুমে প্রায় ঢুলে পড়েছি যখন ফৌজের লোকেরা আমাদের পেছনে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। আমি এখনও দেখতে পাই পেদ্রো সামোরা, তার গাঢ়-লাল কম্বলটা তার কাঁধের ওপর গোটানো, খেয়াল রাখছে যাতে কেউ পেছনে প'ড়ে না-থাকে: 'আরে, চ'লে এসো, পিত্তাসিও, নাল ঠোকো ঘোড়ার পিঠে! আর, খবরদার, আমার ঘাড়েই কিন্তু ঘুমিয়ে পোড়ো না, রেসেনদিস, কারণ তোমাকে আমি কথা বলবার জন্যে পাশে চাই!'

হ্যাঁ, সে আমাদের জন্যে নজর রাখতো, সজাগ। আমরা সার বেঁধে চলতাম মাঝরাত্তিরে, চোখগুলো সব ঘুমে ঢুলে পড়ছে, কেমন অভিভূত, মাথার ভেতর কোনো ভাবনা থাকতো না; কিন্তু সে আমাদের সবাইকেই জানতো, চিনতো, আমাদের সকলের সঙ্গেই কথা বলতো যাতে আমরা ঘুমিয়ে না-পড়ি। আমরা অনুভব করতাম তার সজাগ খোলা চোখগুলো, সেই চোখগুলো যারা কখনও ঘুমোয় না, যারা রাত্তিরেও দেখতে পায়, আমাদের প্রত্যেককে চিনতে পারে অন্ধকারে। সে আমাদের গুনতো, একজন-একজন ক'রে, যেন টাকা গুনছে। তারপর সে আমাদের পাশে আসতো, আমরা শুনতে পেতাম তার ঘোড়ার খুরের শব্দ, আর আমরা জানতাম তার চোখগুলো সবসময় সজাগ হ'য়ে আছে। সেইজন্যেই আমরা সবাই, কী-রকম ঠাণ্ডা লাগছে কতটা ঘুম পাচ্ছে সে-সম্বন্ধে ঘ্যানঘেনে নালিশ না-ক'রে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ ক'রে যেতাম অন্ধের মতো।

কিন্তু সবকিছু পুরোপুরি বিগড়ে গেলো, চুরমার হ'য়ে গেলো সাইউলা পাহাড়ে রেলগাড়ি উলটে যাবার পরে। তা যদি না ঘটতো পেদ্রো সামোরা হয়তো এখনও বেঁচে থাকতো এল্ চিনো আরিয়াস্ আর এল্ চিউইলা আর আরো অন্য কতজন, আর বিপ্লব তবে সমানে চলতো দিব্যি ফূর্তিসে, মজা লুঠে। কিন্তু সাইউলায় রেলগাড়ি ওলটাবার পরে পেদ্রো সামোরা পেলে সরকারের যাবতীয় রোষ।

আমি এখনও দেখতে পাই সেই ঝলশানি, দাউ-দাউ শিখা, যেখানে তারা মৃতদেহগুলোকে স্তূপ ক'রে রেখেছিলো। তারা শাবলের খোঁচায় একসঙ্গে জড়ো করেছিলো লাশগুলো, নয়তো পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিচ্ছিলো গাছের গুঁড়ির

মতো, আর যখন মৃতদেহের স্তূপ মস্ত হ'য়ে যেতো তখন তার ওপর পেট্রল ছড়িয়ে তারা আগুন ধরিয়ে দিতো। হাওয়ায় দুর্গন্ধটা ছড়িয়ে যেতো অনেক দূরে, আর অনেকদিন পরেও তুমি সেখানে সবসময় পোড়া মাংসের গন্ধ পেতে।

তার একটু আগে আমরা সত্যি জানতাম না কী ঘটতে চলেছে। আমরা গোরুর হাড়গোড় আর শিং ছড়িয়ে রেখেছি রেললাইনে, আর তাও যদি যথেষ্ট না-হ'তো, যেখানে লাইন বাঁক নিয়েছে সেখানে আমরা রেললাইনকে মুচড়ে বাঁকিয়ে ফাঁক ক'রে দিয়েছি। এ-সব করবার পর আমরা শুধু অপেক্ষা করেছি।

ভোর তখন সবে একটু-একটু আলো ক'রে দিতে শুরু করেছে সব। তুমি স্পষ্ট দেখতে পেতে বগিগুলোর ছাতে অব্দি কেমন জড়াজড়ি ক'রে আছে লোকজন এত ভিড়। তুমি এমনকী শুনতেও পেতে যে তাদের কেউ-কেউ গান গাইছে। নারী আর পুরুষের গলা। আমাদের সামনে দিয়ে তারা যখন চ'লে গেলো তখনও রাতের আধখানা ছায়ায় ঢাকা, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তারা সবাই ছিলো সৈন্য, সঙ্গে তাদের মেয়েরা। আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছি। ট্রেন থামেনি।

আমরা যদি চাইতাম আমরা অনায়াসে ট্রেন লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তে পারতাম, এমন হাঁসফাঁশ করতে-করতে টিকিয়ে-টিকিয়ে চলেছিলো সেটা, যেন কেমন কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে সেটা কোনোমতে পাহাড়ে উঠতে চাচ্ছে—কেমন যেন হেঁচকি তুলতে-তুলতে উঠছে। আমরা এমনকী তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে পারতাম ইচ্ছে করলে। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হ'য়ে গেলো।

তাদের যে কী হ'তে চলেছে সেটা তারা টের পেতে শুরু করেছিলো যখন তারা দেখেছিলো বগিগুলো কাৎ হচ্ছে, দুলছে, ট্রেনটা এমনভাবে দোলা খাচ্ছে যেন সেটাকে ধ'রে কেউ ঝাঁকাচ্ছে। তারপর ট্রেনের এনজিনটা পেছিয়ে নেমে এলো, ভারি-ভারি লোকভর্তি পেছনের বগিগুলোর টানে। এনজিন থেকে বেরিয়ে এলো কেমন ফ্যাশফেশে, করুণ, দীর্ঘবিলম্বিত বাঁশির শব্দ। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করলে না। সেটা গড়িয়ে পেছিয়ে আসতে লাগলো, সেই বিশাল ট্রেনের পেছনের বগিগুলোর টানে, যার শেষটা তুমি দেখতেও পেতে না এমন বিশাল ট্রেন নেমে এলো গড়িয়ে যতক্ষণ-না তার নিচে থেকে সমতল জমি স'রে গেলো, আর কাৎ হ'য়ে সেটা গড়িয়ে পড়লো বারান্‌কার একেবারে তলায়। তারপর বগিগুলোও তার অনুসরণ করলো, একটার পর একটা, প্রত্যেকটাই

গড়িয়ে পড়ছে নিচে, সরাসরি তার নিজের জায়গায়, টুকরো-টুকরো। পরে সবকিছু শান্ত স্থির হ'য়ে গিয়েছিলো—যেন সকলেই, আমরা শুদ্ধ, সকলেই মারা গেছে।

এইভাবেই ঘটেছিলো ব্যাপারটা।

যখন, যারা বেঁচে গিয়েছিলো তারা চুরমার কামরাগুলো থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করলে, আমরা সেখান থেকে স'রে পড়েছিলাম, আতঙ্কে আড়ষ্ট।

কয়েকদিন আমরা গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম, কিন্তু ফেডেরাল বাহিনী এলো আমাদের ঝেঁটিয়ে বার ক'রে আনবার জন্যে। আর তারা আমাদের ছেড়ে দিলে না, এমনকী কোথাও ব'সে যে শুকনো জারানো মাংস চিবুবো, তার অব্দি ফুরসৎ দিলে না—সবসময় পেছন-পেছন। তারা খেয়াল রাখলে যাতে আমরা খাবার বা ঘুমোবার সময় আর না পাই—আর দিন আর রাত্রি দুইই আমাদের কাছে এক হ'য়ে গেলো। আমরা চেষ্টা করলাম তোসিন ক্যানিয়নে পৌঁছুতে, কিন্তু সরকারের বাহিনী আমাদের আগেই সেখানে গিয়ে হাজির। আমরা আগ্নেয়-গিরিটার গা ঘেঁষে চারপাশে গিয়েছি। আমরা চড়েছি এমনকী সবচেয়ে উঁচু পাহাড়গুলোর চুড়োয়। আর সেই-যে জায়গাটা যার নাম এল্ কামিনো দে দিওস, গিয়ে দেখি সরকারি বাহিনী আমাদের সবাইকে সাবাড় করে দেবার জন্যে, ঘায়েল ক'রে দেবার জন্যে, গুলি ছুঁড়ছে। বুলেটগুলো আমাদের ঝাঁঝরা ক'রে গেলো, আমাদের চারপাশে হাওয়াকে অব্দি গরম করে দিলে। আর এমনকী যে-সব পাথরের আড়ালে আমরা আশ্রয় নিতে চেয়েছি সেগুলো পর্যন্ত একটার পর একটা গুঁড়ো হ'য়ে যেতে লাগলো যেন তারা নিছক কাদামাটির ডেলা। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যা দিয়ে তারা আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়ছিলো সেগুলো ছিলো মেশিনগান যা তোমার শরীরটাকে ঝাঁঝরির মতো ফুটো-ফুটো ক'রে যায়, কিন্তু তখন আমরা ভেবেছিলাম যে সেখানে বুঝি অনেক সৈন্য এসে জড়ো হয়েছে, হাজার-হাজার, আর আমরা শুধু চাচ্ছিলাম যে কোনোমতে তাদের কাছ থেকে স'রে পড়তে।

আমাদের মধ্যে যারা স'রে পড়তে পেরেছিলো। এল্ চিউইলা র'য়ে গেলো এল্ কামিনো দে দিওসে, একটা মাদ্রোনে গাছের পেছনে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে, ঘাড়ে কম্বলটা জড়ানো, যেন শীতের হামলা থেকে সে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সে সেখানে শুয়ে রইলো, চোখ খোলা, যেন তাকিয়ে দেখছে এক-এক ক'রে

আমরা কারা চ'লে যাচ্ছি, তার মৃত্যুকে ভাগাভাগি ক'রে নিচ্ছি নিজেদের মধ্যে। আর মনে হচ্ছিলো সে যেন আমাদের লক্ষ্য ক'রে হাসছে, দাঁত বের-করা, রক্তের ছোপে লাল।

যেভাবে আমরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়েছিলাম আমাদের কারু-কারু পক্ষে সেটা শাপে বরই হয়েছিলো, কিন্তু অন্যদের পক্ষে সেটা ছিলো ভয়ংকর অভিশাপ, যদি আমরা রাস্তায় আমাদের কাউকে গাছের ডাল থেকে পা দুটো শূন্যে মুণ্ডু নিচে ঝুলতে না-দেখতাম তাহ'লেই আশ্চর্য লাগতো। তারা সেইভাবেই র'য়ে গেলো গাছের ডালে-ডালে, সেইভাবেই বুড়ো হ'য়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে গেলো, ঠিকমতো না-শুকোনো চামড়ার মতো। শকুনরা খেলে তাদের ভেতর, নাড়িভুঁড়ি কলজে পাকস্থলি, সবকিছু, শুধু খোলশটাই রেখে গেলো তারা। আর যেহেতু তারা ঝোলানো ছিলো অনেক ওপরে, তারা সেখানেই র'য়ে গেলো অনেক অনেকদিন হাওয়ায় সরসর ক'রে মর্মর তুলে, মাসের পর মাস কখনো, মাঝে-মাঝে শুধু পাৎলুনের ফালি ছাড়া আর-কিছুই দুলতো না হাওয়ায়, যেন কেউ তাদের রোদে শুকোবার জন্যে মেলে দিয়ে গেছে। আর এ-রকম দৃশ্য দেখলে তুমি বুঝতে পারতে যে সবকিছু কেমন সাংঘাতিক হ'য়ে উঠেছিলো।

আমাদের কেউ-কেউ বড়ো পাহাড়টা অব্দি গিয়েছিলো আর সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে যেতে-যেতে আমরা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাতাম, নিচের সেই উপত্যকার দিকে তাকিয়ে, যেখানে একদিন আমাদের জন্ম হয়েছিলো, যেখানে একদিন আমরা থেকেছি, যেখানে এখন তারা অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের একেবারে সাবাড় ক'রে দেবার জন্যে। মাঝে-মাঝে এমনকী মেঘের ছায়াও আমাদের আতঙ্কিত ক'রে তুলতো।

কাউকে যদি বলতে পারতাম যে আমরা আর লড়াইবাজ লোক নই, আমাদের তারা শান্তিতে থাকতে দিক, তাহ'লে খুশি হতাম, কিন্তু আমরা এ-দলে ও-দলে এত ক্ষতি করেছি যে সাধারণ লোকে শুদ্ধ আমাদের বিরুদ্ধে চ'লে গিয়েছিলো, আর আমরা শুধু শত্রুই বানিয়েছি, আর-কিছুই করিনি। এমনকী ওপরের ঐ ইণ্ডিয়ানরা শুদ্ধ আমাদের আর পছন্দ করতো না। তাদের অভিযোগ আমরা তাদের জীবজন্তু মেরেছি। আর এখন তারা সশস্ত্র হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, সরকার থেকেই তাদের এই অস্ত্র দিয়েছে, আর তারা আমাদের খবর পাঠালে যে আমাদের তারা দেখতে পেলেই খতম করবে : 'আমরা

তোমাদের দেখতেও চাই না—দেখতে পেলেই আমরা তোমাদের মেরে ফেলবো,' এই তারা বললে শুধু।

ফলে পৃথিবীতে প্রায় কোথাও নেই যেখানে আমরা যেতে পারি। এমনকী গোর দেবার মতো জমিটুকুও আমাদের নেই। সেইজন্যেই আমাদের শেষজন ঠিক করলে আলাদা পথ ধরবে, যে যার নিজের পথে উলটো দিকে যাবে।

...

পেদ্রো সামোরার সঙ্গে পাঁচ বছর কাটিয়েছিলাম আমি। সুদিন, কুদিন—সব মিলিয়ে মোটমাট পাঁচ বছর। তারপর তাকে আর দেখিনি। তারা বলে সে নাকি মেহিকোনগরীতে গিয়েছিলো এক মেয়ের পেছন-পেছন আর সেখানে সে খুন হয়েছে। আমাদের কেউ-কেউ এখনও অপেক্ষা ক'রে আছি কবে সে ফিরে আসে, কিন্তু শেষে অপেক্ষা করতে-করতেই আমরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়লাম। সে এখনও ফিরে আসেনি। সে ওখানেই খুন হয়েছে। আমার সঙ্গে হাজতে ছিলো একটা লোক, সে আমাকে বলেছে ওকে তাদের খুন করার কথা।

আমি জেল থেকে বেরিয়েছি তিন বছর আগে। তারা আমাকে অনেক-রকম দুষ্কর্মের জন্যে সাজা দিয়েছিলো। পেদ্রো সামোরার দলের একজন ব'লে নয়। তারা সে-কথা জানতো না। তারা আমাকে অন্য অনেক দুষ্কর্মের জন্যে ধরেছিলো, তার মধ্যে একটা ছিলো মেয়েদের ধ'রে নিয়ে যাবার বদভ্যেস। এখন সেই মেয়েদেরই একজন আমার সঙ্গে থাকে, হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী সে, সবচেয়ে ভালো মেয়ে—সেই যে এসে দাঁড়িয়েছিলো আমার জন্যে, জেলখানার বাইরে, কবে আমাকে ছেড়ে দেয় এই ভেবে কতদিন যে অপেক্ষা ক'রে ছিলো সে আমার জানা নেই।

'পিচোন*, আমি তোমার জন্যে ব'সে আছি,' সে বলেছিলো আমায়। 'তোমার জন্যে আমি অনেকদিন ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছি।'

আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি আমাকে খুন করবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আবছাভাবে, যেন একটা স্বপ্ন, আমার মনে পড়েছিলো সে কে। আবার আমি যেন অনুভব করেছিলাম তুফানের সেই ঠাণ্ডা মুষল জল যে-রাতে আমরা ঢুকেছিলাম তেলকাম্পানায় আর লুঠপাট চালিয়েছিলাম শহরে। আমি প্রায় নিশ্চিত জানি তার বাবা হ'লো সেই বুড়োটা যাকে আমরা তার চিরবিশ্রামে পাঠিয়েছিলাম, আমরা চ'লে আসার সময় আমাদের একজন তার মাথায় গুলি

করে আর আমি তখন তার মেয়েকে হ্যাঁচকা টানে টেনে তুলেছিলাম আমার ঘোড়ার জিনে, আর তাকে বেশ কয়েক দফা মেরেছিলাম যাতে সে ঠাণ্ডা হয়, আমাকে আর না-কামড়ায় তার দাঁতে। বাচ্চা মেয়ে ছিলো, বছর চোদ্দ বয়েস, সুন্দর ডাগর চোখ, যথেষ্ট লড়াই করেছিলো সে, তাকে পোষ মানাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো আমায়।

'তোমার এক ছেলে হয়েছে আমার পেটে,' সে তখন বলেছিলো। 'ঐ যে সে।'

আর সে আঙুল তুলে দেখিয়েছিলো ঢ্যাঙা এক চিমশেমতো ছেলেকে, ভীরু-ভীরু চোখ: 'মাথার টুপি খুলে নে, তবেই তোর বাবা তোকে দেখতে পারবে।' আর ছেলেটি তার মাথার টুপি খুলে নিয়েছিলো। ঠিক আমারই মতো সে, চোখে আমারই মতো কঠিন, নিষ্ঠুর একটা চাউনি। বাবার কাছ থেকেই এটা সে পেয়েছে।

'একেও ওরা "এল্ পিচোন" বলে,' মেয়েটি, যে এখন আমার বৌ, বলেছিলো। 'কিন্তু ও কোনো দস্যু বা খুনে নয়। ও ভালো ছেলে।' শুনে আমি আমার মাথা নিচু করেছি।

১ বার্‌রানকা : নয়ানজুলি, খাদ, ravine, গিরিদরি।
২ পের্‌রা : কুত্তি, ডালকুত্তো।
৩ কুয়াত্রোরা : চার, চতুষ্টয়। লোস্ কুয়াত্রোরা : (এখানে) চার ভাই।
৪ সিয়েস্তা : দিবানিদ্রা।
৫ আর্‌রোইয়ো : সোঁতা, ঝরনা, জলপথ, নর্দমা।
৬ পিয়েদ্রা লিসা : টিলা।
৭ আসিয়েন্দা : জমিদারি, বড়ো খামার, র‍্যান্‌চ, খেতখামার।
৮ সারাপে : কম্বল।
৯ পিচোন : বাচ্চা কবুতর, নবীশ, তরুণ খেলোয়াড়, জিগরিদোস্ত।

'ওদের বারণ কর, হুস্তিনো! বল, আমায় যেন খুন না-করে! যা গিয়ে ব'লে আয় ওদের! ভগবানের দোহাই! বল ওদের! দোহাই, বল ওদের, ভগবানের দোহাই!'

'পারছি না যে। ওখানে এক সার্জেন্ট আছে, সে তোমার সম্বন্ধে কোনো কথাই শুনতে চায় না।'

'তোর কথা যাতে শোনে, তার চেষ্টা কর। বুদ্ধি খাটা একটু, ওকে বল যে আমাকে যা ভয় খাইয়ে দিয়েছে তা-ই যথেষ্ট। বল ওকে, দয়া কর, ভগবানের দোহাই!'

'কিন্তু এ তো শুধু তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে নয়। দেখে মনে হচ্ছে সত্যি ওরা তোমাকে সাবাড় ক'রে দেবে। আর আমি ওখানে কিছুতেই ফিরে যেতে চাই না।'

'আরো-একবার যা। শুধু একবার, ভাখ তুই কী করতে পারিস।'

'না। আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। কারণ যদি যাই তো ওরা বুঝে যাবে যে আমি তোমার ছেলে। যদি ওদের কেবল ঘাঁটাই, বিরক্ত করি, তবে শেষে ওরা জেনে যাবে আমি কে আর আমাকেও গুলি ক'রে খতম ক'রে দেবে। বরং কোনোকিছু না-ঘাঁটিয়ে আপাতত সব ছেড়ে দেয়াই ভালো।'

'যা, হুস্তিনো। বল ওদের, আমায় একটু দয়া করতে। একটু। শুধু এই কথাই বল ওদের। যা, হুস্তিনো, গিয়ে ব'লে আয়।'

হুস্তিনো দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নেড়ে না বললে।

আর সে তার মাথা নেড়েই চললো কিছুক্ষণ।

'সার্জেন্টকে গিয়ে বল তোকে যেন কলোনেলের সঙ্গে দেখা করতে দেয়। আর ওকে বল কত বুড়ো আমি—কীই বা আমার দাম। আমাকে মেরে ওরা কী পাবে? কিস্সু না। তাছাড়া, ওর'ও তো আত্মা আছে। ওকে বল, ওর পবিত্র আত্মার মুক্তির জন্যে আমায় ক্ষমা ক'রে দিতে।'

হুস্তিনো পাথরের চাঁইগুলো থেকে উঠে পড়লো যার ওপর এতক্ষণ সে

ব'সে ছিলো, আর জন্তুর খোঁয়াড়ের দরজার দিকে এগুলো। তারপর সে শুধু এই বলতেই ফিরে দাঁড়ালে, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি যাবো। তবে ওরা যদি আমাকেও গুলি ক'রে মারবে ব'লে ঠিক করে, তাহ'লে আমার বৌ-বাচ্চার দেখাশুনো করবে কে?'

'ভগবানই ওদের দেখবেন, হুস্তিনো। শুধু একবার যা তুই এখন ওখানে, আর ত্যাখ আমার জন্যে কী করতে পারিস। শুধু তা-ই এখন জরুরি।'

...

ওরা তাকে এনেছিলো একেবারে ভোরবেলায়। এখন সকাল অনেকটাই গড়িয়ে গিয়েছে, আর এখনও সে র'য়ে গেছে ওখানে, একটা খুঁটির গায়ে বাঁধা, অপেক্ষা ক'রে আছে। কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না সে। শান্ত হবার জন্যে সে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পারেনি। খিদেও পায়নি তার। সে শুধু যা চায় তা একটু বাঁচতে। এখন যখন সে জানে ওরা তাকে সত্যি গুলি ক'রে মারবে, সে শুধু টের পাচ্ছে বাঁচবার জন্যে তার তীব্র আকুতি, একেবারে সগু পুনর্জীবন পাওয়া লোকের মতো।

কে ভেবেছিলো ঐ যে পুরোনো কাহন ঘটেছিলো, ঐ অত আগে, আর ঐভাবে-যা মাটি চাপা প'ড়ে গিয়েছে বলে সে ধ'রে নিয়েছিলো, কে জানতো সেটা আবার এসে এমন হামলা বাঁধাবে। ঐ সেই মামলাটা, যখন দোন লুপেকে মারতে হয়েছিলো তার। এমনি-এমনি নয় মোটেও, আলিমারা যেভাবে জটটা পাকাতে চেয়েছিলো মোটেও সেভাবে নয়, বরং মারার অনেক কারণ ছিলো তার। তার মনে প'ড়ে গেলো: দোন লুপে তেরে়রেবোস, পুয়ের্তো দে পিয়েদ্রার মালিক—আর তাছাড়া তার ধর্মবাপও—হচ্ছে সেই লোক যাকে সে, হুভেনসিও নাভা, খুন করতে বাধ্য হয়েছিলো, কারণ তিনি তাকে তাঁর মাঠে তার গোরুমোষ চরাতে দিতে চাননি, যখন তিনিই ছিলেন পুয়ের্তা দে পিয়েদ্রার মালিক আর তার ওপর তার ধর্মবাপ।

গোড়ায় সে কিছুই করেনি, কারণ তার মনে হয়েছিলো এতে তার মুখে চুন-কালি পড়বে। কিন্তু পরে, যখন হু-হু ক'রে খরা এলো, যখন সে দেখতে পেলে কীভাবে তার জন্তুগুলো হিদেয় হন্যে হ'য়ে ধুঁকতে-ধুঁকতে একের পর এক টেঁশে যাচ্ছে, আর কীভাবে তার ধর্মবাপ দোন লুপে তখনও নারাজ হয়ে আছেন তাদের আর তাঁর মাঠে চরাতে দেবেন না ব'লে সেই তখনই সে বেড়া ভেঙে তার হাড্ডিসার জন্তুগুলোকে ওখানে নিয়ে যেতে শুরু করে যেখানে তারা পেট পুরে

ঘাস খেতে পাবে। আর দোন লুপে এটা মোটেই পছন্দ করেননি, তিনি বেড়া মেরামত করবার হুকুম দেন, যাতে সে, হুভেনসিও নাভা, আবার নতুন ক'রে বেড়া ভাঙতে বাধ্য হয়। কাজেই দিনের বেলায় বেড়ার ফাঁকটা মেরামত করা হ'তো, আর রাত্তিরে সেটা আবার নতুন ক'রে ভাঙা হ'তো, আর জন্তুগুলো দাঁড়িয়েই থাকতো বেড়ার গা ঘেঁষে—সবসময় অপেক্ষা ক'রে থাকতো তারা—তার সব জন্তুগুলো যারা আগে শুধু ঘাসের গন্ধ পেয়েই বেঁচেছিলো, একবারও তা চাখতে পায়নি।

আর সে আর দোন লুপে বারে-বারে ঝগড়া করেছে, বচসা করেছে, কিন্তু কিছুতেই কোনো আপোষরফায় পৌঁছুতে পারেনি।

যতদিন না দোন লুপে তাকে ডেকে বলেছিলেন: 'শোনো, হুভেনসিও, ফের যদি তুমি আর-কোনো জন্তুকে আমার মাঠে ছেড়ে দাও তবে আমি সেটাকে মেরে ফেলবো।'

আর সেও তাঁকে জবাব দিয়েছিলো: 'শুনুন, দোন লুপে, এ তো আর আমার দোষ নয় যে জন্তুগুলো নিজেরাই নিজেদের খাবার জোগাড় ক'রে নেয়। ওরা নির্দোষ—ওদের মারলে আপনাকে তার মাশুল গুনতে হবে।'

আর তিনি আমার একটা দেড়বছরী কচি জন্তু মেরেছিলেন।

সেটা ঘটেছিলো মার্চে, পঁয়ত্রিশ বছর আগে, কারণ এপ্রিলে তো আমি তদ্দিনে পাহাড়ে চ'লে গিয়েছি, শমন-পরোয়ানাগুলোর কাছ থেকে পালাচ্ছি। যে-দশটা গোরু আমি জজসাহেবকে দিয়েছিলাম তারা কোনো উপকারেই লাগেনি আমার, কিংবা হাজত থেকে বাঁচবার জন্যে বাড়িটা যে বাঁধা রেখেছিলাম, তাও না। তবু পরে ওরা সব খরচ ক'রে ফেলেছিলো, যা বাকি ছিলো সব, শুধু যাতে আমায় ওরা তাড়া না-করে, এইজন্যে—অথচ ওরা শুধু আমার পেছনে হুলিয়া বার ক'রে ঘুরেছে। সেইজন্যেই আমি আমার ছেলেটাকে নিয়ে আমার অন্য জমিটায় থাকতে এসেছিলাম যার নাম পালো দে ভেনাদো। আর আমার ছেলে বড়ো হ'য়ে উঠলো, ছেলের বৌটা ইগ্‌নাসিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হ'লো, অ্যাদ্দিনে আট-আটটা বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে তাদের। কাজেই যে-গোলমালটা অনেক কাল আগে পাকিয়েছিলো, অ্যাদ্দিনে তার কথা ভুলে যাওয়া উচিত ছিলো সবার। কিন্তু, বুঝতেই পারি, কেউ ভোলেনি।

তখন আমি ভেবেছিলাম শো-খানেক পেসো দিয়েই সবকিছু চুকিয়ে-বুকিয়ে দেয়া যাবে। মরা দোন লুপে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বৌ আর দুটি বাচ্চা তখনও

হামাগুড়ি দিচ্ছিলো। আর বিধবাটিও কিছুদিন পরেই মারা যায়—ওরা বলে শোকে। ওরা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যায় দূরে কোনো আত্মীয়র কাছে। সুতরাং ওদের কাছ থেকে ভয় পাবার কিছুই ছিলো না।

কিন্তু বাকি সব লোক এমন লেগে রইলো যে এখনও, বিচার হবে ব'লে, আমার নামে পরোয়ানা ঝুলছে, শুধু আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে, যাতে এখনও আমার যা-কিছু আছে সব চুরি ক'রে নিতে পারে। যতবারই গাঁয়ে কেউ এসেছে ওরা বলেছে, 'এদিকটায় কয়েকজন অচেনা নতুন লোক দেখছি, হুভেনসিও।'

আর অমনি আমি কেটে পড়েছি পাহাড়ে, লুকিয়ে থেকেছি ধনুকমণির ঝোপে, আর সারাদিন কাটতো কেবলই ঘাসপাতা খেয়ে। মাঝে-মাঝে আমায় মাঝরাতেও বেরুতে হ'তো, যেন আমার পেছনে কেউ কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে। আমার গোটা জীবনটাই এভাবে কেটেছে। শুধু একটা-দুটো বছর নয়। গোটা জীবনটাই।

আর এখন ওরা আচানক তার জন্যে এসে হাজির যখন সে আর কারু ভয় করছিলো না, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো যে লোকে ঝামেলাটা সব ভুলে গিয়েছে; বিশ্বাস করেছিলো অন্তত তার শেষ দিন ক'টা শান্তিতে কাটবে। 'অন্তত,' সে ভেবেছিলো, 'আমার বুড়ো বয়েসে একটু শান্তি পাবো। ওরা আমাকে আর বিরক্ত করবে না।'

সারা মনপ্রাণ দিয়ে এই আশাটাকে সে আঁকড়ে ধরেছিলো। সেইজন্যেই এটা তার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন যে সে এভাবে মরতে বসেছে, আচমকা, আচানক, জীবনের এই সময়ে, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে এত লড়াই করার পর; তার জীবনের সেরা সময়গুলো সে শুধু বিপদের আশঙ্কায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছে; এখন যখন তার শরীরটাই শুকনো ছিবড়ের মতো হ'য়ে পড়েছে, চামড়ার একটা গোছাই যেন হ'য়ে উঠেছে সে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে-পালিয়ে সে যে-রকম খারাপ কাটিয়েছে দিন তা-ই থেকে শরীরটা যখন গেছে, তখন, আচমকা, আচানক…

সে কি তার বৌকেও তাকে ছেড়ে চ'লে যেতে দেয়নি? যেদিন সে জানতে পেরেছিলো যে তার বৌ তাকে ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, তাকে খুঁজে বার করবার কথাটাও তার মাথায় আসেনি। সে তাকে যেতে দিয়েছে, একবারও জানবার চেষ্টা করেনি কার সঙ্গে সে গেছে অথবা কোনখানে, যাতে তাকে গাঁয়ে ফেরা

ফিরে গিয়ে খোঁজখবর নিতে না-হয়। সে তাকে যেতে দিয়েছে যেমন সে হাল ছেড়ে দিয়ে সবকিছুকেই যেতে দিয়েছে—কোনো লড়াই অব্দি করেনি। শুধু যার দেখাশুনো করতে হয়েছে তাকে সেটা এই জীবনটা, আর-কিছু না-হোক এটা তাকে করতে হ'তোই। ওরা তাকে মেরে ফেলুক সে চায়নি। চাইতে পারেনি। এখন তো আরো চায় না।

কিন্তু সেইজন্যেই ওরা তাকে ওখান থেকে নিয়ে এসেছে, পালো দে ভেনাদো থেকে। তাকে বাঁধতেও হয়নি ওদের, যাতে সে ওদের পেছন-পেছন আসতে পারে। সে একা-একা হেঁটে এসেছে, ভয় দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। ওরা বুঝতে পেরেছিলো যে তার এই বুড়ো শরীরটা নিয়ে সে ছুটতে পারবে না, ও-রকম হাড়-বের করা শুকনো বাকলের মতো খরখরে পায়ে, মৃত্যুর ভয়ে যা কুঁকড়ে গিয়েছে। কারণ সেদিকেই সে এগুচ্ছে এখন। মৃত্যুর দিকে। মরবার জন্যে। ওরা তাকে তা-ই বলেছে।

তখনই সে জানতে পেরেছে। তার পেটের মধ্যে সেই তীব্র চিনচিনে একটা ব্যথা সে টের পেতে শুরু করেছে, যেটা সবসময়ই আসতো যখনই সে মৃত্যুকে কাছে দেখতো; ভয়ে বিস্ফারিত হ'য়ে গিয়েছে তার চোখ, আর মুখের ভেতরটা ভ'রে উঠেছে সেই টক-টক লালায় অনিচ্ছাসত্বেও সেটা তাকে খপ ক'রে গিলে ফেলতে হয়। আর সেটাই ভারি ক'রে দেয় তার পা, মাথাটা তখন মনে হয় যেন নরম হ'য়ে গিয়েছে, আর তার পাঁজরের মধ্যে বুকটা গায়ের জোরে ধ্বকধ্বক ক'রে দুরমুশ পেটে। না, সে কিছুতেই এই ধারণাটায় অভ্যস্ত হ'তে পারছে না যে ওরা তোকে মেরে ফেলবে।

একটা আশা নিশ্চয়ই আছে কোথাও। এখনও কোথাও নিশ্চয়ই একটু আশা আছে। হয়তো ওরা কোনো ভুল করেছে! হয়তো ওরা আর-কোনো হুভেনসিয়ো নাভার খোঁজ করছে, তার নয়।

চুপচাপ সে হাঁটছে ঐ লোকগুলোর মাঝখানে, হাত দুটো দু-পাশে অসাড় ঝুলে প'ড়ে আছে। ভোরবেলাকার প্রহর অন্ধকার, আকাশে কোনো তারা নেই। হাওয়া বইছে অলস, মন্থর, শুকনো মাটিকে চাবকে ঘোরাচ্ছে সামনে পেছনে, তাতে মুতের গন্ধ, যেমন থাকে ধুলোয় ভরা পথে।

তার চোখ দুটো—এত বছরে সে-দুটো কুঁচকে গিয়েছে—তাকিয়ে আছে নিচে মাটির দিকে, এখানে, তার পায়ের তলায়, অন্ধকার সত্ত্বেও। এই মাটিতেই, ঐখানেই, তার সারাটা জীবন। ষাটটি বছর বাঁচা তার ওপর, হাতে সেটাকে

মুঠো-ক'রে-ধরা, চেখে-দেখা মাটিতে যেমন ক'রে লোকে চেখে নেয় মাংসের স্বাদ। অনেককাল ধ'রে সে তার চোখ দিয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে দিচ্ছে এই মাটি, প্রত্যেকটা গুঁড়োকেই অনেকক্ষণ ধ'রে চাখছে, যেন এই তার শেষ ধুলো-মুঠি, প্রায় যেন জেনেই গিয়েছে যে এইই শেষবার।

তারপর, যেন কিছু বলতে চাচ্ছে, এমনিভাবে সে তাকালে লোকগুলোর দিকে যারা তার পাশে-পাশে কুচকাওয়াজ ক'রে যাচ্ছে। সে তাদের বলতে চাচ্ছিলো তাকে ছেড়ে দিতে, তাকে পালিয়ে যেতে দিতে; 'আমি কাউকেই আঘাত করিনি, ছেলেরা,' সে তাদের বলবে এই কথা, কিন্তু সে চুপ ক'রে থাকে। ভাবে, 'আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ওদের বলবো।' আর সে শুধু ওদের দিকে তাকায়। সে এমনকী এটাও কল্পনা ক'রে নেয় যে ওরা তার বন্ধু, কিন্তু সে ও-রকম ভাবতে চায় না। ওরা তার বন্ধু নয়। ওরা যে কে, তা-ই সে জানে না। সে ওদের তাকিয়ে-তাকিয়ে ছাখে, তার পাশ দিয়ে হাঁটছে, আর মাঝে-মাঝে নুয়ে প'ড়ে ঝুঁকে দেখছে রাস্তাটা কোনখান দিয়ে গেছে।

সে ওদের প্রথম দেখেছিলো রাত নামতেই, সেই অস্পষ্ট গোধূলিতে, যখন সবকিছু মনে হয় তেতে-পুড়ে ঝলশাচ্ছে। কচি-কচি ভুট্টাগুলো মাড়িয়ে ওরা আলগুলো পেরিয়ে এসেছিলো। আর সেজন্যেই সে নেমে এসেছিলো, এই কথাই বলতে যে ভুট্টাগুলো সবে গজাতে শুরু করেছে। কিন্তু তা ওদের থামায়নি।

সে ওদের দেখেছিলো ঠিক সময়েই। সবকিছুই ঠিক সময়ে দেখে ফেলবার ভাগ্য ছিলো তার। সে লুকিয়ে পড়তে পারতো, কয়েক ঘণ্টার জন্যে উঠে যেতে পারতো পাহাড়ে, ওরা চ'লে গেলে নেমে আসতে পারতো আবার। এর মধ্যে বর্ষা শুরু হবার মরশুম এসে গিয়েছে, তবে বৃষ্টি আসেনি, তার ভুট্টাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিলো। শিগগিরই সব শুকিয়ে কাঠি হ'য়ে যাবে।

কাজেই এটা মোটেই কাজে লাগেনি, তার এভাবে নেমে এসে এই লোক-গুলোর সামনে নিজেকে রাখা, যেন একটা গাড্ডায় পড়েছে, আর সেখান থেকে বেরুতে পারবে না।

আর এখন সে ওদের পাশে-পাশে চলেছে, কেমন ক'রে তাকে ছেড়ে দেবার কথা বলবে সেই কথাগুলো চেপে রেখেই। সে ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু দেখতে পাচ্ছে ওদের শরীরগুলো, যেগুলো দুলে-দুলে তার কাছে চ'লে আসে আবার দুলে-দুলে দূরে স'রে যায়। কাজেই সে যখন কথা বলতে শুরু করলে,

সে এমনকী জানতেও পারলে না ওরা তার কথা শুনছে কি না। সে বললে, 'কাউকেই আমি আঘাত দিইনি।' এই কথাই সে বললে। কিন্তু কিছুই বদলালো না। শরীরগুলোর একটাও তার দিকে কোনো দৃক্‌পাত করেনি। কোনো মুখ ফিরে তাকায়নি তার দিকে। ওরা শুধু সামনে এগিয়ে চলেছে সমানে, যেন ওরা ঘুমের মধ্যে পথ হাঁটছে।

তারপরে তার মনে হ'লো তার তো আর কিছুই বলবার কথা নেই, যে এখন আসার জন্যে তাকে অন্য-কোথাও খুঁজতে হবে। সে তার হাত দুটো আবার প'ড়ে যেতে দেয় দু-পাশে। গাঁয়ের প্রথম বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যেতে থাকে সে, এই চারটে লোকের মাঝখানে যারা আঁধার হ'য়ে আছে রাতের কালো রঙে।

...

'কলোনেল, এই-যে লোকটা।'

ওরা সরু দরজাটার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে। সে দাঁড়িয়ে আছে হাতে তার টুপি, সসম্ভ্রমে, কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখবে ব'লে। কিন্তু শুধু একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে: 'কোন লোক।'

'পালো দে ভেনাদা থেকে, কলোনেল। সেই যাকে ধ'রে আনতে আপনি হুকুম দিয়েছিলেন।'

'ওকে জিগেশ করো ও কখনও আলিমায় ছিলো কি না,' ভেতর থেকে আবার ভেসে আসে কণ্ঠস্বর।

'এই-যে, ওম্‌ব্রে, শোনো। কখনও আলিমায় থাকতে?' যে-সার্জেন্ট তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো সে শুধোয়।

'হ্যাঁ, কলোনেলকে বলুন যে আলিমারই লোক। ওখানেই থাকতাম আমি, খুব বেশিদিন আগেও নয়।'

'ওকে জিগেশ করো ও গুয়াদালুপে তেরেরোসকে চিনতো কি না?'

'উনি জিগেশ করছেন তুমি গুয়াদালুপে তেরেরোসকে চিনতে কি না?'

'দোন লুপে? হ্যাঁ, চিনতাম। ওঁকে বলুন যে আমি চিনতাম। তিনি মারা গেছেন।'

তখন ভেতরকার গলার স্বরের ধরনটা বদলে যায়: 'আমি জানি উনি মারা গেছেন,' স্বর বলে। আর স্বর ব'লেই চলে, যেন নলখাগড়ার দেয়ালের ওপাশে সে অন্য-কারু সঙ্গে কথা বলছে।

'গুয়াদালুপে ভেবুরেয়োস ছিলেন আমার বাবা। যখন বড়ো হ'য়ে আমি তাঁর খোঁজ করি লোকে বলে যে তিনি মারা গেছেন। এ-কথা জেনে বড়ো-হওয়া খুবই কঠিন যে যা থেকে আমরা ঝুলে থাকবো আমরা, যাকে আঁকড়ে শিকড় গজাতে থাকবো তা ম'রে গিয়েছে। তা-ই ঘটেছিলো আমাদের।

'পরে আমি জানতে পেরেছি যে তিনি খুন হ'য়ে যান, প্রথমে তাঁকে মারা হয় মাশেতে দিয়ে কুপিয়ে-কুপিয়ে, পরে একটা ষাঁড়ের শিং তাঁর পেট ফুঁড়ে দেয়, লোকে আরো বলে যে দু-দিনেরও বেশি তিনি ওভাবে বেঁচেছিলেন আর যখন তারা ওঁকে আবিষ্কার করে, একটা আরোয়োতে প'ড়ে আছেন, তখনও যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, অনুনয় ক'রে বলছেন তাঁর পরিবারের যেন দেখাশুনো করা হয়।

'যত সময় কাটে তুমি এ-কথা মনে হয় ভুলেই যেতে থাকো। তুমি এটা ভুলে যেতেই চাও। যেটা তুমি ভুলতে পারো না তা হ'লো এটা জানা যে এ-কাজটা যে করেছিলো সে এখনও বেঁচে আছে, তার পচা পোকায়-কাটা আত্মাকে শাশ্বত জীবনের বিভ্রম খাওয়াচ্ছে। সে-লোকটাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, যদিও আমি তাকে চিনিই না; কিন্তু আমি যে জানি সে কোথায় আছে এ-তথ্যটা আমার মধ্যে তাকে সাবাড় ক'রে দেবার ইচ্ছে চাগিয়ে তোলে। এখনও তার এই বেঁচে থাকা আমি বরদাস্ত করতে পারি না, ক্ষমা করতে পারি না। কোনো-দিনই তার জন্মানো উচিত ছিলো না।'

যা তিনি বলেন সব স্পষ্ট শোনা যায় এখান থেকে, বাইরে থেকে। তারপর তিনি হুকুম দেন, 'নিয়ে যাও ওকে, বেঁধে রাখো কিছুক্ষণ যাতে কষ্ট পায়, তারপর ওকে গুলি ক'রে মেরো।'

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কলোনেল!' সে অনুনয় করে, কাকুতিমিনতি করে। 'এখন আর আমার কোনো দাম নেই। এমনিতেই আমার আপনা-আপনি ম'রে যাবার আর বেশি বাকি নেই—বুড়ো বয়েসে অথর্ব হ'য়ে পড়েছি। আমাকে মারবেন না!'

'নিয়ে যাও ওকে!' ভেতর থেকে স্বর বলে।

'এরই মধ্যে আমি যথেষ্ট মাশুল গুনেছি, কলোনেল। বহুগুণ বেশি দিয়ে দেনা শুধেছি। ওরা আমার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। অনেকভাবে আমায় সাজা দিয়েছে ওরা। চল্লিশ বছর ধ'রে আমি কুষ্ঠরোগীর মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে বেড়িয়েছি, সবসময়েই এই ভয়ে যে এই বুঝি ওরা আমায় মেরে ফেললো। এভাবে মরণ আমার প্রাপ্য নয়, কলোনেল। সদাপ্রভু অন্তত আমায় ক্ষমা

করুন। আমাকে মারবেন না! ওদের বারণ করুন! বলুন, আমায় যেন না-মারে!'

এই তো সে ওখানে, যেন ওরা তাকে পিটিয়েছে, তার টুপিটা নাড়াচ্ছে মাটিতে। চ্যাঁচাচ্ছে।

তক্ষুনি ভেতর থেকে স্বর বললে: 'বাঁধো ওকে, কিছু মদ খেতে দাও, যতক্ষণ-না মাতাল হ'য়ে যায়। তাহ'লে গুলি আর ওর লাগবে না।'

...

অবশেষে, এখন, তাকে চুপ করানো গেছে। ঐ সে ওখানে, খুঁটির তলায় কুঁকড়ে প'ড়ে আছে। তার ছেলে হুস্তিনো এসেছিলো, তার ছেলে হুস্তিনো চ'লেও গিয়েছিলো, ফিরে ছিলো আবার, এখন সে ফিরে আসছে।

সে তাকে ঝুলিয়ে নেয় খচ্চরের ওপর। সে তাকে আঁটো ক'রে বাঁধে জিনে, যাতে সে রাস্তায় গড়িয়ে প'ড়ে-না যায়, সে তার মাথাটা ঢুকিয়ে দেয় একটা ছালায় যাতে অতটা খারাপ ধারণা না-ছড়ায়। তারপর সে তার খচ্চরকে ওঠ ওঠ করে, তারপর খুব তাড়া ক'রে ছোটে পালো দে ভেনাদোর দিকে, সময়মতো পৌঁছে যাতে মৃতের জন্যে নিশিজাগরের ব্যবস্থা করা যায়।

'তোমার ছেলের বৌ, নাতি-নাৎনিরা তোমার অভাব খুব বোধ করবে,' সে বলছিলো তাকে। 'তারা তোমার মুখের দিকে তাকাবে আর কিছুতেই বিশ্বাস করবে না এ তুমি। তারা ভাববে তোমাকে বুঝি কয়োটিরা ছিঁড়ে খাচ্ছিলো, যখন তারা দেখবে তোমার মুখটা ঝাঁঝরা হ'য়ে গিয়েছে—যত বুলেট ওরা ছুঁড়েছে তোমার দিকে!'

লুভিনা

দক্ষিণের পাহাড়গুলোর মধ্যে লুভিনা সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে পাথুরে। সেই ধূসর পাথরে থিকথিক করছে লুভিনা, যা থেকে লোকে চুন বানায়; তবে লুভিনায় অবশ্য কেউ তা থেকে চুনও বানায় না বা তা থেকে কোনো উপকারই পায় না। সেখানে তারা একে বলে রুক্ষ আঁকাড়া পাথর, আর যে-পাহাড়টা লুভিনার দিকে সটান উঠে গিয়েছে তাকে তারা বলে আঁকাড়া পাথরের টিলা। রৌদ্র আর হাওয়া দুয়ে মিলেই দায়িত্বটা নিয়েছে যাতে তা গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যায়, যাতে তার আশপাশে মাটি সবসময় থাকে শাদা আর ঝকঝকে, যেন তারা সবসময় সকালবেলার শিশিরে ঝলমল করছে, যদিও তা শুধু নেহাৎই কথার কথা, কারণ লুভিনায় দিনগুলোও রাতের মতোই হিমঠাণ্ডা আর শিশির মাটিতে পড়ার আগেই আকাশেই জ'মে যায়।

আর মাটি সেখানে খাড়া, চারপাশ থেকে গভীর সব বারুরানকা কেটে দিয়ে তৈরি করেছে উৎরাই, আর নয়ানজুলিগুলো এত গভীর যে তুমি তলাটাও দেখতে পাবে না। লুভিনায় তারা বলে যে এইসব বারুরানকা থেকেই কারু স্বপ্ন উঠে আসে; কিন্তু আমি তাদের ভেতর থেকে শুধু যাকে শিস দিয়ে-দিয়ে উঠে আসতে দেখেছি তা হ'লো হাওয়া, যেন তলায় তারা চেপটে গিয়েছিলো শরবনের নলের মধ্যে। এমন-এক হাওয়া যা এমনকী তুল্‌কামারাদেরও গজাতে দেয় না— ঐ-সব খুদে-খুদে করুণ উদ্ভিদ যারা শুধু একটুকরো জমি পেলেই বেঁচে যায়, তাদের সবগুলো হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে পাহাড়ের খাড়াইয়ের পাশ। শুধু ক্বচিৎ কোনোখানে, যেখানে একরত্তি ছায়া পড়ে, পাহাড়ের আড়ালে লুকোনো কোনো জায়গায়, চিকালোতে ফুটে ওঠে তার শাদা-শাদা পপিফুল নিয়ে। কিন্তু চিকালোতে শুকিয়ে যায় চট ক'রে। তখন তুমি তাকে শুনতে পাবে সে তার শিরদাঁড়ার মতো ডালগুলো দিয়ে হাওয়া আঁচড়াচ্ছে, শানপাথরের ওপর ছুরির ফলা ঘষবার মতো।

'লুভিনার ওপর দিয়ে যে-হাওয়া ব'য়ে যায় তাকে তোমরা চোখে দেখতে পাবে। সে কালো। ওরা বলে সে নাকি আগ্নেয়গিরির বালিতে ভরপুর

ব'লে; সে যা-ই হোক, এ হ'লো কালো হাওয়া। আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। লুভিনার সবকিছু পাকড়ে ধরে সে, যেন সে তাদের কামড়ে খাবে। আর এমন অনেকদিন হয় যখন সে বাড়ির চালাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়, যেন সে-সব নিছকই টুপি, ঢাকা তুলে দেয় ফাঁকা দেয়ালগুলোর। তারপর সে আঁচড়াতে থাকে তাদের যেন তার নখ আছে: সকাল থেকে রাত অব্দি আপনি তা শুনতে পাবেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও থামছে না, চেঁছে নিচ্ছে দেয়ালগুলো, ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে ফালি-ফালি মাটি, দরজার তলায় খুঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে তার তীক্ষ্ণ ধারালো শাবলগুলো দিয়ে, যতক্ষণ-না আপনি টের পান যে আপনার ভেতরেই সে টগবগ ক'রে ফুটছে যেন আপনার সব হাড়গোড়ের কব্জা খুলে ফেলবে। নিজেই দেখতে পাবেন আপনি।'

যে-লোকটা কথা বলছিলো, সে বাইরে তাকায়, একটু চুপ ক'রে থাকে।

নদীর শোর-এসে পৌঁছোয় তাদের কাছে, তার ফোলা স্ফীতজল ডুমুরগাছের ডালপালাগুলোর মধ্য দিয়ে-দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে যায় ছলচ্ছল আওয়াজ, হাওয়ার শোর কোমলভাবে শর-শর করছে কাগজি বাদামগাছের পাতায়-পাতায়, আর ভেসে আসছে বাচ্চাদের চ্যাচামেচি, যে-ছোট্ট জমিটা দোকানের আলো প'ড়ে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে সেখানে তারা খেলা করছে।

উড়ো পিঁপড়েরা ঢোকে, ধাক্কা খায় তেলের বাতিগুলোর গায়ে, পোড়া পাখা নিয়ে প'ড়ে যায় মাটিতে। আরো বাইরে রাত কেবলই এগিয়ে আসতে থাকে।

'এই-যে, কামিলো, আরো দুটো বিয়ার!' লোকটা আবার বলে। তারপর সে জুড়ে দেয়, 'আরেকটা কথাও আছে, সেনিওর। লুভিনায় আপনি কখনও নীল আকাশ দেখতে পাবেন না। সেখানে আস্ত দিগন্তটাই সবসময়ে কালচে রঙের, সবসময়েই একটা কালো দাগে ঢাকা প'ড়ে আছে, যে-দাগ কখনও মোছে না। সবগুলো টিলাই ফাঁকা, একটাও গাছ নেই, আপনার চোখকে বিশ্রাম দেবার মতো কোথাও এক ছিঁটেও সবুজ নেই, সবকিছু একটা ছাইরঙা ধোঁয়াশা মুড়ি দিয়ে আছে। নিজেই দেখতে পাবেন জায়গাটা কেমন — ঐ-সব টিলা, সব চুপ, যেন ম'রে গিয়েছে, আর সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় লুভিনা, মুকুটের মতো, তার সব শাদা বাড়িঘর নিয়ে, যেন মড়ার মাথার...'

বাচ্চাদের চ্যাচামেচি কাছে এগিয়ে আসে, শেষটায় দোকান ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেটা লোকটাকে ওঠায়, তাকে নিয়ে যায় দরজায়, তাদের উদ্দেশে

তাকে চ্যাঁচাতে ওশকায়: 'ভাগ! বিরক্ত করিসনে আমাদের! খেলতে পারিস, তবে অত গোলমাল করিসনে!'

তারপর টেবিলে ফিরে এসে, ব'সে প'ড়ে, সে বলে: 'তা, যা বলছিলাম, ওখানে খুব-একটা বৃষ্টি পড়ে না। বছরের মাঝামাঝি গোটা কয় তুফান পায় ওরা, মাটিকে তারা চাবকায়, ছিঁড়ে নিয়ে যায় টুকরো ক'রে, পাথুরে খোলার ওপর শুধু পাথরের টুকরো ভাসে, আর-কিছুই রাখে না তুফান। কেমন ক'রে মেঘেরা হামাগুড়ি দিয়ে ভারি হ'য়ে এগোয়, কেমন ক'রে তারা এক টিলা থেকে আরেক টিলায় কুচকাওয়াজ ক'রে আসে লাফিয়ে-লাফিয়ে যেন তারা হাওয়ায় ফোলানো কতগুলো থলে, আছড়ায়, ফেটে পড়ে, যেন তারা বারান্দার ধার ঘেঁষে ভেঙে পড়ছে—এ-সব দেখতে ভালো। কিন্তু দশ-বারোদিন পর তারা উধাও হ'য়ে যায়, পরের বছরের আগে তাদের আর পাত্তা মেলে না, আর কখনও-কখনও এমনকী বছরের পর বছর তারা ফিরে আসে না—না, বৃষ্টি পড়ে না বেশি, সামান্যই পড়ে, আর তাতে মাটি, শুধু-যে পুরোনো চামড়ার মতো কুঁচকে থাকে, শুকনো হ'য়ে থাকে, তা-ই নয়, ফাটল ধ'রে যায় একের পর এক, আর কঠিন সব মাটির ডেলা ধারালো পাথরের মতো তীক্ষ্ণ হ'য়ে থাকে, হাঁটবার সময় আপনার পায়ে তারা বিঁধে যায় পর-পর, যেন মাটিও সেখানে কাঁটা গজিয়ে ফেলেছে। এইরকমই হ'লো গিয়ে জায়গাটা।'

সে ঢকঢক ক'রে তার বিয়ার ঢালে গলায়, ঢালতেই থাকে যতক্ষণ-না শুধু ফেনার বুড়বুড়িই থাকে বোতলে, তারপর সে ব'লে চলে: 'যেখানেই আপনি তাকান না কেন লুভিনায়, জায়গাটা খুবই করুণ দেখাবে। আপনি তো যাচ্ছেন ওখানে, ফলে আপনি নিজেই টের পাবেন। আমি বলবো এটা এমন-এক জায়গা যেখানে শুধু শোকতাপই বাসা বেঁধে থাকে। যেখানে এমনকী মৃদু হাসি কাকে বলে তাও লোকের অজানা, যেন লোকের মুখগুলো জমাট বেঁধে গিয়েছে। আর, যদি আপনার মনে ধরে, তবে সেই শোকতাপই আপনি দেখতে পাবেন যে-কোনো সময়ে। সেখানে যে-হাওয়া বয় তা তাকে নিয়ে এপাশ-ওপাশ করে, কিন্তু কখনও সরিয়ে নিয়ে যায় না। মনে হয় সে যেন সেখানেই জন্মেছিলো। আর আপনি তা চাখতে পারেন যেন, প্রায় যেন ছুঁতে পাবেন, কারণ সবসময়েই তা আপনার ওপর ঝুলে থাকবে, আপনার গায়ে লেপটে থাকবে, কারণ এ একটা ভারি পলেস্তারার মতো—বুকের জ্যান্ত মাংসের ওপর ভারি হ'য়ে চেপে বসেছে।

'সেখানকার লোক বলে যে যখন পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে, তারা স্পষ্ট নাকি মূর্তিমান হাওয়াকে দেখতে পায়, লুভিনার রাস্তাঘাট ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে, পিঠে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে কালো একটা কম্বল ; তবে আমি যা সবসময়েই কোনোক্রমে দেখে ফেলেছি, তা হ'লো, লুভিনায় যখনই কোনো চাঁদ ওঠে সেটা হয় নিরাশার প্রতিমার মতো—সবসময়।

'কিন্তু নিন, আপনার বিয়ার খেয়ে নিন। আপনি তো একটা চুমুকও খাননি দেখছি! আরে, খেয়ে নিন। না কি ও-রকম গরম বিয়ার আপনার ভালো লাগে না? তবে আমরা তো এখানে ঐ একরকম বিয়ারই পাই। জানি এর স্বাদ ভালো না, খচ্চরের মূতের মতো খেতে। তবে এখানে আপনি তাতেই অভ্যস্ত হ'য়ে যান। আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, ওখানে আপনি এও পাবেন না। লুভিনায় গেলেই আপনি এই বিয়ারের জন্যেও টান অনুভব করবেন। সেখানে আপনি শুধু যা খেতে পাবেন তা এক মদ, ওহাসে ব'লে এক লতাপাতা থেকে ওরা তা বানায়, আর প্রথম ঢোঁক গেলবার পরেই আপনার মাথা খ্যাপার মতো বনবন ক'রে পাক খেতে শুরু করবে, মনে হবে মাথাটা বুঝি আপনি শক্ত কিছুতে ঠুকে ফেলেছেন। তাই বলি, বরং আপনার বিয়ারটাই খেয়ে নিন এখন। আমি কী বলছি, আমি জানি।'

এখনও তুমি শুনতে পাবে বাইরে নদীর তুমুল যুদ্ধ। হাওয়ার কোলাহল। বাচ্চাদের খেলাধুলো। মনে হয় এখনই যেন সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে।

লোকটা আবারও দরজার কাছে গিয়েছিলো, এবার সে ফিরে আসে আবার, বলে: 'স্মৃতি যখন তাদের ফিরিয়ে আনে, বিশেষত এখানে যেখানে তার মতো কিছুই আর নেই, তখন সবকিছু দেখা খুব সহজ। তবে লুভিনার কথা যখন ওঠে, আমার কোনো মুশকিলই হয় না, সে-সম্বন্ধে আমি যা জানি তা আপনাকে অবিশ্রাম ব'লে যেতে পারি। আমি সেখানে থাকতাম। আমি সেখানকার জীবন ছেড়ে এসেছি—আমি ও-জায়গাটায় গিয়েছিলাম কত স্বপ্ন কত বিভ্রম নিয়ে, আর ফিরে এসেছি বৃদ্ধ, জীর্ণ, খ'য়ে-যাওয়া। আর এখন আপনি ওখানে যাচ্ছেন—ঠিক আছে। বেশ। শুরুটাও আমার মনে প'ড়ে যাচ্ছে। আমি নিজেকে আপনার জায়গায় বসাবো আর ভাববো—শুনুন, আমি যখন প্রথম লুভিনা যাই—কিন্তু প্রথমে আপনি কি আপনার বিয়ারের একটা ঢোঁক আমায় খেতে দেবেন? আমি তো দেখছি সেদিকে আপনি কোনো পাত্তাই দিচ্ছেন না। আর আমাকে একটা ঢোঁকও খুব সাহায্য করে। আমার ওপর থেকে চাপ

কমিয়ে দেয় বিয়ার, মনে হয় আমার মাথাটায় কেউ যেন কর্পূরতেল মালিশ ক'রে দিয়েছে—হ্যাঁ, আপনাকে আমি বলছিলাম যে প্রথম যখন আমি লুভিনা পৌঁছুই, যে-খচ্চরের গাড়ির গাড়োয়ান আমাদের নিয়ে যায় সে তার খচ্চরগুলোকে একটু জিরোতে অব্দি দেয়নি। আমাদের নামিয়ে দিয়েই সে আদ্ধেকটা ঘুরে গিয়ে বলেছিলো, "আমি ফিরে যাচ্ছি।"

' "সবুর, খচ্চরগুলোকে একটু জিরোতে দেবে না! ওরা তো ধুঁকছে!"

' "ওরা এখানে খারাপ দশায় পড়বে," সে বলেছিলো, "আমি বরং ফিরেই যাই।"

'আর সে ফিরে এসেছিলো, নেমে এসেছিলো আকাঁড়া পাথরের টিলা বেয়ে, খচ্চরগুলোকে এমন তাড়া দিয়ে খোঁচাচ্ছিলো যেন সে শয়তানে-পাওয়া কোনো জায়গা থেকে পালাচ্ছে।

'আমার বৌ, আমার তিন কাচ্চাবাচ্চা, আর আমি—আমরা সেখানে থেকে গেলাম, প্লাসার ঠিক মাঝটায় দাঁড়িয়ে আছি, হাতে সব বোঁচকাবুঁচকি, আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি। সে-জায়গাটার মাঝখানে শুধু যা আপনার কানে আসে তা হ'লো হাওয়া—

'শুধু একটা প্লাসা, নিছক প্লাসা, একটাও গাছটাছ নেই যে হাওয়াকে ঠেকাবে। আর সেইখানে আমরা দাঁড়িয়ে।

'তারপর আমি আমার বৌকে জিগেশ করলাম, "এ আমরা কোন দেশে এসেছি, আগ্রিপিনা?"

'আর সে শুধু তার কাঁধ ঝাঁকালো।

' "তা, তোমার যদি এতে কিছুই এসে না-যায়, তাহ'লে একটা-কোনো জায়গা খুঁজে বার করো যেখানে আমরা খেয়ে-দেয়ে রাতটা কাটাতে পারি। আমরা তোমার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো," আমি বললাম বৌকে।

' সে সবচেয়ে ছোটো বাচ্চাটার হাত ধ'রে প্লাসা থেকে চ'লে গেলো—কিন্তু আর সে ফিরে আসে না।

' রাত্তির নামলে, যখন সূর্য শুধু পাহাড়গুলোর চুড়ো আলো ক'রে দিচ্ছে, আমরা তার খোঁজে এগুলাম। লুভিনার সরু রাস্তাগুলো ধ'রে হেঁটে চললাম আমরা, যতক্ষণ-না তার দেখা পাওয়া গেলো গির্জেয়; সেই নির্জন গির্জেটার ঠিক মাঝখানে ব'সে আছে সে, তার কোলে পায়ের ফাঁকে ঘুমিয়ে আছে বাচ্চাটা।

' "এখানে তুমি কী করছো, আগ্রিপিনা ?"

' "আমি প্রার্থনা করতে এসেছি।" সে আমাদের বললে।

' "কেন ?" আমি তাকে শুধোলাম।

' সে শুধু তার কাঁধ ঝাঁকালো।

' সেখানে প্রার্থনা করার মতোও কেউ নেই। একটা ফাঁকা খ'য়ে যাওয়া পুরোনো কুঁড়ে, দরজাগুলো অব্দি নেই, শুধু কতগুলো ফাঁকা বেঞ্চি, ছাতটায় ফুটো-ফুটো, যার মধ্য দিয়ে হাওয়া আসে যেন কোনো ঝাঁঝরির মধ্য দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে।

' "রেস্তোরাঁটা কোথায় ?"

' "কোনো রেস্তোরাঁ নেই।"

' "আর সরাই ?"

' "কোনো সরাই নেই।"

' "কারু সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ? কেউ কি থাকে এখানে ?" আমি তাকে জিগেশ করলাম।

' "হ্যাঁ, রাস্তাটার ওপাশে—কয়েকজন মেয়ে—এখনও আমি যেন ওদের দেখতে পাচ্ছি। ঐ ছাখো, ঐ দরজাটার ফাটল দিয়ে দেখছি কতগুলো চোখ জ্বলজ্বল করছে, দেখছে আমাদের—তারা এখানটাতেও দেখছিলো—ছাখো ওদের, তাকিয়ে ছাখো। ওদের চোখের জ্বলজ্বলে তারাগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি—কিন্তু আমাদের খেতে দেবার মতো ওদের কিছু নেই। নিজেদের গলা না-বাড়িয়ে দিয়েই ওরা আমায় বলেছে এই শহরে খাবার কিছু নেই—তখন আমি এখানে আসি, প্রার্থনা করতে, ঈশ্বরের কৃপা চাইতে, যাতে তিনি আমাদের সাহায্য করেন।"

' "প্রাসায় ফিরে যাওনি কেন ? আমরা তোমাদের জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম।"

' "আমি এখানে প্রার্থনা করতে এসেছি। আমার এখনও শেষ হয়নি।"

' "এ কোন দেশ, আগ্রিপিনা ?"

' আর সে আবার তার কাঁধ ঝাঁকালো।

' সে-রাত্তিরে আমরা গির্জের একটা কোণায়—যেখানে বেদিটা খুলে নামানো হয়েছে, সেখানে—আস্তানা গাড়লাম ঘুমোবার জন্যে। এমনকী সেই কোণাটায় অব্দি হাওয়া তাড়া ক'রে এলো, তবে ততটা জোর নয়। আমরা হাওয়াটাকে শুনলাম আমাদের ওপর দিয়ে একটানা ডুকরে-ডুকরে চ'লে যাচ্ছে, তাকে আসতে

শুনলাম আমরা, হা-করা দরজাগুলোর ফোকর দিয়ে তারা এলো, হাওয়ার হুলুস্থুল হাত বাড়িয়ে তারা ক্রুশের কাঠগুলোকে চাবকালো—মস্ত-সব-রুক্ষ ক্রুশ, মেসকিতে কাঠে তৈরি, সারা গির্জের দেয়াল থেকে ঝুলছে একটার পর একটা, তার দিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা বাঁধা, হাওয়ার এককেটা দমকায় তারা টং টং ক'রে উঠছে যেন কেউ দাঁত কড়মড় করছে।

'বাচ্চারা কাঁদছিলো। ঘুমোবে কী, তারা ভয়েই অস্থির। আর আমার বৌ তাদের সবকটাকে একসঙ্গে কোলে নেবার চেষ্টা করছে। তার হাতভরা বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরছে। আর আমি—আমি বুঝতেই পারছি না কী করবো।

'ভোরের আগটায় হাওয়া একটু শান্ত হ'লো। তারপরেই ফিরে এলো আবার। কিন্তু সেই সকালে একটা মুহূর্ত এসেছিলো যখন সবকিছু নিথর হ'য়ে ছিলো, যেন আকাশ এসে জুড়ে গিয়েছে মাটির ওপর, তার ভারে সব আওয়াজ পিষে মেরেছে—বাচ্চারা যখন ঘুমোচ্ছে আপনি তাদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেতেন, আমি আমার বউয়ের ভারি নিশ্বাস শুনছি আমার পাশে।

' "কী ওটা?" সে আমাকে শুধোয়।

' "কী কোনটা?" আমি তাকে জিগেশ করি।

' "ঐ—ঐ শব্দটা।"

' "ওটা স্তব্ধতা। ঘুমোও। একটু বিশ্রাম করো অন্তত, কারণ শিগগিরই দিন হ'য়ে যাবে।"

'কিন্তু একটু পরেই আমিও তা শুনতে পেলাম। এ যেন অন্ধকারে আমাদের খুব কাছে বাদুড়গুলো ডানা ঝাপটাচ্ছে। মস্ত-সব ডানাগুলো বাদুড়—মাটি ঝাপটে চ'লে যাচ্ছে। আমি উঠে পড়লাম আর ডানা ঝাপটানির শব্দ আরো জোর শোনালো, যেন বাদুড়ের ঝাঁকটা ভয় পেয়েছে আর দরজার ফোকরগুলোর দিকে উড়ে যাচ্ছে। তারপর আমি পা টিপে-টিপে গেলাম ওখানে, সেই ভোঁতা মর্মরটা যেন ছুঁতে পারছি আমার সামনে। দরজার কাছে গিয়ে থামলাম আমি, আর তখনই তাদের দেখতে পেলাম। আমি দেখতে পেলাম লুভিনার যত স্ত্রীলোক, কাঁধে তাদের জলের কলস, মাথা থেকে ঝুলছে তাদের শালগুলো, আর কালো রাত্রির পটে সার বেঁধে আছে তাদের কালো মূর্তিগুলো।

' "কী চাও তোমরা?" আমি তাদের জিগেশ করলাম। "এত রাত্রে তোমরা কী চাচ্ছো?"

'তাদের একজন উত্তর দিলে, "আমরা জল আনতে যাচ্ছি।"

'দেখলাম, তারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে আমায়। তারপর যেন তারা কতগুলো ছায়া শুধু; তারা তাদের কোলো কলসগুলো নিয়ে রাস্তা ধ'রে হেঁটে চললো।

'না, প্রথম যে-রাতটা আমি লুভিনায় কাটিয়েছিলাম, তা আমি কোনোদিনই ভুলবো না, কোনোদিনও না।

'আপনার কি মনে হয় না তার জন্যে আরেকটা বিয়ার খাওয়া যায়? যদি তা আমার স্মৃতির বিস্বাদটুকু মুছে দিয়ে যায়, শুধু সেই উদ্দেশ্যেই?'

...

'মনে হচ্ছে আপনি যেন জিগেশ করলেন ক-বছর আমি লুভিনায় ছিলাম, করেননি জিগেশ? সত্যি-বলতে, আমি জানি না। আমি আমার সময়ের সব বোধই হারিয়ে ফেলি, বিশেষ ক'রে জ্বরগুলো সব কেমন মিশিয়ে এলোমেলো ক'রে দিয়ে গিয়েছিলো—তবে অনন্তকাল হবে নিশ্চয়ই—সময় সেখানে বিষম দীর্ঘ। কেউ সেখানে প্রহর গোনে না, কেউ তোয়াক্কা করে না কী ক'রে বছরগুলো জ'মে-জ'মে পাহাড় হ'য়ে যায়। দিন শুরু হয়, শেষ হয়, তারপর রাত আসে। শুধু দিন আর রাত, দিন আর রাত, যতক্ষণ-না আসে মৃত্যুর দিন, যেটা তাদের জন্যে আশার দিন।

'আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে আমি শুধু একই বিষয় নিয়ে ঘ্যান-ঘ্যান ক'রে যাচ্ছি। আর, হ্যাঁ, আমি করছি, সেনিওর—দরজার চৌকাঠে ব'সে-ব'সে, সূর্যের ওঠা সূর্যের অস্ত দেখতে-দেখতে, আপনার মাথাটা ওঠাতে-নামাতে ওঠাতে-নামাতে একসময় সব কলকব্জা ঢিলে হ'য়ে যাবেই, আর তখন সব যায় নিথর হ'য়ে, সময়হারা, যেন সবটা সময় আপনি কাটিয়েছেন অনন্তের মধ্যে। বুড়োরা সেখানে তাই করে।

'কারণ ওরা বলে যে লুভিনায় থাকে শুধু যারা সত্যি বুড়ো থুরথুরে, আর যারা এখনও জন্মায়নি—আর রোগা-রোগা স্ত্রীলোক, এত রোগা যেন শুধু কতগুলো হাড় আর চামড়া মাত্র। সেখানে যে-বাচ্চারা জন্মায় তারা সবাই চ'লে গিয়েছে—তারা একবার দিনের আলো দেখেছে কি দ্যাখেনি অমনি বড়ো হ'য়ে উঠেছে। যেমন ওরা বলে, ওরা মায়ের বুক থেকে ঝাঁপিয়ে নামে, ধেই-ধেই ক'রে লাফিয়ে নামে আর লুভিনা থেকে উধাও হ'য়ে যায়। লুভিনায় ব্যাপারটা এইরকমই।

'সেখানে শুধু প'ড়ে থাকে বুড়োরা আর নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোক—কিংবা হয়তো

স্বামীর সঙ্গেই থাকে স্ত্রীলোক, তবে স্বামীটি যে কোথায় গেছে তা শুধু ঈশ্বরই জানেন সেখানে—তারা দেখা দেয় কখনও-শখনও, যখন তুফানগুলো আসে, যেগুলোর কথা আপনাকে বলছিলাম; আপনি শুনতে পাবেন সারা শহর জুড়ে একটা শরশর শব্দ যখন তারা ফিরে আসে, আর যখন তারা আবার কেটে পড়ে তখন শুনতে পাবেন একটা গুমগুম আওয়াজ—তারা বুড়োদের জন্যে এক বস্তা খাবার রেখে যায়, মেয়েদের পেটে রুয়ে যায় আরেকটা বাচ্চা, আর পরের বছরের আগে তাদের কথা কেউ জানতে পায় না, কখনও-কখনও আর-কোনোদিনই তাদের কথা কেউ জানতে পায় না—এটাই রীতি। সেখানে ওরা ভাবে এইই বুঝি আইন, তবে সবই তো সমান। ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মার জন্যে খেটে-খেটে প্রাণ দেয়, যেমন তাদের মা-বাপ তাদের বাবা-মার জন্যে খেটেছে, আর কে জানে কত প্রজন্ম ধ'রে এই দায় তারা পালন ক'রে এসেছে—

'ইতিমধ্যে, বুড়োরা তাদের জন্যে হা ক'রে ব'সে থাকে, ব'সে থাকে মৃত্যুর জন্যে—দরজায়-দরজায় উবু হ'য়ে বসা, হাত দুটো ঝুলে পড়ে ঢিলে, নড়ে শুধু কখনও ছেলেমেয়েদের প্রতি কৃতজ্ঞতায়—একা-একা, সেই নিঃসঙ্গ লুভিনায়।

'একদিন আমি তাদের বোঝাতে চেয়েছিলাম যে তাদের অন্য-কোথাও যাওয়া উচিত জমি যেখানে সরেশ। "চলো, এখান থেকে সবাই মিলে চ'লে যাই!" আমি তাদের বলেছিলাম। "এসো, অন্য কোথাও গিয়ে আমরা আস্তানা গাড়ি, কোনোভাবে সামলে নেবো সব। সরকার আমাদের সাহায্য করবে।"

'চোখের পাতা না-নড়িয়ে তারা চুপচাপ আমার কথা শুনলো, তাদের চোখের গহন থেকে শুধু মিটমিটে একটু আলো আসছে, আর তাই দিয়ে তারা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

' "আপনি বলছেন সরকার আমাদের সাহায্য করবে, সেনিওর? আপনি কি সরকারকে চেনেন?"

'আমি বললাম যে চিনি।

' "আমরাও তাকে চিনি। এ শুধু এ-রকমই হয়। তবে সরকারের মায়ের কথা তো আমরা কিছুই জানি না।"

'আমি তাদের বললাম যে এ তো তাদেরই দেশ। তারা মাথা নাড়লো, বললো, না। আর তারা হাসলো শুধু। ঐ শুধু একবারই আমি দেখেছিলাম লুভিনার লোকদের হাসতে। তাদের ফোগলা মুখে তারা হাসলো আর বললো, না, সরকারের কোনো মা নেই কোথাও।

'আর জানেন? ওরা ঠিকই বলেছিলো। যে-প্রভু তাদের কথা শুধু তখনই মনে করেন যখন তাঁর কোনো সুপুত্তুর ওখানে কোনো গণ্ডগোল পাকায়। তখন তিনি তার জন্যে লুভিনায় ফৌজ পাঠান আর তারা তাকে খুন করে। শুধু এ-সব ঘটনা ছাড়া, তারা জানেই না আর-কোথাও কোনো লোকের অস্তিত্ব আছে কি না।

' "আপনি আমাদের বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের লুভিনা ছেড়ে চ'লে যাওয়া উচিত কারণ আপনি ভাবছেন অকারণেই আমরা খামকা-খামকা খিদেয় কষ্ট পাচ্ছি," ওরা আমায় বললে। "কিন্তু আমরা যদি জায়গাটা ছেড়ে চ'লে যাই, আমাদের মৃতদের কারা নিয়ে আসবে। তারা এখানে থাকে, আমরা তাদের একা একা এখানে ছেড়ে যেতে পারি না।"

'ফলে তারা এখনও আছে ওখানে। এখন যখন আপনি ওখানে যাচ্ছেন নিজের চোখেই ওদের আপনি দেখতে পাবেন। শুধু শুকনো মেস্কিতের মণ্ড চিবুচ্ছে, গিলছে নিজের মুখের লালা—খিদেকে ঠেকিয়ে রাখতে। আপনি দেখতে পাবেন ছায়ার মতো ওরা আপনার পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছে, ওদের ঘরবাড়ির দেয়াল ঘেঁষে, দেয়াল ধ'রে-ধ'রে, জড়িয়ে, প্রায় যেন হাওয়ায় হিঁচড়ে চ'লে যাচ্ছে।

' "তোমরা কি হাওয়াকেও শুনতে পাও না?" শেষটায় আমি তাদের বললাম। "সে যে তোমাদের শেষ ক'রে দেবে।"

' "হাওয়া শুধু ততক্ষণই বয় যতক্ষণ তার বওয়া উচিত। এটাই ঈশ্বরের মর্জি," তারা আমায় উত্তর দিলে। "হাওয়া যখন বয় না, তখনই দুঃসময়। তা যখন ঘটে, রোদ ঢ'লে পড়ে লুভিনায়, আমাদের রক্ত শু'ষে খায়, আমাদের চামড়ায় যতটুকু আর্দ্র আছে সব চুষে খায়। হাওয়া সূর্যকে ওপরে বসিয়ে রাখে। এইভাবেই ভালো?"

'তাই আমি আর তাদের আর-কিছু বলিনি। লুভিনা ছেড়ে আমি চ'লে এলাম, আর কখনও ফিরে যাইনি আমি, যেতেও চাই না।

'কিন্তু ছাখো-একবার জগৎ কীভাবে পাক খায়। এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি ওখানে গিয়ে পৌছুবেন। হয়তো পনেরো বছর কেটে গিয়েছে, যখন তারা এই একই জিনিশ আমায় বলেছিলো: "তুমি সান হুয়ান লুভিনায় যাচ্ছো।"

'সেদিন আমি ছিলাম জোয়ান মরদ। আমার মাথায় অনেক ভাবনা খেলে

যেতাতো—জানেনই তো কত-সব ভাবনায় আমরা ভরা থাকি। আর কেউ-কেউ যায় এই ধারণা নিয়ে যে সেখানে গিয়ে তাদের সম্বন্ধে কিছু করবে—সব খানেই এই ভেবেই যায়। কিন্তু লুভিনার তা কোনো কাজেই লাগেনি। পরীক্ষা ক'রে দেখেছি আমি—আর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

'সান হুয়ান লুভিনা। নামটা আমার কানে এমনভাবে বেজেছিলো যেন স্বর্গেরই একটা নাম। কিন্তু এটা পুর্গাতোরি। মুমূর্ষু একটা জায়গা যেখানে কুকুরগুলো অব্দি টেঁশে গিয়েছে, ফলে সেখানে কেউই নেই যে শুব্ধতার দিকে তাকিয়ে ঘেউ-ঘেউ করবে; কারণ যেই আপনি এই প্রবল হাওয়ায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন—ঐ যে-বাতাস ওখানে বয়—ওখানে যা আপনি তখন শুনতে পাবেন তা হ'লো শুধু স্তব্ধতা, ঐ নিঃসঙ্গ অঞ্চলগুলোয় যা রাজত্ব করে। আর তা আপনাকে পেড়ে ফেলবে। শুধু তাকিয়ে দেখুন একবার আমাকে। দেখুন, সে কী করেছে আমায়। আপনি তো ওখানে যাচ্ছেন, কাজেই চট ক'রেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাচ্ছি—

'কী বলেন আপনি, বলবো এই বেচারাকে আপনার গেলাশে একটু মেস্কাল ঢালতে? এই বিয়ার টেনে তো আপনায় উঠতে হবে বারে-বারে, আর তা আমাদের আলাপে বাধা জন্মায়। এই-যে, কামিলো, এবার আমাদের জন্যে দুটি মেস্কাল।

'তো', এবার, আপনাকে যা বলছিলাম—'

কিন্তু সে কিছুই বলে না আর। সে শুধু অপলকে তাকিয়ে থাকে স্থির কোনো বিন্দুতে, টেবিলের ওপর, যেখানে উড়ো পিঁপড়েরা, এখন পাখনাহীন, পাক খাচ্ছে কেবল ন্যাংটো কীটপতঙ্গের মতো।

বাইরে তুমি শুনতে পাবে রাত এগিয়ে আসছে। ডুমুর গাছের ডালে ঠেকছে জলের ছলছল। বাচ্চারা চ্যাঁচাচ্ছে, এখন অনেক দূরে। দরজার ছোট্ট গর্তটা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে তারারা।

যে-লোকটা উড়ো পিঁপড়েগুলোর দিকে তাকিয়েছিলো, সে ঢ'লে পড়লো টেবিলে, ঘুমিয়ে পড়লো।

যে-রাতে তারা তাকে একা ফেলে চ'লে গিয়েছিলো

'এত আস্তে চলেছো কেন তোমরা?' ফেলিসিয়ানো রুয়েলাস জিগেশ করেছে তার সামনে যারা ছিলো তাদের। 'এভাবে চললে শেষটায় আমার ঘুমিয়ে পড়বো যে। ওখানে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে কোনো তাড়া নেই তোমাদের?'

'কাল ভোরেই ওখানে গিয়ে পৌঁছুবো আমরা,' তারা তাকে উত্তর দিয়েছে।

তাদের এটাই শেষ কথা সে বলতে শুনেছে। তাদের শেষ কথা। কিন্তু সেটা শুধু তার মনে পড়বে পরে, পরের দিন।

তিনজনেই চলেছে সামনে, মাটির ওপর চোখ, চেষ্টা করছে রাতের মৃদু জ্যোৎস্নার সুযোগ নিতে।

'অন্ধকারই বরং ভালো। তাহ'লে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।' এটাও বলেছে তারা, একটু আগে, কিংবা হয়তো কাল রাতে। তার ঠিক মনে নেই। মাটি তার ভাবনাগুলোকে ঘুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলো।

এখন, উৎরাই বেয়ে উঠে, আবার সে জমি দেখতে পেলে। যেন তার দিকে ধেয়ে আসছে, তাকে ঘিরে ফেলছে, খুঁজে বার করতে চাচ্ছে মোক্ষম জায়গাটা যেখানটায় সে সবচেয়ে ক্লান্ত, তারপর উঠে আসে তার ওপরে, তার পিঠের ওপর, যেখানে তার রাইফেল ঝুলছে।

তরাইটা যেখানে সমতল সেখানে সে দ্রুত হাঁটে। যখন উৎরাই শুরু হয়, সে পেছিয়ে পড়ে; তার মাথা দুলতে শুরু করেছে, হেলে পড়ছে এপাশ-ওপাশ, ধীরে, আরো-ধীরে, যত তার পদক্ষেপগুলো ছোটো হ'য়ে আসে। অন্যেরা তার পাশ কাটিয়ে চ'লে গিয়েছে; এখন তারা অনেকটা সামনে এগিয়ে গিয়েছে, আর সে তাদের অনুসরণ ক'রে চলে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন মাথাটা দুলিয়ে।

বড্ড পেছিয়ে পড়ছে সে। সামনে প'ড়ে আছে রাস্তা, প্রায় চোখ সমান উঁচু। আর রাইফেলগুলোর ভার। আর ঘুম তার নাগাল ধ'রে ফেলেছে, তার পিঠের বাঁকায়।

সে শুনতে পায় পায়ের শব্দগুলো ম'রে যাচ্ছে—ঐ ফাঁকা ফাঁপা খটাখট শব্দ,

গোড়ালির চাপে তৈরি, ঈশ্বরই জানেন কতক্ষণ ধ'রে এ-শব্দ সে শুনছিলো, ঈশ্বরই জানেন সে যে কত রাত ধ'রে, রাতের পর রাত ধ'রে, আওয়াজটা সে শুনছিলো। 'লা মাগদালেনা থেকে এখানে, প্রথম রাত্তির; তারপর এখান থেকে ওখানে, দ্বিতীয়, আর এটা এখন তৃতীয় রাত। 'অত রাত মনে হ'তো না,' সে ভাবলে. 'শুধু যদি আমরা দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু তারা ঘুমোতে চায়নি। "যদি ওরা ঘুমের মধ্যে আমাদের পাকড়ে ফ্যালে," তারা বলেছে, "আর যত কিছু ঘটতে পারে তার মধ্যে সেটাই হবে সবচেয়ে খারাপ"।'

'কার পক্ষে খারাপ?'

এখন সে তার মনের মধ্যে কথা বলছে। 'আমি তাদের সবুর করতে বলেছিলাম: আজকের দিনটা বরং জিরিয়ে নেবার জন্যে রাখি। কাল আমরা সার বেঁধে কুচকাওয়াজ ক'রে এগুবো, এগুবার অনেক উৎসাহ থাকবে, যদি দৌড় লাগাতে হয় গায়ে অনেক জোর থাকবে। আমাদের জোরে ছুটতেও হ'তে পারে।'

চোখ দুটো বোজা, সে থেমে পড়ে। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, সে বলে, তাড়া ক'রে ফায়দা কী হবে? শুধু একটা দিন বাঁচবে। 'অতগুলো দিন হারাবার পর ঐ একটা দিন বাঁচানোর কোনো দাম নেই।' পরক্ষণেই সে চেঁচিয়ে বলে: 'কোথায় গেলে তোমরা, এখন?'

আর প্রায় নিজের কাছেই: 'বেশ, যাও, যাও, তবে, এগিয়েই যাও।'

সে একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসে। জমিটা ঠাণ্ডা, তার ঘাম ঠাণ্ডা জল হ'য়ে গেলো। এটা নিশ্চয়ই সেই পাহাড়, যার কথা তারা তাকে বলেছিলো। "নিচে ঐখানে গরম জমি, তার এখানে এই ওপরে কনকনে ঠাণ্ডা তার ওভারকোট ফুঁড়ে একেবারে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, 'যেন তারা আমার জামা তুলে কনকনে হিম হাত গায়ে বুলিয়ে যাচ্ছে।'

সে শ্যাওলার মধ্যে ডুবে যায়। হাত দুটি বাড়িয়ে দেয় সে, যেন রাতটার মাপ নিতে চায়। এমন হাওয়ায় সে শ্বাস নিচ্ছে যাতে তার্পিন তেলের গন্ধ। তারপর সে ভেজা ঘাসপাতার ওপর নিজেকে ঘুমের মধ্যে হড়কে যেতে দেয়, টের পায় ঠাণ্ডায় তার শরীরে আড় ধ'রে যাচ্ছে।

কনকনে ভোরটা তাকে জাগিয়ে দেয়—শিশিরের ভেজা ঠাণ্ডা।

সে তার চোখ খোলে। কালো ডালপালার ওপরে, দেখতে পায়, স্বচ্ছ এক আকাশে টলটলে সব তারা ফুটে আছে।

'অন্ধকার হ'য়ে আসছে, সে ভাবে। আর সে ঘুমের কাছে ফিরে যায় আবার।

সে উঠে পড়ে চ্যাচামেচি শুনে, রাস্তার শুকনো খোয়ায় ঘোড়ার খুরের দ্রুত শব্দ। এক হলদে আলো দিগন্তের সীমা এঁকে দিয়েছে।

খচ্চরচালকেরা পাশ দিয়ে চ'লে যায়, তাকিয়ে তাকে দেখতে-দেখতে। তারা তাকে সম্ভাষণ জানায় 'সুপ্রভাত!', কিন্তু সে কোনো উত্তর দেয় না।

তার মনে প'ড়ে যায় তাকে কী করতে হবে। তখন দিন, আর তার উচিত ছিলো রাতেই শান্ত্রীদের এড়িয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া। এটাই সবচেয়ে নিরাপদ গিরিখাত। তারা তো তাকে এই কথাই বলেছিলো।

সে তার বন্দুকগুলো তুলে নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। রাস্তা থেকে স'রে এসে সে পাহাড়ের মধ্য দিয়েই চলতে থাকে সূর্য যেদিকটায় উঠছে সেদিকে। সে ওঠে আর নামে, ছোটো-ছোটো সব টিলার বাঁক পেরোয়।

তার মনে হ'লো সে যেন খচ্চরচালকদের কথা শুনতে পাচ্ছে: 'আমরা ওকে ঐ ওপরে দেখেছি। চেহারাটা এইরকম আর অনেক অস্ত্রশস্ত্র ছিলো সঙ্গে।'

সে রাইফেলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর সে খুলে ফেলে দেয় কার্তুজের বেল্ট। অনেক হালকা লাগে এখন, সে ছুটতে শুরু করে, যেন পাহাড় থেকে নামার পথে সে দৌড়ে খচ্চরচালকদের হারিয়ে দেবে।

কাউকে 'প্রথমে বেয়ে উঠতে হয় ঢালু, ঘুরে যেতে হয় উপত্যকা, তারপর নামতে হয়'। সে তা-ই করছে এখন। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তারা তাকে যা-যা বলেছিলো সে শুধু তা-ই করছে, তবে যে-সময়ে করতে বলেছিলো সেই সময়ক্রম ধ'রে নয়।

গভীর নয়ানজুলিগুলোর কিনারে সে পৌঁছে যায়। দেখতে পায় মস্ত বিশাল ধূসর সমতল ছড়িয়ে আছে দূরে।

'তারা নিশ্চয়ই ওখানে এখন। রোদে পিঠ দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে—কোনো দুশ্চিন্তাই আর নেই,' সে ভাবে।

আর সে নিজেকে নয়ানজুলির ঢাল বেয়ে গড়িয়ে দেয়—গড়িয়ে পড়ে, উঠে ছুট লাগায়, আবার গড়িয়ে নামে।

'প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে,' সে বলে। আর সে গড়িয়ে নামে নিচে, দ্রুত আরো দ্রুত।

কানে শুনতে পায় খচ্চরচালকেরা যখন বলেছিলো 'সুপ্রভাত'। কানে সে-

কথা বাজতেই থাকে। সে বুঝতে পেরে যায় তাদের চোখে ছিলো প্রতারণা। প্রথম শান্ত্রীর কাছে পৌঁছুবামাত্র তারা গিয়ে বলবে, 'আমরা ওকে দেখেছি অমুক জায়গায়। এখানে পৌঁছুতে তার বেশি দেরি হবে না।'

হঠাৎ সে থমকে যায় স্থির।

'হেসু ক্রিস্তো!' সে বলে। আর সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠতে যাচ্ছিলো, 'আমাদের প্রভু হেসু ক্রিস্তো জিন্দাবাদ!' কিন্তু নিজেকে সে সংযত করে। হোলস্টার থেকে সে পিস্তল বার ক'রে নিয়ে জামার ভেতর গুঁজে দেয়—তাকে সে অনুভব করতে চায় গায়ে। সেটা তাকে সাহস দেয়। আগুয়া সার্কার বাড়িগুলোর দিকে সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগোয় সে, মস্ত আগুনের কুণ্ডের পাশে সৈন্যদের শোর-তোলা নড়াচড়ার দিকে নজর রাখতে-রাখতে—তারা আগুন পোহাচ্ছে।

আস্তাবলের বেড়ার কাছে পৌঁছোয় সে, ভালো ক'রে এখন দেখতে পায় তাদের, চিনতে পারে তাদের মুখ; তারা তার দুই খুড়ো—তানিস আর লিব্রাদো। সৈন্যরা যখন আগুনের কুণ্ডের চারপাশে ঘোরাফেরা করে, হাওয়ায় তাদের শরীর দোল খায়, শিবিরের মাঝখানে একটা মেস্‌কিতে থেকে ঝোলা। আগুন থেকে কুণ্ডলিপাকানো ধোঁয়া এখন তাদের ত্যক্ত করছে না শুধু তাদের কাচের মতো চোখ ঝাপশা ক'রে দিচ্ছে, কালি মাখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে মুখে।

তাদের দিকে তাকিয়ে না-থাকার চেষ্টা করে সে। সে নিজেকে টেনে নিয়ে আসে বেড়ার পাশে, এক কোণায় গুঁড়ি মেরে বসে, বেড়ার গায়ে হেলান দেয় ক্লান্ত শরীর,-যদিও সে টের পায় একটা কেন্নো তার পেটের মধ্যে কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে।

শুনতে পায় কে যেন তার ওপর থেকে বলছে, 'ওদের নামিয়ে নিলেই হয়। আমরা দেরি করছি কেন?'

'অন্যজনের আসার জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা। ওরা তো বলেছিলো তিনজন ছিলো—কাজেই তিনজনই হবে। ওরা বলেছিলো তৃতীয়জন নেহাৎই বাচ্চা, ছেলেমানুষ, কিন্তু তাতে হবে কী, সে-ই লিউটেনান্ট পাব্‌বার জন্যে আড়ালে ওৎ পেতে ছিলো—সবাইকেই নিকেশ ক'রে ফেলেছে, কাউকেই বাদ দেয়নি। অন্যদের মতো তাকেও এ-পথে আসতে হবে—অন্যরা তো আরো বড়ো, অভিজ্ঞতায় দড়ো ছিলো। আমার মেজর বলেন যদি

আজকালের মধ্যে সে না-আসে, তবে প্রথমে যে-ই এদিকটা মাড়াক না কেন তাকেই সাবাড় ক'রে দেবো—তাহ'লেই আমাদের হুকুম তামিল করা হ'য়ে যাবে।'

'তার চেয়ে ভালো হয় না কি যদি আমরা বেরিয়ে গিয়ে তাকে খুঁজে বার করি? তাতে এত একঘেয়ে ও বিরক্তিকর ঠেকবে না।'

'সে আমাদের দরকার নেই। এ-পথে তাকে আসতেই হবে। সবাই তারা কোমানহার সিয়েরার দিকে ছুটেছে, কাতোর্সের রক্ষণশীল দলে যোগ দেবার জন্যে। এরাই শেষ দল। তাদের যেতে দিলে একদিক থেকে ভালো হ'তো—গিয়ে তারা পাহাড়ে আমাদের সাথীদের সঙ্গে লড়াই করতে পারতো।'

'সে তো ভালোই হয়। তা যদি হয় তবে আমাদেরও ওখানে পাঠিয়ে দেবে।'

ফেলিসিয়ানো রুয়েলাস একটু সবুর করে, যতক্ষণ-না তার মনে হ'লো পেটের মধ্যে প্রজাপতিরা অবশেষে শান্ত হয়েছে। তারপর সে হাঁ ক'রে একগাল হাওয়া খেলে, যেন সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর নিজেকে প্রায় মাটিতে মিশিয়ে ফেলে বুকে হেঁটে হাত দিয়ে লগির মতো ঠেলে-ঠেলে এগিয়ে যায়।

যখন সে আরয়োইয়োর ধারে পৌঁছোয় সে তার মাথা তোলে, তারপর ছুটতে শুরু করে ঢ্যাঙা ঘাসের মধ্যে দিয়ে ঘাস সরিয়ে পথ খুলে নিতে-নিতে। যতক্ষণ-না টের পেলে সমতলে আরয়োইয়ো মিলিয়ে গেছে ততক্ষণ সে একবারও ফিরে তাকায়নি অথবা থামেনি।

তারপর, এখন সে থামে। গভীর শ্বাস টানে, কেঁপে-কেঁপে ঢোঁকে-ঢোঁকে হাওয়া খায়।

মনে আছে

মনে আছে উর্বানো গোমেসকে, দোন উর্বানোর ছেলে, দিমাসের নাতি, সেই-যে লোকটা রাখালদের গান পরিচালনা করতো, আর যে মারা গিয়েছিলো 'গর্জন করে শাপভ্রষ্ট, হায়, সেই দেবদূত' আবৃত্তি করতে-করতে, সেবারকার ইনফ্লুয়েন্জার মড়কে। সে অনেকদিন আগেকার কথা, পনেরো বছর হবে বোধ হয়। কিন্তু তাকে তোমার মনে-রাখা উচিত। মনে আছে আমরা তাকে বলতাম 'ঠাকুদ্দা', কারণ তার অন্য ছেলে ফিদেনসিও গোমেসের ছিলো দুটি ভারি দুরন্ত চঞ্চল ছটফটে মেয়ে, একজন কালো আর বেঁটে, হীন একটা ডাকনাম দেয়া হয়েছিলো 'ঠাটিয়াল', আর অন্যজন ছিলো সত্যি দীঘল, তার ছিলো নীল চোখ— আর লোকে তো বলতো সে নাকি আদপেই তার নিজের মেয়ে ছিলো না— আর, তুমি যদি আরো বিশদ বর্ণনা চাও, তবে জেনে রেখো সে হেঁচকি রোগে ভুগতো। মনে আছে একবার সে কী হুলুস্থুল তুলেছিলো, যখন আমরা খ্রীস্টযাগে গিয়েছিলাম আর ঠিক হেসু ক্রিস্তোর উত্থানের মুহূর্তে হেঁচকি তাকে হামলা করলো—মনে হচ্ছিলো সে যেন একইসঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে—যতক্ষণ-না ওরা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে চিনির পানা খাওয়ালো কিছুতেই আর হেঁচকি থামেনি। চিনির পানা খেয়েই সে শান্ত হয়েছিলো। তার শেষ হ'লো লুসিও চিকোকে বিয়ে ক'রে, নদীর ধারের শুঁড়িখানাটার মালিক, এককালে যেটা ছিলো লিব্রাদোর, ঐ যেখানে তেওদ্লোসদের তিশির কলটা আছে।

মনে আছে ওরা তার মাকে বলতো 'বেগুন' কারণ সবসময়েই সে কোনো-না-কোনো ঝামেলা পাকিয়ে ব'সে থাকতো. প্রতিবারই শেষটায় সে এক বাচ্চা বিয়োতো। ওরা বলতো তার নাকি টাকাকড়িও ছিলো কিছু, কিন্তু সবটাই তার গচ্চা গেলো বাচ্চাগুলোকে কবর দিতে দিতে, কারণ তার সব বাচ্চাই জন্মাবার কিছু পরেই ম'রে যেতো আর সে সবসময় তাদের জন্যে খ্রীস্টযাগে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করতো, গান গাইতে-গাইতে তাদের নিয়ে যেতো গোরস্থানে, আর ছেলেদের এক ধর্মগীতের দল গাইতো 'হোসানা' আর 'মহিমা' আর ঐ-যে গানটা 'প্রভু, তোমাকে পাঠালাম আজ আরেকটি শিশু-দেবদূত'।

এইভাবেই সে গরিব হ'য়ে যায়—প্রতিবারেই সৎকারের সময় বিস্তর খরচ হ'তো তার, কারণ সে নিশিজাগরে অতিথিদের পানটান করিয়ে আপ্যায়ন করতো। তাদের মধ্যে শুধু দুটোই বেঁচে গিয়েছিলো, উর্বানো আর নাতালিয়া, যারা জ'ন্মেই ছিলো গরিব, আর সে তাদের বড়ো হ'য়ে উঠতেও ছাখেনি, কারণ শেষবার বিয়োবার সময় সে টেঁশে যায়, তাছাড়া বয়েসও হচ্ছিলো তার, তা প্রায় পঞ্চাশ।

তুমি নিশ্চয়ই তাকে চিনতে, কারণ এমনিতে সে ছিলো হাড়কঞ্জুশ, সবসময়েই হাটে ফিরিউলিদের সঙ্গে তার ঝগড়া বেঁধে যেতো ; যখন তারা টোম্যাটোর জন্যে তার কাছে চড়া দাম হাঁকতো, সে তুমুল শোর তুলে দিতো, বলতো তারা তাকে ঠকিয়ে ফাঁক ক'রে দিচ্ছে। প'রে, যখন সে গরিব হয়ে পড়েছে, তাকে তুমি দেখতে পেতে আঁস্তাকুড় ঘাঁটতে, পেঁয়াজের টুকরো, সেদ্ধ বীন, কিংবা কোনো আখের টুকরো খুঁজে বেড়াচ্ছে, 'তার বাচ্চাদের মুখ মিষ্টি করাবার জন্যে'। তার তো দুজন ছিলো, যেমন এই-যে তোমায় বললাম শুধু ঐ দুজনই কেমন ক'রে যেন টিঁকে গিয়েছিলো। পরে, তার কথা আর-কিছুই জানা যায় না।

ঐ উর্বানো গোমেস ছিলো প্রায় আমাদের বয়েসী—হয়তো কয়েক মাস বড়ো হবে—পয়সা ছুঁড়ে জুয়ো খেলতে আর খেলার জোচ্চুরি করতে মহাওস্তাদ। মনে আছে সে আমাদের লবঙ্গ বিক্রি করতো, আর আমরা তার কাছ থেকে কিনতামও, যদিও অনেক সহজ ছিলো পাহাড়ে গিয়ে নিজের হাতেই সেগুলো তুলে আনা। সে আমাদের কচি আম বিক্রি করতো, স্কুলের পাতিওর আমগাছ থেকে সে কাঁচা আম চুরি করতো, আর বিক্রি করতো বোঁটা-সমেত কমলা যেগুলো সে স্কুলগেটে কিনতো দু-সেণ্ট ক'রে আর আমাদের কাছে বেচতো পাঁচ সেণ্টে। পকেটে যত জঞ্জাল ব'য়ে বেড়াতো সব সে নিলেমে চড়াতো—আগাতা গুলি, লাটিম, বেলুন, এমনকী সবজে আরশোলা সেই যেগুলোর পায়ে যদি সুতো বেঁধে দাও যাতে বেশিদূর আর উড়ে যেতে পারে না আর ছটফট করে। আমাদের সব্বাইকার কাছ থেকে খাশা-খাশা সব জিনিশ আদায় ক'রে নিতো, মনে আছে।

সে ছিলো নাচিতো রিভেরার শালা, ঐ যে- নাচিতো বিয়ের পরেই কেমন জবুথবু আধপাগলা গোছ হ'য়ে যায়, আর তার বৌ ইনেস সংসারের খাঁইখরচা মেটাতে বড়ো রাস্তার ধারে ফলের রসের এক দোকান দিয়েছিলো, এদিকে

নাচিতো সারাদিন কাটাতো বোন রেফুহিওর চুলছাঁটার দোকান থেকে ধার-ক'রে আনা এক ম্যানডোলিনে বেসুরো-সব গান-বাজিয়ে।

আর আমরা উর্বানোর সঙ্গে যেতাম তার দিদিকে দেখতে, ফলের রস খেতে, সবসময় ধারে, ককখনো ধার শুধিনি আমরা, কারণ আমাদের কাছে তো কখনোই কোনো পয়সা থাকতো না। পরে উর্বানোর আর-কোনো ইয়ারবন্ধু রইলো না, কারণ আমরা সবাই তাকে দেখতে পেলেই এধার-ওধার সটকে পড়তাম যাতে ধারের টাকা ফেরৎ চাইতে না-পারে।

কে জানে হয়তো সেইজন্যেই সে বদ হ'য়ে গিয়েছিলো, কিংবা হয়তো জন্ম থেকেই বদ ছিলো।

পঞ্চম বছরের আগেই ওরা তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়, কারণ তার তুতো-বোন 'ঠাটিয়ালের' সঙ্গে হিশিখানার পেছনে একটা শুকনো খাতে ও বর-বৌ খেলছিলো। ওরা তার কান পাকড়ে হ্যাচকা টানে সদর দরজা দিয়ে নিয়ে আসে, ছেলেমেয়েরা সবাই এককজনে ষাটজনের মতো হেসে ওঠে, তাকে নিয়ে-যাওয়া হয় ছেলেমেয়েদের সারের মধ্যে দিয়ে যাতে লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। আর সে মাথা উঁচু ক'রেই গিয়েছিলো, আমাদের সবাইকার দিকে ঘুষি পাকিয়ে, যেন বলতে চাচ্ছিলো: 'এর দাম তোমাদের কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে হবে।'

আর তারপর মেয়েটাকে। 'ঠাটিয়াল' বেরিয়ে এসেছিলো শুকনো মুখ কুঁচকে, চোখ নামানো ছিলো ইটের মেঝেয়, তারপর দরজার কাছে এসেই সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো, সে কী চেরাগলায় ডাক ছেড়ে কান্না, সারা বিকেল তুমি তা শুনতে পেতে, যেন কয়োটিরা ডুকরে কাঁদছে।

তবে তোমার স্মৃতি যদি খুব খারাপ হয় সেটা তোমার মনে পড়বে না।

ওরা দেখেছিলো তার খুড়ো ফিদেনসিও—ঐ যে তিশিকলে কাজ করতো—তাকে ধরে এমন ঠ্যাঙানি দিয়েছিলো যে আধমরাই ক'রে দিয়েছিলো, আর তাতে সে এমন খেপে গিয়েছিলো যে গাঁ ছেড়েই চ'লে গিয়েছিলো।

আমরা যা নিশ্চিত জানতাম তা হ'লো আমরা আশপাশে আর-কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না—যতক্ষণ-না সে পুলিশ হ'য়ে ফিরে এলো। সবসময় সে বড়ো চত্বরটায় বেঞ্চিতে ব'সে থাকতো, দু ঠ্যাঙের মাঝখানে বন্দুক, আর দুই চোখে জলন্ত ঘৃণা নিয়ে সে আমাদের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকতো। অথচ তার দিকে যদি কেউ তাকাতো তো সে এমনভাবে তাকাতো এমন ভান করতো যেন সে তাকে চেনেই না।

এই সময়েই ও তার জামাইবাবুকে খুন করেছিলো, ঐ যে সারাদিন ধ'রে বেসুরো তালে ম্যানডোলিন বাজাতো। নাচিতো ঠিক করেছিলো তার কাছে গিয়ে সেরেনাদ বাজাবে, তখন রাত হ'য়ে গিয়েছে, আটটার একটু পরেই হবে, তখনও ওরা আত্মার পাপমোচনের উদ্দেশে ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজানো থামায়নি, তখন আচমকা সে কী চীৎকার আর্তনাদ, চার্চের লোকেরা তো বললে তাদের জপের মালাই নাকি ছিঁড়ে গিয়েছিলো, আর ওরা দেখতে পেলে: নাচিতো প'ড়ে আছে চিৎপাত, ম্যানডোলিনটা দিয়ে মার আটকাবার চেষ্টা করছে, আর উর্বানো তাকে তার মাউসারের বাঁট দিয়ে কেবল মেরেই চলেছে। লোকে চেঁচিয়ে তাকে কী বলছে কিছুই যেন তার কানে ঢুকছে না—একটা খ্যাপা বুনো জানোয়ার, যেন পাগলা কুকুর। শেষটায় একজন—সে এমনকী এ-তল্লাটের লোকই ছিলো না—ভিড় ঠেলে এসে তার কাছে গিয়ে মাউসারটা কেড়ে নিয়ে পেল্লায় এক ঘা কষালে পিঠে, তাকে একেবারে বাগানের বেঞ্চিতে অজ্ঞান ক'রে ফেলে দিলে—আর সে প'ড়েই রইলো ওখানে, হাত-পা ছড়িয়ে।

ওরা তাকে ওখানেই রাতটা কাটাতে দিলে। যখন দিনের আলো ফুটলো, সে ওখান থেকে চ'লে গেলো। ওরা বলে প্রথমে সে গিয়েছিলো চার্চে, গিয়ে পুরুতের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলো, কিন্তু পুরুৎ তাকে আশীর্বাদ করেননি।

ওরা তাকে গ্রেফতার করেছিলো রাস্তায়। খোঁড়াচ্ছিলো সে, যখন সে জিরিয়ে নেবার জন্যে একটু বসেছে, ওরা তার নাগাল ধ'রে ফেললে। সে কোনো বাধাই দেয়নি। ওরা বলে সে নিজেই দড়িটা জড়িয়ে ছিলো গলায়, এমনকী ওরা যাতে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে, কোন গাছ থেকে ভালো হবে, সেটাও সে নিজেই বেছে দিয়েছিলো।

তোমার নিশ্চয়ই তাকে মনে আছে, কারণ স্কুলে আমরা একই ক্লাসে পড়তাম, আর আমি তাকে যতটা জানতাম তুমিও তাকে ততটাই চিনতে।

কোনো কুকুর ডাকে না

'ওপরে আছিস তো, ইগনাসিও! কিছুই শুনতে পাচ্ছিস না তুই? কোনো আলো চোখে পড়ছে না কোথাও?'

'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'এতক্ষণে তো কাছে এসে পড়ার কথা।'

'হ্যাঁ, তবে আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

'ছাখ, ভালো ক'রে ছাখ। বেচারা ইগনাসিও!'

লোক দুটির লম্বা কালো ছায়া শুধু ওপরে ওঠে নিচে নামে, ওঠে পাথুরে টিলার ওপর, কখনও ছোটো হয়, কখনও বড়ো হয় যখন ছায়া এগোয় খালের পাশ দিয়ে। একটাই টলোমলো ছায়া, যেন ঘুরে-ঘুরে কাটিম থেকে বেরোয়।

মাটির মধ্য থেকে চাঁদ বেরিয়ে এলো গোল শিখার মতো।

'এতক্ষণে তো ঐ শহরটায় এসে পড়ার কথা, ইগনাসিও। তোর কান তো আর ঢাকা নেই, কাজেই চেষ্টা ক'রে ছাখ শুনতে পাস কি না কোনো কুকুর ডাকছে কি না কোথাও। মনে আছে, ওরা আমাদের বলেছিলো তোনাইয়া হচ্ছে ঠিক পাহাড়টার ওপাশে, আড়ালে। আর সে-যে কত ঘণ্টা হ'লো পাহাড় পেরিয়ে এসেছি। মনে আছে, ইগনাসিও?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো কিছুরই কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি যে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছি।'

'নামিয়ে দাও আমাকে।'

বুড়ো একটু পেছিয়ে যায় পুরু এক দেয়ালের কাছে, এ কাঁধ থেকে ও-কাঁধ করে বোঝা, কিন্তু ঘাড় থেকে নামায় না। যদিও তার পা দুটো ভেঙে পড়ছে ভারে, তবু সে বসতে চায় না, কারণ তাহ'লে সে আর তার ছেলের শরীরটা তুলতে পারবে না কাঁধে—অনেক ঘণ্টা আগে ওরা ধরাধরি ক'রে তাকে তুলে তার কাঁধে বেঁধে দিয়েছে। সে তাকে ব'য়ে নিয়ে এসেছে সারাটা পথ।

'কেমন লাগছে তোর?'

'খারাপ।'

ইগনাসিও বেশি কথা ব'লেনি। কথা ক্রমেই ক'মে এসেছে। মাঝে-মাঝে মনে হয় ঘুমিয়েই পড়েছে বুঝি। মাঝে-মাঝে মনে হয় শরীরটা তার ঠাণ্ডা; সে কাঁপে যখন তাকে কাঁপুনি ধরে; তার পা দুটো তার বাবার দু-পাশে চেপে বসে, ঘোড়ার পাছায় নালের মতো। তারপর হাত দুটো, বাবার গলায় জড়ানো, মাথাটা চেপে ধরে, তাকে এমনভাবে নাড়ায় যেন সে একটা ঝুমঝুমি।

বাবা দাঁতে দাঁত চেপে ধরে, যাতে জিভে কামড় না-পড়ে, আর যখন কাঁপুনির রেশ থেমে যায়, জিগেশ করে: 'খুব কি ব্যথা লাগছে?'

'একটু,' ইগনাসিও জবাবে বলে।

গোড়ায় ইগনাসিও বলেছিলো, 'এখানেই নামিয়ে দাও—এখানে আমায় ছেড়ে যাও—তুমি একাই চ'লে যাও। কালকেই আমি তোমার নাগাল ধ'রে ফেলবো—একটু ভালো বোধ করলেই ঠিক নাগাল ধ'রে ফেলবো।' এই কথাই সে বলেছিলো। অন্তত বার পঞ্চাশ। এখন সে আর এ-কথা বলে না।

ঐ তো চাঁদ। তাদের মুখোমুখি। মস্ত রাঙা চাঁদ যেটা তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় আলোয় আর টেনে লম্বা ক'রে কালো ক'রে দেয় তার ছায়া মাটির ওপর।

'কোথায় যে যাচ্ছি এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' বাবা বলে। কোনো সাড়া নেই।

কাঁধের ওপর ছেলে জ্যোৎস্নায় আলো হ'য়ে উঠেছে। তার মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর; রক্তহীন ইগনাসিও ফিরিয়ে দিচ্ছে অস্বচ্ছ আলো। আর এখানে সে, নিচে।

'শুনছিস, ইগনাসিও, কী বললাম? বলছি যে আমি তোকে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছি না।'

কোনো সাড়া নেই।

টলতে-টলতে, বাবা পথ চলে। নুয়ে পড়ে শরীর, বেঁকে যায়, তারপর খাড়া ক'রে তোলে, পরক্ষণেই আবার নুয়ে পড়ার জন্যে।

'এটা কোনো রাস্তাই নয়। ওরা বলেছিলো তোনাইয়া ঠিক পাহাড়ের পেছনেই। পাহাড়টা আমরা পেরিয়ে এসেছি। আর তুই তোনাইয়া দেখতে পাচ্ছিস না—কোনো শব্দ শুনছিস না যা থেকে মনে হবে তোনাইয়া কাছেই? ওপরে, ওখান থেকে, তুই কী দেখছিস কেন তা আমাকে বলছিস না, ইগনাসিও?'

'আমাকে নামিয়ে দাও, বাবা।'

'খারাপ লাগছে তোর?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোকে তোনাইয়া নিয়ে যাবোই। সেখানে নিশ্চয়ই কাউকে পেয়ে যাবো যে তোর দেখাশুনো করতে পারবে। ওরা বলেছিলো শহরে নাকি এক ডাক্তার আছে। আমি তোকে তার কাছে নিয়ে যাবো। অত ঘণ্টা ধ'রে যখন তোকে ব'য়েই এনেছি, এখন আমি তোকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না যে কেউ এসে তোকে সাবাড় ক'রে দিক।'

সে একটু টলোমলো করলো। পাশের দিকে গেলো দু-তিন পা, তারপর আবার সোজা হ'য়ে উঠলো।

'তোকে আমি তোনাইয়া নিয়ে যাবোই।'

'নামিয়ে দাও আমায়।'

তার স্বর কেমন মিনমিন করছে, ক্ষীণ মর্মরও নয়। 'আমি একটু ঘুমোতে চাই।'

'কাঁধেই ঘুমো। আমি তো তোকে ভালোভাবে ধ'রে আছি।'

চাঁদ আরো উঠে এসেছে, প্রায় নীল, স্বচ্ছ আকাশে। এবার বুড়োর মুখ, ঘামে ভেজা, আলোর ছটায় ভ'রে যায়। সে তার চোখ নামায় যাতে নাকবরাবর সামনে তাকাতে না-হয়, বিশেষত যখন সে মাথা নামাতে পারছে না, তার ছেলে তাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধ'রে আছে।

'এত-সব কিন্তু আমি তোর জন্যে করছি না। সব করছি শুধু তোর মরা মায়ের জন্যে। কারণ তুই তারই ছেলে। তোর মা আমায় হানা দিতো যদি আমি তোকে যেখানে দেখতে পেয়েছিলাম সেখানেই ফেলে রেখে চ'লে যেতাম। যাতে তুই সেরে উঠিস সেই জন্যেই তোকে ব'য়ে নিয়ে আসছি। সে-ই আমাকে সাহস দেয়, তুই নোস। গোড়া থেকেই তুই আমার মাথা কাটা যাবার মতো কাজ ছাড়া আর-কিছু করিসনি, শুধুই ঝামেলা পাকিয়েছিস, লজ্জা বাড়িয়েছিস।'

কথা বলতে-বলতে সে দরদর ক'রে ঘামে। কিন্তু রাতের হাওয়া তার ঘাম শুকিয়ে দেয়। আর সেই শুকনো ঘামের পল্লার ওপর সে আবার ঘামে।

'আমার পিঠ ভাঙে ভাঙুক, তবু তোকে নিয়ে আমি তোনাইয়া পৌঁছুবোই,

যাতে ওরা তোর জখমগুলোয় একটু আরাম দিতে পারে। আমি ঠিক জানি একটু ভালো হ'লেই তুই আবার তোর নষ্টামি শুরু ক'রে দিবি। কিন্তু তাতে আমার আর কিছুই এসে-যায় না। যতক্ষণ তুই দূরে থাকিস, যেখান থেকে তোর কীর্তিকলাপের কিছুই আমার কানে পৌঁছুবে না, ঠিক আছে। আমার কাছ থেকে তুই যে রক্ত পেয়েছিস তাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। আমি অভিশাপ দিচ্ছি আমার অংশটাকে। দিয়েছি। বলেছি, "ওকে আমি যে-রক্ত দিয়েছি তা যেন ওর বৃক্কয় প'চে যায়।" বলেছি, যেই শুনেছি তুই খারাপ রাস্তা বেছে নিয়েছিস—চুরি-ডাকাতি শুরু করেছিস, মানুষ মারিস—ভালো-ভালো মানুষকে খুন করিস। আমার পুরোনো বন্ধু ত্রানকিলি-নোকে যেমন খুন করেছিস—সে কিনা তোকে দীক্ষা দিয়েছিলো—সে-ই কি না নামকরণ করেছিলো তোর। তারও কপাল খারাপ, তোর মুখোমুখি পড়েছিলো। সেই থেকে আমি বলেছি, "কিছুতেই এ আমার ছেলে হ'তে পারে না।"

'ঘাখ, এখন কিছু তোর চোখে পড়ে কি না। কিংবা কিছু শুনতে পাস কি না। তোকেই ওপর থেকে এটা করতে হবে, কেননা আমার কানে যেন তালা ধ'রে গেছে।'

'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'তোরই কপাল খারাপ, ইগনাসিও।'

'আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

'সেটা তোকে সহ্য করতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই কাছাকাছি এসে গিয়েছি। কারণ এখন রাত নিশুত, ওরা হয়তো শহরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তুই অন্তত কুকুরের ডাক শুনতে পাবি। শোনবার চেষ্টা কর।'

'আমাকে একটু জল দাও।'

'এখানে কোনো জল নেই। শুধু পাথর। তোকে এ-তেষ্টা সহ্য করতে হবে। জল যদি থাকতোও আমি তোকে জল খাবার জন্যে নামাতাম না। ফের যে তোকে কাঁধে ওঠাতে সাহায্য করবে এমন-কেউ এখানে নেই, আর আমি তা একা-একা সামলাতে পারবো না।'

'আমার ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে—ঘুম-ঘুম লাগছে।'

'আমার মনে আছে তুই যখন জন্মালি। তখনও তুই ঐরকমই ছিলি। খিদেয় জেগে উঠতি, খেতিস তারপর, ফের ঘুমুতিস। তোর মাকে তোকে জল খাওয়াতে হ'তো কারণ তুই তার বুকের দুধ সব শেষ ক'রে ফেলেছিলি।

কিছুতেই তোকে ভরা পেট করা যেতো না। আর তুই সবসময় খ্যাপার মতো চিল্লাতিস। তখন আমি ভুলেও ভাবিনি যে ঐ খ্যাপামি পেট থেকে তোর মাথায় চ'লে যাবে। কিন্তু গেলো। তোর মা—ভগবান তাকে শান্তিতে রাখুন—চেয়েছিলো বড়ো হ'য়ে তুই তাগড়াই জোয়ান হোস। ভেবেছিলো বড়ো হ'য়ে তুই তার দেখাশুনো করবি। তার তো শুধু তুইই ছিলি। অন্য যে-বাচ্চাটাকে সে জন্ম দিতে গিয়েছিলো সে-ই তাকে মেরেছে। বেঁচে থাকলে তুইও আবার তাকে মারতিস—যদি সে বেঁচে থাকতো এখনও।'

তার পিঠের ওপর ছেলেটা তার হাঁটু দিয়ে তাকে খোঁচা দেয়া বন্ধ করেছে, পাশ থেকে পাশে ল্যাগবেগেভাবে তার পাগুলো দোল খায়; আর বাবার মনে হয় ইগনাসিওর মাথাটা, ঐ ঘাড়ের ওপর, কাঁপছে—যেন সে কান্নায় ফুলে-ফুলে উঠছে।

তার চুলে—সে টের পায়—বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়ছে।

'কাঁদছিস তুই, ইগনাসিও? মায়ের কথা মনে হ'তেই কান্না পেলো—তাই না? কিন্তু তুই তো তার জন্যে কিছুই করিসনি। তুই আমাদের কোনো প্রতিদানই দিসনি। কেমন ক'রে তোর শরীরটা দয়ামায়ার বদলে খারাপ কিছুতে ভ'রে গেলো? আর দেখছিস এখন? ওরা শরীরটা টুটাফুটা ক'রে দিয়েছে। তোর ইয়ারবক্সি'গুলোর কী হ'লো? সব ক-টা খুন হয়েছে। তাদের তো আর কেউ ছিলো না। তারা বলতেও পারতো, "ভাববার মতো কেউ নেই আমাদের।" কিন্তু তুই, ইগনাসিও, তুই?'

...

অবশেষে শহর। সে দেখতে পায় জ্যোৎস্নায় চালগুলো চকচক করছে। তার মনে হয় তার ছেলের ভার তাকে পিষে ফেলছে, শেষ একটা হ্যাঁচকা চেষ্টায় সে হাঁটুতে আবার জোর আনে। প্রথম ঝুপড়িটায় যখন সে পৌঁছুলো, সে পায়েচলার পথের পাশের এক দেয়ালে হেলান দেয়। সে নামিয়ে আনে শরীরটা, ল্যাগবেগে, যেন তার কাঁধ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নামিয়েছে।

অনেক চেষ্টা ক'রে কাঁধ থেকে সে তার ছেলের আঙুল টেনে খোলে। অবশেষে যখন সে বোঝা নামায় সে শুনতে পায় চারপাশে কুকুর ডাকছে।

'আর তুই তাদের ডাক শুনতে পাসনি, ইগনাসিও?' সে বলে: 'তুই এমনকী আমায় শুনতেও সাহায্য করিসনি!'

'আমি অনেক দূরে চ'লে যাচ্ছি, বাবা, সেইজন্যে কথাটা তোমায় জানাতে এলাম।'

'কেউ জিগেশ করতে পারে কি, তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

'আমি উত্তরে চ'লে যাচ্ছি।'

'উত্তরে কেন? তোর ব্যাবসা কি এখানে নয়? তুই এখনও শুওরের ব্যাবসা করিস তো, না কী—কিনিস না শুওর।'

'করতাম। কিন্তু আর নয়। তাতে কিছুই হাতে আসে না। গত হপ্তায় আমরা খাবার কেনবার মতো পয়সাও পাইনি, তার আগের হপ্তায় আমরা ঘাস-পাতা খেয়ে ছিলাম। আমরা ক্ষুধার্ত, বাবা। তুমি তা বুঝতেও পারবে না কখনও, কেননা তোমার তো তোফা খানাপিনার ব্যবস্থা আছে।'

'কী বলছিস তুই?'

'যে আমরা ক্ষুধার্ত। ভুখা। তুমি তা বুঝতে পারবে না। তুমি তোমার হাউই আর পটকা আর আতশবাজি আর আগরবাতি বেচো, আর তাতে তোমার দিব্যি চ'লে যায়। যতদিন ফিয়েস্তাগুলো থাকবে, মেলা-টেলা পরব-টরব থাকবে, তোমার থলেয় টাকা বর্ষাবে; কিন্তু আমার দশা তেমন নয়, বাবা এই মরশুমে কেউই আর এখন শুওর পালছে না। আর যদি তারা পালেও, তো তারা সেগুলো নিজেরাই খেয়ে ফ্যালে। আর যদি-বা কখনও বিক্রি করে, চড়া দাম হাঁকে, আর, তাছাড়া, সে-সব কেনবার মতো পয়সাই নেই আর। ব্যাবসা আমি গুটিয়ে ফেলেছি, বাবা।'

'আর উত্তরে গিয়ে তুই কোন শয়তানি পাকাবি, শুনি?'

'তা, টাকা করবো। জানো তো কারমেলো বড়োলোক হ'য়ে ফিরে এসেছে, এমনকী একটা গ্রামোফোন অব্দি নিয়ে এসেছে, গান শুনতে চাইলে পাঁচ সেন্তাভো ক'রে পয়সা চায়। যে-কোনো গানের জন্যেই পাঁচ সেন্তাভো, কুবার নাচ থেকে শুরু ক'রে ঐ যে অ্যাণ্ডারসন মেয়েটি করুণ-করুণ সব গান গায়—সবকিছুর জন্যেই একদর—আর ভালোই কামাচ্ছে ও, ওরা গান শোনবার

জন্যে এমনকী সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। কাজেই, দেখছো তো, একবার উত্তরে গিয়ে ফিরে আসতে পারলেই হ'লো—কেল্লাফতে। সেইজন্যেই আমি যাচ্ছি।'

'আর তোর বৌ-বাচ্চাকে কোথায় রেখে যাবি শুনি?'

'হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো তোমায় বলতে এসেছি, যাতে তুমি ওদের দেখাশুনো করো।'

'আর আমাকে তুই কী পেয়েছিস, শুনি? আমি তোর দাই বুঝি—না কি আয়ী-মা? যদি তুই যাস, তবে ঈশ্বর তাদের দেখাশুনো করবেন। আমি আর বাচ্চা-কাচ্চা মানুষ করতে পারবো না এখন; তোকে আর তোর বোনকে—আহা, তার আত্মা শান্তি পাক—পালতে গিয়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। এখন থেকে আমি আর-কোনো গোলমাল চাই না। কথাতেই তো বলে: ঘণ্টা যদি না-ই বাজে / সে তো শুধু এই কারণে ভেতরে তার হাতুড়ি নেই / সমস্তটাই ভীষণ বাজে / যতই ভালো আকার দাও, ফক্কিবাজির নেই জুড়ি নেই।'

'তোমাকে যে আমি কী বলবো বাবা, তা-ই জানি না; আমি এমনকী তোমাকে আজকাল চিনতেও পারি না। তুমি যে আমাকে বড়ো করেছিলে তা থেকে কোন ফায়দাটা আমার হয়েছে? শুধু খাটুনি আর খাটুনি। এই পৃথিবীতে যেই তুমি আমায় আনলে সেই থেকে শুধু গায়ে-গতরে খেটে নিজের দেখাশুনো নিজেকেই আমায় করতে হয়েছে। তুমি এমনকী আমায় এই আতশবাজি বানানোও শেখাওনি যাতে তোমার সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতা না-হয়। জামাপ্যাণ্ট পরালে তুমি আমায়, রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এলে, বললে নিজেরটা এখন নিজেই কামাও—শুধু একপ্রস্থ জামাপ্যাণ্ট পরিয়ে বাড়ি থেকে প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছিলে। এখন ভাখো তার ফল: আমরা উপোশ ক'রে মরছি। তোমার ছেলের বৌ, তোমার নাতি-নাৎনি আর তোমার এই ছেলে, ওরা যেমন বলে—সব তোমারই বংশধর—এখন অক্কা পেতে বসেছি, ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে মরতে বসেছি। আর আমাকে যেটা সবচেয়ে খেপিয়ে দেয় সেটা হ'লো এই বোধটা—যে মরছি পেটের জ্বালায়, খিদেয়। তোমার কি ধারণা সে খুব সৎকাজ হচ্ছে—নির্ভেজাল ভালো কাজ?'

'তাতে আমার কী? তুই বিয়ে করতে গিয়েছিলি কেন? বাড়ি ছেড়ে নিজেই কেটে পড়েছিলি, একবারও আমার অনুমতি অব্দি নিসনি।'

'বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলাম কারণ তুমি কখনো ত্রানসিতোকে ভালো মেয়ে ব'লে মনে করোনি। যতবারই ওকে বাড়ি নিয়ে এসেছি তুমি ওকে আকথা-

কুকথা ব'লে পেড়ে ফেলতে; আর মনে আছে, প্রথমবার যখন ওকে বাড়ি নিয়ে এলাম তুমি এমনকী ওর দিকে তাকিয়েও ভাখোনি। "ভাখো, বাবা, এই মেয়েটির সঙ্গে আমি থাকবো।" তুমি ছড়া কাটতে শুরু করলে এই ব'লে যে "কতই চিনি, শাদা বা ধলা / আগা, পাশ এবং তলা," যেন ও কোনো রাস্তার মেয়েছেলে, আর এ ছাড়াও তুমি একগাদা কী-সব বলেছিলে যার মানে আমি কখনও বুঝতেও পারিনি। সেইজন্যেই আমি ওকে আর ফিরিয়ে আনিনি। যদি সেইজন্যে তুমি মনে মনে আমার প্রতি রাগ পুষে রাখো। এখন আমি চাচ্ছি, তুমি শুধু ওর একটু দেখাশুনো কোরো — আমি কিন্তু সত্যি-সত্যি যাচ্ছি। এখানে আমার করার কিছু নেই — আর করার মতো কোনো কাজ যে পাবো তারও কোনো ভরসা নেই।'

'যত-সব বাজে কথা আবর্জনার ঝুড়ি, বলতে তোর এখনও নেই জুড়ি। তুই কাজ করিস খাবার জন্যে, খাস কাজ করার জন্যে। আমার জ্ঞানবুদ্ধি থেকে শেখ। আমি বুড়ো হয়েছি বটে কিন্তু কোনো নালিশ করি না। যখন আমি অল্পবয়েসী ছিলাম, তা, তোকে না-বললেও হয়, আমাকে এমনকী মেয়েছেলের জন্যেও পয়সা দিতে হ'তো। যেমন ছিলো কপাল আমার, যেমন ছিলো ভাগ্যি / দু-চার পেসো না-ফেললে সব মেয়েও ছিলো কী মাগ্‌গি! কাজ করলে সবকিছুর দাম মেলে, বিশেষ ক'রে শরীরের সব খাঁই মেটানো যায়। মুশকিল হচ্ছে, তুই একটা বুড়বাক। আর এটা বলিসনি যে আমিই তোকে হাঁদা হ'তে শিখিয়েছি।'

'কিন্তু তুমিই আমাকে এই পৃথিবীতে এনেছো। আর তোমারই উচিত ছিলো জীবনের পথে আমায় দাঁড় করিয়ে দেয়া — ঘোড়ার মতো মাঠে ঘাস খেতে পাঠিয়ে দেয়া নয়।'

'তুই যখন বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেলি, দিব্যি তো তালেবর লায়েক হ'য়ে উঠেছিলি। না কি তুই আশা করিস যে চিরকাল আমি তোর দেখাশুনো করবো। শুধু গিরগিটিরাই গর্ত খোঁজে, গর্তে ঢুকে কাটায় জীবন যদ্দিন-না চক্ষু বোজে। বল যে তখন তোর ভালোই লেগেছিলো, তোর একটা মেয়েছেলে ছিলো, বাচ্চাকাচ্চা হয়েছিলো — অন্য অনেকের তো সারা জীবনে তাও জোটে না — তারা শুধু যেন নদীর জল — এলো গেলো কোনখানে যে, কোথায় পাবি চিহ্ন, বল।'

'তুমি আমাকে এমনকী ছড়া বাঁধতেও শেখাওনি — অথচ তুমি জানতে কী ক'রে ছড়া কাটে। যদি তাও জানতাম, তাহ'লেও হয়তো দু-পয়সা কামাতে

পারতাম। আর যেদিন তোমায় বলেছিলাম, "আমায় একটু শেখাবে," তুমি বলেছিলে, "যা, গিয়ে ডিম বেচ, তাতে অনেক বেশি পয়সা আসে।" আর গোড়ায় আমি ডিমই বেচতাম, পরে মুরগি, তারপর শুওর, আর যদি বলতে দাও তো বলি, সেটা খুব খারাপও কাটেনি। তবে টাকা খরচ হ'য়ে যায়; বাচ্চাকাচ্চা হয়; জলের মতো ঢোঁক-ঢোঁক ক'রে তারা সব টাকা গিলে ফ্যালে, তারপর ব্যাবসার জন্যে কিছুই আর থাকে না, আর কেউই তোমার সঙ্গে ধারে কারবার করবে না। আমি তো আগেই তোমাকে বলেছি, গত হপ্তায় আমরা আগাছা খেয়ে ছিলাম, আর এ-হপ্তায়-এমনকী তাও নেই। সেইজন্যেই আমি চ'লে যাচ্ছি। যেতে আমার কষ্ট লাগছে, বাবা, যদিও তুমি তা বিশ্বাস করবে না, কারণ আমি আমার ছেলেমেয়েগুলোকে ভালোবাসি, তোমার মতো নই, যে একটু বড়ো ক'রেই তাদের রাস্তায় বার ক'রে দেবো।'

'এটা শিখে রাখ, বাছা—প্রতি নয়া নীড়ে, যাও ডিম পেড়ে। যখন বার্ধক্য আর জরা তোর গায়ে ডানা বুলোতে শুরু করবে, শুধু তখনই তুই শিখতে পারবি কেমন ক'রে বাঁচতে হয়, তখন জেনে যাবি ছেলেমেয়েরা বড়ো হ'লে তোকে ছেড়ে চ'লে যাবে, যে কিছুর জন্যেই তারা কৃতজ্ঞ হয় না, যে তারা তোর স্মৃতিটা শুদ্ধু খেয়ে ফ্যালে।'

'এ একেবারে বিশুদ্ধ বাজে কথা।'

'হ'তে পারে, তবে সত্যি-সত্যি এইই হয়।'

'আমি যে তোমাকে ভুলিনি তা তো দেখতেই পাচ্ছো।'

'তুই আমার খোঁজে এসেছিস, যখন আমাকে তোর দরকার পড়েছে। যদি তোর সব ভালোভাবে কাটতো, তুই আমার কথা ভুলে যেতিস। তোর মা মারা যাবার পর থেকে আমি একা আছি, একেবারে একলা, নিঃসঙ্গ; যখন তোর দিদি মারা গেলো, আরো নিঃসঙ্গ; যখন তুই আমায় ছেড়ে চ'লে গেলি আমি দেখলাম যে আমি চিরকালের মতো একা হ'য়ে পড়লাম। এখন তুই এসে আমার দয়ামায়া উথলে দিতে চাচ্ছিস, কিন্তু তুই জানিস না কোনো মরা মানুষকে গ্রহণ করা আরো কঠিন—নতুন জীবন দেবার চাইতেও। কিছু-একটা শেখ। লোকে তো কত-কী শেখে—রাস্তায়-ঘাটে, ঠেকে। নিজেকেই ঝাড়ো ধন—আছে তো নিজের ঝাড়ন। তোর এটাই করা উচিত।'

'তাহ'লে আমার হ'য়ে তুমি ওদের দেখাশুনো করবে না?'

'ছেড়ে চ'লে যা ওদের, খিদেয় কেউ কখনও মরে না।'

'শুধু বলো তুমি অন্তত সেটা করবে কি না ; নিশ্চিত না-জেনে আমি যেতে চাই না।'

'মোট ক-জন আছে ?'

'শুধু তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে, আর ছেলের বৌ – সে এখনও সত্যি কচি আছে।'

'বলতে চাচ্ছিস সত্যি খাশা মাল।'

'আমিই ওর প্রথম। ও কুমারী ছিলো। ভালো মেয়ে ও। ওর প্রতি দয়া কোরো, বাবা।'

'আর তুই ফিরবি কবে ?'

'শিগগিরই, বাবা। হাতে কিছু টাকা পেলেই আমি ফিরে আসবো। তুমি ওদের জন্যে যত খরচ করবে, তার দুনো ফিরিয়ে দেবো। শুধু ওদের দুটি খেতে দিয়ো, মাত্র এটুকুই আমি তোমার কাছে কৃপা চাচ্ছি।'

...

র‍্যান্‌চগুলো থেকে লোকে গ্রামগুলোয় নেমে আসে মাঝে-মাঝে, গাঁয়ের লোকেরা যায় শহরে। শহরে লোকে হারিয়ে যায়, গিশগিশে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। 'জানো, কোথায় ওরা আমায় কাজ দেবে ?' 'হ্যাঁ, সিউদাদ হুয়ারেস-এ চ'লে যাও। দুশো পেসো পেলে আমি তোমায় পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে যাবো। গিয়ে সেনিওর অমুকের খোঁজ কোরো, বোলো যে আমি তোমায় পাঠিয়েছি। কিন্তু, খবরদার, আর-কাউকে বোলো না কিন্তু।' 'ঠিক আছে, ওস্তাদ – কালই আমি টাকা নিয়ে আসবো।'

'শোনো, ওরা বলে যে রেলগাড়ি থেকে মাল খালাশ করবার জন্যে ওরা লোক চায় নোনোআল্‌কোতে।'

'ভালো মজুরি দেয় তো ?'

'নিশ্চয়ই। প্রতি পঁচিশ পাউণ্ড মালের জন্যে দুই পেসো।'

'ঠিক বলছো তুমি ! সত্যি ? কাল আমি এক টন কলা নামালাম মের্‌সেদ বাজারের পেছনে, আর ওরা আমায় শুধু খেতে দিলে। ওরা চাউর ক'রে দিলে যে আমি নাকি ওদের মাল চুরি করেছি, একটা সেন্‌তাভো অব্দি দিলে না, উলটে পুলিশের কাছে আমার নামে নালিশ করলে।'

'রেলের কারবার অন্যরকম। তারা ও-রকম নয়। দেখি, তোমার যথেষ্ট সাহস আর তাকৎ আছে কি না।'

'থাকবে না কেন?'

'কাল আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

...

আর হ্যাঁ, সকাল থেকে রাত্তির অব্দি রেল থেকে মাল খালাশ করার পরেও পরের দিনের জন্যে কাজ থেকে যায়। ওরা মজুরিও দিয়ে দেয় তখুনি। আমি গুনে দেখেছি টাকা: চুয়াত্তর পেসো। যদি রোজ এ-রকম হ'তো!

'ওস্তাদ, এই নাও তোমার দুশো পেসো।'

'চমৎকার! আমি তোমায় একটা চিরকুট দিয়ে দিচ্ছি—সিউদাদ হুয়ারেস-এ আমাদের দোস্তের জন্যে। এটা হারিয়ো না কিন্তু। সে তোমায় লুকিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে নিয়ে যাবে; আর, তাছাড়া, তুমি চুক্তিমাফিক কাজও পেয়ে যাবে। এই-যে ওর ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর, যাতে চট ক'রে তুমি ওকে খুঁজে পাও। না-না, তুমি টেক্সাস যাচ্ছো না। অরেগনের নাম কখনও শুনেছো? বেশ। ওকে বোলো যে তুমি অরেগনে যেতে চাচ্ছো। আপেল পাড়তে, হ্যাঁ, তা-ই—না, তুলোর খেতে নয়। দেখতেই পাচ্ছি তুমি চালাকচতুর আছো। সেখানে গিয়ে তুমি ফের্নান্দেসের সঙ্গে দেখা কোরো। ওকে চেনো না তুমি? তাহ'লে ওর খোঁজ কোরো। আর যদি আপেলখেতে কাজ করতে না-চাও, তবে রেললাইনে আড়কাঠ পাতবার কাজ পাবে। তারা বেশি টাকাও দেয়, কাজও অনেকদিন থাকে। অনেক ডলার নিয়ে তুমি ফিরে আসবে। হ্যাঁ, কার্ডটা হারিয়ো না কিন্তু।'

...

'বাবা, ওরা আমাদের মেরে ফেলেছে।'

'কাদের?'

'আমাদের। যখন আমরা নদী পেরুচ্ছি। ওরা বুলেট দিয়ে আমাদের ঝাঁঝরা ক'রে দেয়—সব্বাইকে মেরে ফেলেছে ওরা।'

'কোথায়?'

'ওখানে, এল্ পাসো দেল্ নোর্তেয়, আমরা যখন নদী পেরুচ্ছি ওরা তখন আমাদের ওপর আলো ফেলেছিলো।'

'কেন?'

'তা আমি জানি না, বাবা। এস্তানিস্লাদোকে, মনে আছে তোমার? ও-ই আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলো। ও-ই বলেছিলো কেমন ক'রে সব করতে

পারবো আমরা, প্রথমে আমরা গেলাম মেহিকোনগরীতে, সেখান থেকে এল্ পাসোয়। যখন আমরা নদী পেরুচ্ছি, ওরা রাইফেল তুলে আমাদের গুলি করলো। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম, কারণ ও আমায় বলেছিলো, "এখান থেকে আমায় নিয়ে চলো, দোস্ত, আমায় ছেড়ে চ'লে যেয়ো না।" আর ততক্ষণে ও চিৎ হ'য়ে পড়েছে, শরীরটা ঝাঁঝরা, ঢিলে হ'য়ে গেছে পেশী। আমি তাকে টেনে নিয়ে এলাম যতটা সাধ্য, টেনে-টেনে, যেদিকটায় আলো ফেলছে তার একপাশ দিয়ে, আলোর বাইরে যাবার চেষ্টা করতে-করতে। "বেঁচে আছো কি?" জিগেশ করলাম আমি। আর সে উত্তরে বললে, "এখান থেকে আমায় নিয়ে চলো, দোস্ত," তারপর আমায় বল:ল, "ব্যাটারা আমায় পেড়ে ফেলেছে।" আমার একটা হাত বুলেটে থেঁৎলে গিয়েছিলো, কনুই থেকে হাড় বেরিয়ে গিয়েছিলো। সেইজন্যেই ভালো হাতটা দিয়ে ওকে পাকড়ে ধ'রে বললাম, "হাতটা জোরে ধ'রে থাকো।" কিন্তু তীরে এসে সে আমার গায়ের ওপরেই ম'রে গেলো, ওহিনাগা ব'লে একটা জায়গায়, আলোর কাছে, নদীর এ-পাশে, শরবনে, নলখাগড়াগুলো তখনও দুলে-দুলে নদীর জল আঁচড়াচ্ছিলো, যেন কিছুই হয়নি।

'আমি ওকে তীরে টেনে তুলে বললাম, "এখনও বেঁচে আছো তো?" কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি সে আমায়। এস্তানিস্লাদোকে বাঁচাবার চেষ্টায় ভোর অব্দি যুদ্ধ করলাম আমি। মালিশ করলাম গায়ে, ফুশফুশে ডলাইমলাই করলাম, যাতে শ্বাস নেয়, কিন্তু কোনো ফুঁ এলো না তার।

'বিকেলবেলায় আমার কাছে অভিবাসন দফতরের লোক এলো।

'"এই-যে, হ্যাঁ, তুমি, তুমি এখানে কী করছো?"

'"কেন, আমি মরা লোকটার দেখাশুনো করছি।"

'"তুমি ওকে মেরেছো বুঝি?"

'"না, সার্জেন্ট." আমি বললাম।

'"আমি সার্জেন্ট নই। তাহ'লে কে মেরেছে?"

'যেহেতু তার গায়ে ছিলো উর্দি, ঐ ছোটো-ছোটো ঈগলগুলো বসানো উর্দি, আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি ফৌজের লোক, আর এত-বড়ো এক পিস্তল ছিলো ওর যে আমার কোনোই সন্দেহ ছিলো না।

'তারপর সে আমায় আবার জিগেশ করলে: "তো কে মেরেছে?" সারাক্ষণ লেগে রইলো সে, আমার সঙ্গে, চুলের মুঠি ধ'রে ঝাঁকালো, আমি কোনো বাধা দিইনি, কারণ আমার ভাঙা কনুই নিয়ে আমি ওর সঙ্গে লড়তে পারতাম না।

‘ আমি তাকে বললাম, “আমায় মারবেন না—আমার কুললে একটা হাতই আস্ত আছে।”

‘ সেটা তাকে থামালো।

‘ বললো : “কী হয়েছে? সব আমায় খুলে বলো।”

‘ “মানে, ওরা কাল রাতে আমাদের গুলি করেছিলো। আমরা দিব্যি খোশমেজাজেই যাচ্ছিলাম, শিস দিতে-দিতে, অন্য তীরে যাচ্ছি তো, যখন ঠিক নদীর মাঝটায় তখন গুলিগোলার হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো। কেউ তাদের থামাতেও পারেনি। আমি আর এ-লোকটাই শুধু কোনোক্রমে ফিরে আসতে পেরেছি, আর তাও অংশত, কারণ দেখছেন তো, এও অক্কা পেয়েছে।”

‘ “আর গুলি করেছিলো কারা?”

‘ “তাদের আমরা চোখেও দেখিনি। শুধু আমাদের ওপর ওদের আলো ফেলেই গুড়ুম গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ, শেষে কনুইটা ছিঁড়ে গেলো আমার, আর শুনলাম এ-লোকটা বলছে : আমায় জল থেকে তুলে নিয়ে চলো, দোস্ত। কিন্তু কারা গুলি করছে দেখেও আমাদের কোনো ভালো হ'তো ব'লে মনে হয় না।”

‘ “তাহ'লে ওরা নিশ্চয়ই আপাচে হবে।”

‘ “কোন আপাচে?”

‘ “ওঃ, একদল লোক থাকে ওপাশে, নিজেদের ওরা আপাচে বলে।”

‘ “কিন্তু ওপাশে ওরা টেক্সান নয়?”

‘ “হ্যাঁ, টেক্সান, তবে তোমার ধারণা নেই কত-কত আপাচেয় থিকথিক করছে জায়গাটা। আমি ওহিনাগায় গিয়ে বলছি তোমার দোস্তকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে—আর তুমি তোমার বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হ'য়ে যাও। কোত্থেকে আসছো তুমি? বাড়ি ছেড়ে-আসা তোমার ঠিক হয়নি। সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে?”

‘ “এই ক-টা পয়সা এই মরা লোকটার কাছ থেকে নিয়েছি আমি; দেখি, এ-পয়সায় ফিরে যেতে পারি কি না।”

‘ “ঐ পুনর্বাসীদের জন্যে আমার তহবিলে কিছু টাকা আছে। আমি তোমার ভাড়া দিয়ে দেবো; কিন্তু যদি তোমায় ফের কখনও এখানে দেখি, তাহ'লে নিজের ধাক্কা তুমি নিজেই সামলাবে। একই মুখ দু-বার দেখতে আমার ভালো লাগে না। ভাগো এবার, পথ ত্যাখো!”

'আর আমি ফিরে এসেছি, বাবা, এই আমি এখানে—তোমাকে সব বলতে এসেছি।'

'আকাট বোকা হ'লে লোকের এমনি হয়। আর বাড়ি গেলেই দেখতে পাবি কী হয়েছে—গিয়ে তোর কী লাভ হ'লো সব টের পেয়ে যাবি।'

'খারাপ-কিছু হয়েছে নাকি? বাচ্চাদের কেউ মরেছে?'

'ত্রানসিতো খচ্চরের গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভেগে গিয়েছে। তুই বলেছিলি সে সত্যি খাশা মাল ছিলো, বলিসনি? তোর বাচ্চাকাচ্চারা এখানেই ঘুমোচ্ছে। আর রাত কাটাবার জন্যে তুই গিয়ে অন্য জায়গার খোঁজ করতে পারিস, কারণ খরচের ধাক্কা সামলাতে আমি তোর বাড়ি বেচে দিয়েছি। আর তুই এখনও তিরিশ পেসো ধারিস আমার কাছে, দলিলের খরচ।'

'ঠিক আছে, বাবা, তোমাকে টাকা দিতে আপত্তি করবো না। হয়তো কাল এখানে কোনো কাজ জুটিয়ে নিতে পারবো যাতে তোমার কাছে যত টাকা ধারি সব শোধ ক'রে দিতে পারি। ত্রানসিতোকে নিয়ে খচ্চরের গাড়ির গাড়োয়ান কোন দিকে গেছে বললে?'

'ঐ দিকে হবে। আমি খেয়াল করিনি।'

'তাহ'লে আমি চট ক'রে ফিরে আসবো: আমি ওকে আনতে যাচ্ছি।'

'আর তুই কোনদিকে যাচ্ছিস এখন?'

'ঐ দিকে, বাবা, যেদিকে তুমি বললে ত্রানসিতো গিয়েছে।'

আনাক্লেতো মোরোনেস

সব ক-টা বুড়ি, শয়তানের সব মেয়ে! আমি দেখতে পেলাম তারা সব একসাথে মিছিল ক'রে আসছে। কালো-কালো পোশাক গায়ে, তপ্ত সূর্যের তলায় খচ্চরগুলোর মতো দরদর ক'রে ঘামছে। আমি তাদের দেখতে পেলাম অনেক দূর থেকে, যেন তারা একদল খচ্চর ধুলো উড়িয়ে আসছে। তাদের মুখগুলো এখন ধুলোয় ধূসর, যেন ছাইমাখা। সব তারা কালো। তারা আসছে আমুলা সড়ক ধ'রে, গান গাইতে-গাইতে; যখন প্রখর রোদ্দুর প্রার্থনা করছে সবাই, মস্ত-সব কালো-কালো পটিবাঁধা অংসফলকে, যার ওপর বড়ো-বড়ো ফোঁটায় তাদের ঘাম ঝ'রে পড়ছে।

তাদের আসতে দেখলাম আমি আর নিজেকে লুকিয়ে রাখলাম। তাদের কী মৎলব আমি জানতাম, জানতাম কাকে তারা খুঁজছে। সেইজন্যেই আমি তাড়াহুড়ো ক'রে উঠোনের পেছনে লুকিয়ে পড়তে চ'লে গেলাম, হাতে পাৎলুনজোড়া নিয়েই আমি ছুটেছিলাম।

কিন্তু তারা ভেতরে এসে আমাকে খুঁজে বার করলো। তারা বললো: 'ধন্য ঈশ্বরের মাজননী!'

আমি একটা পাথরের ওপর উবু হ'য়ে বসেছিলাম, করছিলাম না কিছুই, শুধু বসেছিলাম, পাৎলুনটা নামিয়ে, যাতে তারা আমায় দেখে আর কাছে না-আসে। কিন্তু তারা শুধু বললো, 'ধন্য ঈশ্বরের মাজননী!', আর এগিয়েই আসতে লাগলো।

বদখৎ সব বুড়ি! কদর্য! নিজেদের নিয়ে তাদের লজ্জা হওয়া উচিত! তারা বুকে ক্রুশ আঁকলো আর সোজা আমার সামনে এসে হাজির হ'লো, সবাই গায়ে-গায়ে চেপে লেগে আছে, একটা গোছা যেন, দরদর ক'রে ঝরাচ্ছে ঘাম আর তাদের ভেজা চুল লেপটে আছে চোখেমুখে যেন বেশ একপশলা বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্ছে।

'আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, লুকাস লুকাতেরো! আমুলা থেকে আসছি আমরা, শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে! কাছের ওরা

বললো তুমি বাড়িতেই আছো ; তবে আমরা এটা ভাবিনি যে তুমি এত পেছনে এসে এ-রকম করবে। আমরা ভেবেছি তুমি মুরগিগুলোকে খাওয়াতে এখানে বেরিয়ে এসেছো ; সেইজন্যেই আমরাও ভেতরে এসে ঢুকেছি। আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি !'

বদখৎ সব বুড়ি ! কুৎসিত ! জিনলাগামের দগদগে ঘায়ে-ভরা খচ্চরের মতো বুড়ো আর কুৎসিত !

'কী চাও, বলো !' আমি তাদের বললাম পাঁৎলুনে বোতাম লাগ'তে-লাগাতে। আর তারা চোখ ঢাকলো যাতে না-দেখতে হয়।

'আমরা একটা সদুদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি। সান্তো সানতিয়াগো আর সান্তো ইনেস-এ তোমার খোঁজ করেছিলাম আমরা, কিন্তু ওরা আমাদের বললো এখন আর তুমি ওখানে থাকো না ; যে, তুমি এই র‍্যান্‌চে থাকতে এসেছো। আর তাই আমরাও এখানে এসেছি। আমরা আমুলা থেকে আসছি।'

আমি তো এর মধ্যেই জানি তারা কোত্থেকে আসছে, তারা কে ; আমি এমনকী এক-এক ক'রে তাদের নামগুলোও আওড়াতে পারতাম, কিন্তু আমি এমন ভঙ্গি করলাম যেন তাদের আমি চিনি না।

'তা, লুকাস লুকাতেরো, বেশ হ'লো, অবশেষে আমরা তোমাকে পেয়েছি—ঈশ্বরের কৃপায়।'

আমি তাদের পাতিওতে নেমন্তন্ন ক'রে আনলাম, ভেতর থেকে নিয়ে এলাম কতগুলো চৌকি যাতে তারা বসতে পারে। আমি তাদের জিগেশ করলাম কারু খিদে পেয়েছে কি না কিংবা তারা কি ঠোঁট ভেজাতে চাইবে কিছু দিয়ে—নিদেন এক কলসি জলই যদি হয়।

অংসফলকের আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে তারা এক-এক ক'রে ব'সে পড়লো।

'না, ধন্যবাদ,' তারা বললে, 'আমরা তোমাকে বিরক্ত করতে আসিনি। আমরা একটা সৎ উদ্দেশ্যে এসেছি। তুমি তো চেনো আমাকে, লুকাস লুকাতেরো, চেনো না ?' তাদের একজন আমায় জিগেশ করলে।

'বোধহয়,' আমি তাকে বললাম। 'মনে তো হয় তোমাকে কোথায় যেন আগে দেখেছি। তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চা ফ্রেগোসো নও, সেই পাঞ্চা যে ওমোবোনো রামোসকে তাকে তুলে নিয়ে যেতে দিয়েছিলো ?'

'হ্যাঁ, আমিই—কিন্তু কেউ আমাকে তুলে নিয়ে যায়নি। সে শুধু বিশুদ্ধ

খারাপ কথা কেবল। আমরা দুজনে জাম কুড়োতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমি গির্জেয় যাই, আমি ককখনো তাকে—'

'কী, পাঞ্চা?'

'আহ্, কী অসৎ মন তোমার, লুকাস। এখনও লোকের নামে নানা দুষ্কর্মের নালিশ ক'রে বেড়ানোর স্বভাবটা তোমার যায়নি। তবে, এখন যখন তুমি আমায় চিনেছো, আমি তোমায় স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে চাই আমরা কেন এসেছি।'

'এক গেলাশ জলও খাবে না?' আবার আমি তাদের জিগেশ করলাম।

'না, ব্যস্ত হোয়ো না। তবে তুমি যখন এত ক'রে বলছো তখন আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাই না।'

আমি তাদের একটা কলসি ভর্তি জল এনে দিলাম, চিরহরিতের সুগন্ধি মেশানো, আর তারা ঢকঢক ক'রে সে-জল খেলে। তারপর আমি আরো-এক কলস জল আনলাম, তারা সে-জলও খেয়ে ফেললে। তারপর আমি নদীর জলে ভরা একটা কলস তাদের সামনে রেখে দিলাম। তারা সেটা সেখানেই রেখে দিলে, পরে খাবে ব'লে, কারণ তাদের মত অনুযায়ী, যখন তাদের পরিপাকযন্ত্র কাজ করতে শুরু ক'রে দেবে তখন তাদের খুব তেষ্টা পাবে।

দশ-দশজন মেয়ে, সার বেঁধে বসেছে, ধুলোয় তাদের কালো পোশাক নোংরা হ'য়ে আছে। পনসিয়ানা, এমিলিয়ানো, ফ্রেসেনসিয়ানো, সরাইওলা তোরিবিও আর নাপিত আনাস্তাসিও-র মেয়ে তারা।

মাদি কুকুর একেকটা, তাও আবার বুড়ি! এদের কেউই আর কোনো-কিছুর যোগ্য নয়। সব্বার বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। শুকনো, বিবর্ণ সব বুনোফুলের মতো রসকষহীন। এদের মধ্য থেকে বাছাইয়ের কোনো ব্যাপারই নেই।

'তা কীসের খোঁজ করছো তোমরা?'

'আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তা, আমাকে তো এখন দেখলে। আমি চমৎকার আছি। আমাকে নিয়ে তোমাদের মিথ্যে ভাবতে হবে না।'

'এই গোপন আস্তানায় আসতে তুমি অনেকটা রাস্তা পেরিয়েছো। কোনো ঠিকানা নেই কোথাও, কেউ জানে না তুমি কোথায় গেছো। অনেক জিগেশ টিগেশ ক'রে তবেই তোমার খোঁজ পেলাম আমরা—অনেকটা সময় নষ্ট ক'রে।'

'আমি লুকোইনি। এখানে থাকতে আমার ভালো লাগে, লোকে বিরক্ত করে না তাই ভালো। আর কী তোমাদের সেই মহৎ অভিপ্রায় যা তোমাদের এখানে টেনে এনেছে—সেটা কেউ জিগেশ করতে পারে কি?' আমি তাদের বললাম।

'মানে সেটা হচ্ছে—না-না, আমাদের খাবার জন্যে কোনো রসুই পাকাতে হবে না। লা তোরকাসিতার বাড়িতে আমরা আগেই খেয়ে নিয়েছি। ওরা আমাদের সবাইকেই খাইয়েছে ওখানে। কাজেই এখন আমাদের কথা শোনো। এখানে আমাদের মুখোমুখি বোসো যাতে তোমাকে আমরা দেখতে পারি আর তুমিও আমাদের কথা শুনতে পারো।'

অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। আবার উঠোনে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিলো। মুরগিগুলোর রুক্ষ কোঁকরকো শুনতে পেলাম খরগোশে খেয়ে ফেলবার আগেই ডিমগুলো কুড়িয়ে আনতে চাচ্ছিলাম আমি।

'আমি ডিমগুলো নিয়ে আসতে যাচ্ছি,' আমি তাদের বললাম।

'কিন্তু সত্যি আমরা আগেই খেয়ে নিয়েছি। আমাদের নিয়ে ব্যস্ত হ'তে হ'তে হবে না।'

'দুটো খরগোশ সবসময় আশপাশে ঘুরঘুর করে, তারা সব ডিম খেয়ে ফ্যালে। আমি যাবো আর আসবো।'

আর আমি উঠোনে বেরিয়ে এলাম।

ফেরবার মৎলব আমি করিনি; শুধু যে-দরজাটা পাহাড়ের দিকে মুখ-করা সেটা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আর এই আকাট হাঁদা হাবড়াগুলোকে অসহায় ফেলে যাওয়া, সেটাই ইচ্ছে ছিলো আমার।

এককোণায় যে-নুড়িপাথর জড়ো ক'রে রেখেছি তার দিকে তাকালাম আমি, আর দেখতে পেলাম একটা কবরের আকার। তখন আমি নুড়িপাথরগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলাম, চারপাশে ছুঁড়ে ফেললাম, এখানে একটা সারি বানালাম, ওখানে একটা। এগুলো সব নদীর পাথর, গোল-গোল, আমি তাদের অনেক দূর অব্দি ছুঁড়ে ফেলতে পারি। গোল্লায় যাক বুড়িগুলো। আমাকে তারা খাটাচ্ছে। বুঝতেই পারলাম না মাথায় তাদের কী গজিয়েছে যে দল বেঁধে সবাই এখানে হাজির হয়েছে।

কাজটা শেষ ক'রে ভেতরে চ'লে এলাম আমি।

ডিমগুলো তাদের দিলাম।

'খরগোশগুলো মেরে ফেললে নাকি? দেখলাম তাদের ভাগ ক'রে টিল ছুঁড়ছো। ডিমগুলো আপাতত থাক। তোমার এত ঝামেলা করার দরকার ছিলো না।'

'তোমাদের মাইয়ের মধ্যে ডিমগুলো ফেটে ছানা বেরিয়ে যেতে পারে, কাজেই ডিমগুলো বরং বাইরেই রেখে দাও!'

'ওহ্, লুকাস লুকাতেরো, তুমি! এখনো তেমনি অসভ্য কথায় মগজ ভর্তি! যেন এখনও আমরা অত গরম আছি।'

'সে-সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। তবে বাইরে এখানে তো বেজায় গরম!'

আমি যা করতে চাচ্ছিলাম তা হ'লো অনির্দেশ্য কাল তাদের দিয়ে বাজে বকানো—যাতে একটা কথা, একটা বিশেষ কথা, তারা পাড়তে না পারে। চাচ্ছিলাম অন্যদিকে তাদের মনটা চালিয়ে দিতে। এই ফাঁকে কী ক'রে এদের কাটানো যায়, কী করা যায় যাতে তারা আর এখানে ফিরে আসতে না-চায়। কিন্তু কোনো ফন্দিই গজালো না মাথায়।

আমি জানি তারা আমাকে সেই জানুয়ারি থেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে, আনাক্লেতো মোরোনেস উধাও হ'য়ে যাবার কিছু পর থেকেই। সত্যি-যে শুনেছিলাম আমুলার গির্জের জমায়েতের বুড়িগুলো আমার হদিশ জানতে চাচ্ছে। একমাত্র শুধু তাদেরই আনাক্লেতো মোরোনেস সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল থাকার কথা। এবং, এখন, তারা এখানে এসে হাজির।

আমি তাদের সঙ্গে আজেবাজে কথা চালিয়ে যেতে পারি, কিংবা কোনোভাবে তাদের কৃপাও পেয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি, যতক্ষণ-না রাত আসে। রাত এলে তাদের চ'লে যেতে হবে। তারা কেউ আমার বাড়িতে রাত কাটাবার দুঃসাহস করবে না।

মুহূর্তের জন্যে বিষয়টা উঠে পড়েছিলো, যখন পান্‌সিয়ানোর মেয়ে বললে যে তারা চট ক'রে কথাটা শেষ ক'রে ফেলতে চায় যাতে তারা তাড়াতাড়ি আমুলা ফিরে যেতে পারে। তখন আমি তাদের বোঝালাম যে ফেরবার ব্যাপার নিয়ে তাদের ভাবতে হবে না, যদি তাদের কয়েকজনকে মেঝেতেও শুতে হয়, যথেষ্ট জায়গা আর খড়ে-ভরা জাজিম আছে তাদের জন্যে। তারা সবাই বললে যে এ নিয়ে তারা ভাবতেই চায় না, কারণ লোকে যখন জেনে যাবে যে শুধু একা-একা আমার সঙ্গে তারা রাতটা এখানে কাটিয়েছে তখন তারা কী বলবে। উঁহু, নিশ্চয়ই না।

ফলে একটাই কাজ, রাত্তির না-আসা অব্দি এটা-সেটা নিয়ে কথা বলা, ওদের মাথায় যে-ভাবনাটা ভোঁ-ভোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে অন্য বিষয় নিয়ে ওদের ভাবানো। তাদের একজনকে আমি জিগেশ করলাম, 'আর তোমার স্বামীই বা কী বলে?'

'আমার কোনো স্বামী নেই, লুকাস। তোমার মনে নেই আমিই একসময় তোমার মধুরা ছিলাম। তোমার জন্যে ব'সেই রইলাম, ব'সেই রইলাম আর সারা জীবন শুধু ব'সে-থাকা ছাড়া আর-কিছুই করলাম না। তারপর জানতে পেলাম যে তুমি বিয়ে করেছো। ততদিনে কেউই আর আমাকে চায় না।'

'আর আমি? আসলে আমি অন্য-সব ঝামেলায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম, সে-সবে এত ব্যস্ত ছিলাম অ্যাদ্দিন; তবে এখনও সময় আছে তো!'

'কিন্তু তুমি তো বিবাহিত, লুকাস লুকাতেরো, আর যার-তার সঙ্গে নয়, স্বয়ং দিব্য শিশুর মেয়ের সঙ্গে। মিছেমিছি আমার আশাকে উশকে দিতে চাচ্ছে কেন? আমি এমনকী তোমায় ভুলেও গিয়েছি!'

'কিন্তু আমি তো ভুলিনি। তোমার নাম কী বললে না?'

'নিয়েভেস – আমার নাম এখনও নিয়েভেস। নিয়েভেস গার্সিয়া। আমাকে কাঁদিয়ো না, লুকাস লুকাতেরো। তোমার মধুর-মধুর সব প্রতিশ্রুতির কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বালা ধ'রে যায়।'

'নিয়েভেস – নিয়েভেস! তোমাকে কী ক'রে ভুলি বলো তো! কেন, তুমি তো এমন-একজন যাকে কেউ ভোলে না – কী চিক্কণ মসৃণ তুমি, আমার মনে আছে। এখনও আমি তোমার স্পর্শ পাই বুকে-বাহুতে। মসৃণ, নরম। যখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে তোমার পোশাকের গন্ধে থাকতো কর্পূর আর আমার বুকে আরাম ক'রে প্রায় মিশেই যেতে তুমি। এত জোরে তুমি আমায় জড়িয়ে ধরতে যে আমার অস্থিতে-মজ্জায় অব্দি আমি তোমাকে টের পেতাম। মনে আছে আমার।'

'এমন কথা আর বোলো না, লুকাস। গতকাল আমি পাপস্বীকার করতে গিয়েছিলাম, আর তুমি এক্ষুনি খারাপ-খারাপ চিন্তা জাগিয়ে দিচ্ছো আমার মধ্যে, ইচ্ছে হয় পাপ করি।'

'আমার মনে পড়ে তোমার হাঁটুর পেছন দিকে আমি চুমু খেতাম। আর তুমি বলতে, না-না, ওখানে নয়, বড্ড শুড়শুড়ি লাগে। এখনও কি তোমার হাঁটুর পেছনে টোল পড়ে?'

'বরং চুপ ক'রে থাকো। লুকাস লুকাতেরো। তুমি আমাকে যা করেছো ঈশ্বর তা কখনও ক্ষমা করবেন না। তার জন্যে তোমায় বিষম মাশুল দিতে হবে।'

'তোমার সঙ্গে খারাপ-কিছু করেছিলাম নাকি আমি? হীন-কিছু করেছিলাম?'

'তাকে আমায় ছুঁড়ে ফেলতে হয়েছে। আর সে-সম্বন্ধে লোকের সামনে সবকিছু ফাঁস ক'রে দিতে আমায় বোলো না। তবে তুমি যাতে জানো তাই বলি— আমি তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। একটা শুঁটকি মাংসের ডেলা ছিলো তা। আর তাকে আমি ভালোবাসবো কেন বলো তো, যদি তার বাপ হয় নির্লজ্জ এক নিষ্কর্মা।'

'তাহ'লে ঘটেছিলো তা? আমি জানতাম না। আরেকটু চিরহরিতের জল খাবে? গন্ধ মিশিয়ে দিতে বেশিক্ষণ লাগবে না আমার। শুধু একটা মুহূর্ত।'

আমি আবার বাইরে বেরিয়ে এলাম মার্টল কাটতে। আর সেখানে আমি যতক্ষণ পারি দেরি করলাম যাতে সেই মেয়েটা তার বদমেজাজ কাটিয়ে ওঠে।

যখন আমি ফিরে এলাম, দেখি, সে চ'লে গিয়েছে।

'চ'লে গিয়েছে ও?'

'হ্যাঁ, গেছে। তুমি ওকে কাঁদিয়ে দিয়েছিলে।'

'আমি শুধু তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, সময় কাটাতে চাচ্ছিলাম একটু। তোমরা কি কখনও খেয়াল করেছো এখানে বৃষ্টি নামে কত দেরি ক'রে? আমুলায় অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই বৃষ্টি পড়েছে। পড়েনি?'

'হ্যাঁ, পরশুদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছিলো।'

'আমুলা যে একটা ভালো জায়গা, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। সেখানে ভালো বর্ষা হয়, ভালোভাবে একজন থাকতে পারে সেখানে। শপথ ক'রে বলতে পারি মেঘেরা এ-তল্লাট একেবারেই মাড়ায় না। রোহাসিয়ানো কি এখনও পুরপিতা নাকি?'

'হ্যাঁ, এখনও।'

'রোহাসিয়ানো মানুষটা ভালো।'

'না, সাক্ষাৎ অমঙ্গল।'

'হয়তো তুমিই ঠিক বলেছো। আর এদেলমিরোর কী খবর? তার ওষুধের দোকানটা এখনও বন্ধ?'

'এদেলমিরো মারা গেছে। মরেছে, ভালোই হয়েছে; যদিও আমার এ-কথা বলা উচিত নয়, তবে সেও আরেকটা অসৎ লোক ছিলো। দিব্যশিশু আনাক্লেতো সম্বন্ধে যারা খারাপ-খারাপ কথা বলতো, তাদের মধ্যে সেও ছিলো একজন। সে নালিশ করতো যে আনাক্লেতো নাকি জ্যোতিষী আর হাতুড়ে, আর জোচ্চর ঠক ফেরেব্বাজ। সবখানে সে এ-সব কথা ব'লে বেড়াতো। কিন্তু লোকে তার কথায় কানই দেয়নি আর ঈশ্বরই শেষটায় তাকে সাজা দিয়েছেন। সে জলাতঙ্কে মরেছিলো।'

'ঈশ্বর করুন ও যেন জাহান্নামে পচে।'

'আর শয়তানরা যেন তার ওপর জ্বালানি কাঠ চাপাতে কখনও ক্লান্ত না-হয়।'

'সেই একই জিনিশ ঘটেছিলো লিরিও লোপেসের, সেই ন্যায়মূর্তির যে তার দলে ভিড়ে গিয়ে দিব্যশিশুকে হাজতে পাঠিয়েছিলো।'

এখনও তারাই কথা বলছে। যত প্রাণ চায় সব তাদের বলতে দিলাম, যতক্ষণ তারা আমাকে বাদ দিয়ে রাখে, সব ঠিক থাকবে। কিন্তু হঠাৎ তাদের আমাকে জিগেশ করবার খেয়াল চাপলো: 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে?'

'কোথায়?'

'আমুলায়। সেইজন্যেই আমরা এসেছি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে।'

মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছে করলো আবার উঠোনে বেরিয়ে যাই, চুপিসাড়ে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে, ঐ-যে-দরজাটা পাহাড়ের দিকে মুখ-করা, গিয়ে হাওয়া হ'য়ে যাই। কদর্য সব বুড়ি!

'আর আমুলায় আমি কোন শয়তানের সঙ্গে কারবার করবো?'

'আমরা চাই তুমি আমাদের সঙ্গে প্রার্থনায় চলো। দিব্যশিশু আনাক্লেতোকে যারা মানতাম, আমরা সবাই, সব মেয়ে, মিলে একটা নোভেনা শুরু করেছি, এই কথাই আর্জি করতে যে তাঁকে সান্তো বানিয়ে দেয়া হোক। তুমি তার জামাই, দামাদ, তোমাকে আমরা সাক্ষী হিশেবে চাই। অলৌকিক সব কীর্তির জন্যে বিখ্যাত হবার আগে তাঁকে যে অনেকদিন ধ'রে ভালো ক'রে জানতো, বিশেষ ক'রে এমন-কাউকে যেন আমরা নিয়ে আসি—পুরুৎ আমাদের বলেছেন। আর তোমার চাইতে যোগ্য আর কে আছে—তুমি তার পাশে-পাশে থাকতে, অন্য-কারু চেয়ে তুমিই ভালো দেখিয়ে দিতে পারবে তাঁর দয়া আর কৃপার

কীর্তিগুলো। সেইজন্যেই তোমাকে আমাদের প্রয়োজন, যাতে তুমি আমাদের এই প্রচারে মদত দিতে পারো।'

কদর্য সব বুড়ি! ঢলঢলে! এ-কথা তাদের আগেই বলা উচিত ছিলো।

'আমি যেতে পারবো না,' তাদের আমি বললাম, 'আমার বাড়ির দেখাশুনো করবার মতো কেউ নেই।'

'দুটি কচি মেয়ে থাকবে এখানে, সব দেখাশুনো করবে। সে-কথা আমরা ভেবেছি। তাছাড়া তোমার বৌ আছে।'

'আমার কোনো বৌ নেই আর।'

'কেন, তোমার বৌ-এর আবার কী হ'লো? দিব্যশিশু আনাক্লেতোর মেয়ের?'

'সে চ'লে গিয়েছে। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু তা তো হয় না, লুকাস লুকাতেরো। বেচারা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে। এত ভালো মেয়ে ছিলো। আর এত কচি বয়েস, এত সুন্দরী। লুকাস, তুমি ওকে কোথায় পাঠালে? যদি তুমি ওকে অনুতাপিনীদের আশ্রমে পাঠিয়ে থাকো, তাহ'লে অন্তত একটু সন্তোষ পাবো আমরা।'

'আমি তাকে কোথাও রাখিনি, পাঠাইনি। ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। আর আমি নির্ঘাৎ জানি অনুতাপিনীদের আশ্রমে সে নেই; বেজায় বেহায়া ছিলো, অসচ্চরিত্র আর বড্ড কামুক; নিশ্চয়ই রাস্তা ধরেছে ও—প্যান্টের বোতাম খুলতে-খুলতে।'

'আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি না, লুকাস, এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে বিশ্বাস করি না। হয়তো এখানেই আছে ও, এই বাড়ির কোনো ঘরে বন্ধ হ'য়ে আছে, জপ করছে, প্রার্থনা আওড়াচ্ছে। চিরকালই তুমি বড্ড মিছে কথা বলতে, মিথ্যে সাক্ষীও দিতে। মনে পড়ে, লুকাস, এরমেলিন্দোর বেচারি মেয়েগুলোর কথা, যাদের শেষটায় এমনকী এল্ গ্রুইয়োতে চ'লে যেতে হয়েছিলো, কেননা লোকে তাদের দেখলেই "কবুতরের গান" শিস দিতো, রাস্তায় মুখ দেখবামাত্র, সবসময়—আর সব কি না তোমার মাথা থেকে বেরুনো গুজবটার জন্যে। তুমি যে কী বলো না-বলো, তা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না, লুকাস লুকাতেরো।'

'সে যাক গে, আমুলায় যাবার কোনো কারণ আমার নেই তাহ'লে।'

'প্রথমে তুমি পাপস্বীকার করবে—তারপর সব ঠিক হ'য়ে যাবে। শেষ কবে তুমি পাপস্বীকার করেছিলে?'

'ওঃ! তা প্রায় বছর পনেরো আগে। সেই যখন ক্রিস্তেরোরা আমায় গুলি ক'রে মারতে চাচ্ছিলো। তারা আমার পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে পুরুতের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছিলো, আর আমি এমন-সব পাপস্বীকার করেছিলাম যা আমি তখনও করিনি।'

'এ-তথ্যটা যদি ঠিক না-হ'তো যে তুমি দিব্যশিশুর জামাই, আমরা তোমার খোঁজে আসতামই না, আর, তাছাড়া, তোমার কাছে কিছু চাইতামও না। চিরকালই তুমি ডাহা শয়তান ছিলে, লুকাস লুকাতেরো।'

'কোনো কারণে আমি আনাক্লেতো মোরোনেসের শাগরেদ হ'য়ে ছিলাম। সে-ই ছিলো সত্যিকার জ্যান্ত শয়তান।'

'পাপকথা বোলো না।'

'তোমরা তো ওকে চেনো না।'

'আমরা তাঁকে সান্তো হিশেবে জানি।'

'কিন্তু সে যে সান্তোদের এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচে দেয়—তা তো জানতে না।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছো, লুকাস?'

'তোমরা তা জানতে না-পারো তবে সান্তোদের ও হাটে বিক্রি করতো। মেলায়, গির্জের দোরগোড়ায়। ওর জন্যে আমি মস্ত সব বোঁচকা ব'য়ে নিয়ে যেতাম। আর যেতাম আমরা দুজনে, একজনের পেছনে আরেকজন, গ্রাম থেকে গ্রামে। আমার সামনে সান পান্তালেওন, সান আম্‌ব্রোসিও, সান পাস্‌কুয়ালের নোভেনাগুলো নিতো বোঁচকায়, যার ওজন হ'তো কম ক'রেও পচাত্তর পাউণ্ড।

'একদিন ক-জন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিলো। আনাক্লেতো একটা পিঁপড়ের ঢিবির ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছিলো, আমায় দেখাচ্ছিলো কেমন ক'রে তুমি যদি তোমার জিভ কেটে কামড় দিয়ে থাকো, তবে পিঁপড়েরা তোমায় কামড়াবে না। তারপর তীর্থযাত্রীরা পাশ দিয়ে যাচ্ছে—ওকে তারা দেখেছিলো। এই আজব দৃশ্যখানা দেখবার জন্যে তারা থেমে গিয়েছিলো। তারা জিগেশ করেছিলো, "কী ক'রে তুমি পিঁপড়ের ঢিবির ওপর ব'সে থাকতে পারো অথচ পিঁপড়েরা তোমায় কামড়ায় না।"

'তখন বুকে হাত ভাঁজ ক'রে ও তাদের বলতে থাকে, কেমন ক'রে সে সত্ত রোম থেকে এসে পৌঁছেছে, সেখান থেকে কী মঙ্গলবার্তা নিয়ে এসেছে, আর কেমন ক'রেই বা সে বাহক হয়েছে সেই দিব্য ক্রুশকাঠের একটা টুকরোর যে-ক্রুশে হেসু ক্রিস্তোকে চাপানো হয়েছিলো।

'তারা ওকে তক্ষুনি কাঁধে তুলে নিলে। তারা একটা খাটুলিতে ক'রে ওকে নিয়ে এলো আমুলায়। আর সে-ই হ'লো গিয়ে শেষ সীমা—লোকে তার সামনে দণ্ডবৎ পড়লো, তাকে অলৌকিক কাজকারবার করতে বললো। আর সে-ই হ'লো গিয়ে সূচনা। আর আমি হা ক'রে তাজ্জব হ'য়ে তার কাণ্ড দেখছিলাম, যারা তাকে দলে-দলে দেখতে আসছে সেই দর্শনার্থীদের সে কী ক'রে ভাঁওতা দিয়ে ঠকাচ্ছে।

'তুমি শুধু কথার ঢেঁকি, তার চেয়েও খারাপ, আকথা-কুকথার ঢেঁকি। ওঁকে জানবার আগে তুমি নিজে কী ছিলে? চরাতে তো শুওর। আর উনি তোমায় বড়োলোক ক'রে গেছেন। এখন তোমার যা-কিছু আছে সব উনি তোমাকে দিয়েছেন। আর এমনকী সে-কথা ভেবেও তুমি ওঁর সম্বন্ধে দুটো ভালো কথা বলতে পারো না! নচ্ছার! অকৃতজ্ঞ!'

'তা আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ বৈ কি—আমার খিদে মেটাবার জন্যে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তা তো আর এই তথ্যটা উড়িয়ে দেয় না যে সে ছিলো জ্যান্ত শয়তান একখানা? এখনও তা-ই আছে—যেখানেই ও থাকুক।'

'উনি স্বর্গে গেছেন। দেবদূতদের মধ্যে। তোমার পছন্দ হোক চাই না-ই হোক, উনি ওখানেই আছেন।'

'আমি শুনেছি হাজতে গেছে।'

'সে অনেককাল আগে। সেখান থেকে উনি পালিয়ে এসেছেন। কোনো চিহ্ন না-রেখেই উনি উধাও হ'য়ে যান। এখন উনি কায়মনেআত্মায় সরাসরি স্বর্গেই আছেন। আর ওপর থেকে উনি আমাদের আশীর্বাদ বিতরণ করছেন। এই মেয়েরা! হাঁটু গেড়ে বসো। এসো, আমরা "প্রভু, আমরা অনুতাপিনী" জপ করি—যাতে দিব্যশিশু আমাদের তরফে কথা বলতে পারেন।'

আর ঐ বুড়িগুলো হাঁটু গেড়ে বসলো, জপমালার সবচেয়ে বড়ো বীজগুলো যেই এলো, অমনি তারা চুমু খেলে অংসফলক, যেখানে বুনে রাখা হয়েছিলো আনাক্লেতো মোরোনেসের ছবি।

বেলা তখন তিনটে বাজে।

আমি সেই ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে কিছু বীন আর তাকো খেয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি এখনও পাঁচজন স্ত্রীলোক র'য়ে গেছে।

'অন্যদের কী হ'লো?' আমি তাদের জিগেশ করলাম।

পাঙ্কা—তার গোঁফের চারটে চুল রোঁয়ার মতো কাঁটা কাঁটা হ'য়ে উঠেছে—আমায় বললে: 'ওরা চ'লে গেছে। ওরা তোমার সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক রাখতে চায় না।

'আরো সরেশ হ'লো। যত কম খচ্চর, তত কম ভাবনা। তোমাদের কি চিরহরিৎ-দেয়া জল চাই আরো?'

তাদের একজন, ফিলোমেনা, যে সারাক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো আর যাকে সবাই ডাকে মৃতা ব'লে, ছুটে চ'লে গেলো আমার একটা ফুলের টবের দিকে, আর গলায় আঙুল দিয়ে বার ক'রে আনলে যত চিরহরিৎ মেশানো জল সে খেয়েছিলো, সঙ্গে সসেজের টুকরো আর ফলের বিচিও মেশানো: 'আমি তোমার চিরহরিৎ জলটুকুও চাই না—এত আকথা-কুকথা বলছো তুমি। আমি তোমার কাছ থেকে কিচ্ছু চাই না।'

আর তাকে যে-ডিমটা আমি দিয়েছিলাম সেটা সে রাখলে চৌকিতে।

'তোমার ডিমও চাই না আমি! আমি চ'লে গেলেই সবচেয়ে ভালো হয়।'

এখন শুধু রইলো বাকি চার।

'আমারও বমি পাচ্ছে,' বললে পাঙ্কা। 'তবে আমি বমি করবো না! তোমাকে যে-ক'রেই হোক আমুলায় নিয়ে যেতে হবে আমাদের। তুমিই একমাত্র যে শপথ ক'রে বলতে পারবে দিব্যশিশু কী-রকম সন্ত ছিলেন। তিনিই তোমার হৃদয় মোলায়েম ক'রে দেবেন। আমরা তাঁর মূর্তি বসিয়ে দিয়েছি গির্জেয়, এর মধ্যেই; আর তোমার দোষে সেটা যদি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে হয় তবে তা মোটেই ঠিক হবে না।'

'আর-কারু খোঁজ করো। আমি এ-কারবারে কোনো শরিক হ'তে চাই না।'

'তুমি তাঁর পুত্রবৎ—ছেলেই প্রায়। তাঁর সাধুত্বের ফল তুমিই উত্তরাধিকার পেয়েছো। তুমি যাতে তাঁকে চিরজীবী করো সেইজন্যে তিনি তোমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। তিনি নিজের মেয়েকেও তোমায় দিয়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, দিয়েছেন, তবে সে একেবারে চিরজীবী হ'য়ে যাবার পরেই।'

'হা ঈশ্বর, তুমি যে কী বলো, লুকাস লুকাভেরো!

'কিন্তু তা সত্যি, তিনি আমাকে তাঁর কন্যাটিকে দিয়েছেন যখন তার অন্তত চার মাস পেট হ'য়ে গিয়েছে।'

'কিন্তু মেয়েটির গায়ে সন্তের সৌরভ ছিলো।'

'বদ গন্ধ ছিলো। যেই আসতো তাকেই পেট দেখাতে তার ভালো লাগতো, যাতে সবাই দেখতে পায় শরীরেরই অংশ। সে তাদের দেখাতো তার ফোলা পেট, ভেতরে যে-বাচ্চা আছে তা পেট ফুলিয়ে লালচে ক'রে দিয়েছিলো। আর তারা হাসাহাসি করতো। তারা ভাবতো এ বুঝি ভারি মজার বিষয়। নির্লজ্জ বেহায়া বেলাহাজ মেয়ে ছিলো সে, আনাক্লেতো মোরোনেসের মেয়ে তা ছাড়া আর-কিছু –'

'কুকথাবাদী! এ-সব কথা বলার কোনো অধিকার তোমার নেই। আমরা তোমাকে একটা অংসফলক দিয়ে যাবো, যাতে শয়তানকে তুমি খেদিয়ে দিতে পারো।'

–'তা ছাড়া আর-কিছু সে ছিলো না। ঐ লোকগুলোর একটার সঙ্গেই সে ভেগে যায়। লোকে বলে সে নাকি তাকে ভালোবাসতো। সে তাকে শুধু বলেছিলো, "তোমার বাচ্চার বাবা হবার দুঃসাহস আছে আমার।" আর অমনি সে তার সঙ্গে কেটে পড়েছিলো।'

'সে হ'লো দিব্যশিশুর ফল। মেয়ে-শিশু। আর তুমি তাকে উপহার পেয়েছিলে। দৈববিধানে যে-ঐশ্বর্য জন্মেছিলো তুমিই ছিলে তার প্রভু।'

'বাজে কথা!'

'তার মানে?'

'আনাক্লেতো মোরোনেসের মেয়ের পেটে ছিলো আনাক্লেতো মোরোনেসের নাতি।'

'তুমি সেটা বানিয়েছো তাঁর সম্বন্ধে পাপকথা বলবে ব'লে। সবসময়েই তুমি আবোলতাবোল গল্প ফাঁদতে।'

'তাই বুঝি? আর অন্য মেয়েদের ব্যাপারগুলোই বা কী? দেশের এ-তল্লাটে সে কাউকেই আর কুমারী রাখেনি–সবসময়ে খেয়াল রাখতো যে কোনো কুমারী যেন তার ঘুমের সময় তার ওপর নজর রাখে।'

'তিনি তা করেছিলেন শুদ্ধান্তঃকরণে। যাতে তিনি পাপে নিজেকে পঙ্কিল ক'রে

না-তোলেন। তিনি নিজেকে সততা আর নিষ্পাপ দিয়ে ঘিরে রাখতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁর আত্মায় কোনো কলঙ্ক না-লাগে।'

'তুমি তা-ই ভাববে যেহেতু সে তোমাকে ডাকেনি।'

'তিনি আমায় ডেকেছিলেন,' বললে একজন, যার নাম মেলকিয়াদেস। 'আমি তাঁর ঘুমের সময় প্রহরা দিয়েছিলাম।'

'আর কী হয়েছিলো?'

'কিছুই না। শুধু রাতের যে-প্রহরে গা ঠাণ্ডায় শিরশির ক'রে ওঠে তাঁর অলৌকিক হাত আমায় জড়িয়ে ধরেছিলো। আর তাঁর শরীরের ওমের জন্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম—তাছাড়া আর-কিছুই হয়নি।'

'তার কারণ তুমি বুড়ি। তার পছন্দ ছিলো কচি আর কোমল—তাদের হাড়গোড় ভেঙে দেবার শব্দ শুনতে তার ভালো লাগতো—তাদের খুলে যেতে দেখতে তার ভালো লাগতো, যেন তারা বাদামের খোলা।'

'তুমি এক অভিশপ্ত নাস্তিক, লুকাস লুকাতেরো। অধমেরও অধম।'

এবার কথা বলছে অনাথিনী, যে চিরকাল বকবক ক'রেই চলেছে! সবচাইতে বুড়ি। তার চোখ জলে ভ'রে গেলো, তার হাত কাঁপতে শুরু করলো: 'আমি এক অনাথা আর তিনি আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; তাঁর মধ্যেই আবার আমি বাবা-মাকে ফিরে পেয়েছিলাম। সারা রাত তিনি আমায় আদর ক'রে কাটিয়েছিলেন যাতে আমি আর অত মন খারাপ না-করি।'

সে চোখের জল ফেললে বটে!

'তোমার কান্নার তাহ'লে কোনো কারণ নেই,' আমি তাকে বললাম।

'কিন্তু আমার বাবা-মা মারা যায়, আমাকে একা রেখে যায়। এমন বয়েসের এক অনাথা যখন কোনো সাহায্য পাওয়াই মুশকিল। একমাত্র যে-রাতটা আমার সুখে কেটেছিলো সেটা দিব্যশিশু আনাক্লেতোর সঙ্গে, তাঁর সান্ত্বনা-জাগানো বুকে। আর এখন কি না তুমি তাঁর সম্বন্ধে যত খারাপ-খারাপ কথা বলছো।'

'তিনি সান্তো ছিলেন।'

'ভালো লোক, দয়ামায়া ছিলো।'

'আমরা ভেবেছিলাম তুমিই তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে যাবে। তুমিই সব উত্তরাধিকার পেয়েছো।'

'সব শয়তানকে জড়ো করলে যত রকমের বদমায়েশি লুচ্চামি জোটে তা-ই একটা বস্তায় ভ'রে সে আমার জন্যে রেখে গিয়েছে। খ্যাপা এক মেয়ে, তোমাদের

মতো অত বুড়ো নয়, তবে জাঁহাবাজগোছ খ্যাপা। সে যে কেটে পড়েছে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। আমি নিজেই তার জন্যে দরজা খুলে দিয়েছিলাম।'

'বিধর্মী! তুমি নিছক অধর্মের কথা বানিয়ে বলছো!'

এখন শুধু দুটি স্ত্রীলোকই র'য়ে গেছে। অন্যরা সব চ'লে গিয়েছে একের পর এক, আমার ওপরে ক্রুশ এঁকে, ছিটকে দূরে স'রে গিয়েছে, কথা দিয়ে গেছে আমার ভূত ঝাড়াবার জন্যে ওঝা নিয়ে আসবে।

'এটা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে দিব্যশিশু আনাক্লেতো অলৌকিক সব কীর্তি করতে পারতো,' বললে আনাস্তাসিয়োর দুহিতা, 'নিশ্চয়ই সেটা তুমি উড়িয়ে দেবে না।'

'বাচ্চা পয়দা করা কোনো অলৌকিক কীর্তি নয়। আর সেটাই ছিলো তার সবিশেষ কৃতিত্ব।'

'তিনি আমার স্বামীর সিফিলিস সারিয়ে দিয়েছিলেন।'

'তোমার যে কোনো স্বামী আছে তাই আমি জানতাম না। তুমি আনাস্তাসিয়ো নাপিতের মেয়ে না? আমি যদ্দুর জানি ভাচোর মেয়ে আইবুড়ো।

'আমি আইবুড়ো, তবে আমার স্বামীও আছে। আইবুড়ো হওয়া এক আর সেনিওরিতা হওয়া আর। তুমি সেটা জানো। আর আমি সেনিওরিতা নই, তবে আমি একা থাকি।'

'এই বয়েসেও কারবারটা চালিয়ে যাচ্ছো, মিকোয়েলা!'

'করতে হ'তোই। সেনিওরিতা হ'য়ে আমার আখেরে কী হবে বলো তো? আমি মেয়ে। আর মেয়েমানুষের জন্মই হয় তাকে যা দেয়া হয়েছে তা বিলিয়ে দেবার জন্যে।'

'একেবারে আনাক্লেতো মোরোনেসের ভাষাতেই কথা বলছো তুমি।'

'হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছিলেন এ-কাজ করলে আমার যকৃতের পীড়া কেটে যাবে। কাজেই আমি করেছি। পঞ্চাশ বছর বয়েস হবে অথচ কুমারী থাকবো —এ পাপ।'

'আনাক্লেতো মোরোনেসই নিশ্চয়ই তোমায় এ-কথা বলেছে।'

'হ্যাঁ, বলেছেন, কিন্তু আমরা অন্য-একটা কারণে এসেছি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, গিয়ে শংসাপত্র দিতে হবে যে তিনি সান্তো ছিলেন।'

'আর আমিই বা নই কেন?'

'তুমি তো কখনও কোনো অলৌকিক ঘটাওনি। তিনি আমার স্বামীকে

সারিয়েছিলেন। আমার কাছে ব্যাপারটা স্বচ্ছ আর প্রাঞ্জল। তুমি কখনও কারু সিফিলিস সারিয়েছো ?'

'না, আর আমি জানিই না সেটা কী-রকম।'

'খানিকটা গ্যাংগ্রিনের মতো। শরীরটা দগদগে লাল হ'য়ে গিয়েছিলো, সারা গায়ে হাজা হয়েছিলো, ঘুমোতে পারে না আর। সে বলেছিলো সবকিছু লাল-লাল ঘায়ের মতো দেখছে যেন সে জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আর ছুরির ঘায়ের মতো ব্যথা, কুঁকড়ে গুটিয়ে যেতো শরীর। তখন আমরা দিব্যশিশু আনাক্লেতোর দর্শনে যাই—আর তিনি তাকে সারিয়ে দেন। জলন্ত একটা শর দিয়ে তিনি তাকে পোড়ান, তার ঘায়ে মালিশ ক'রে দেন নিজের লালা, আর অমনি, তার অসুখ উধাও। এবার বলো, দেখি, এটা কোনো অলৌকিক কাণ্ড কি না।'

'তার নিশ্চয়ই হাম হয়েছিলো। আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আমাকেও তারা লালা দিয়ে সারিয়েছিলো।'

'আগেই যা বলেছিলাম। তুমি হচ্ছো পরম নাস্তিক—তোমার কোনো আশা নেই।'

'আমার এ-সান্ত্বনাটা আছে যে আনাক্লেতো মোরোনেস আমার চেয়েও অধম ছিলো।'

'তিনি তোমাকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন। আর তবু তোমার সাহস হয়—না, তোমার কথা না-শোনাই উচিত আমার। আমি চললাম। পাঞ্চা, তুমি কি থাকবে ?'

'আমি আরেকটু থাকবো। শেষ লড়াইটা আমি একা লড়তে চাই।'

...

'শোনো, ফ্রান্সিস্কা, এখন যখন সবাই চ'লে গিয়েছে, তুমি তো থাকবে আর আমার সঙ্গে শোবে, তাই না ?'

'ঈশ্বর না-করুন। লোকে কী ভাববে ? আমি শুধু তোমাকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে চাই।'

'তা, এসো-না, আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করাই। সত্যি-বলতে, হারাবার কীই বা আছে তোমার ? তোমার এত বয়েস হয়েছে যে কেউ তোমার দিকে মনও দেবে না—অথবা অনুগ্রহটাও করবে না।'

'কিন্তু লোকে এত কথা বলে, তারা সব খারাপ কথা ভাববে।'

'সে তারা যা ভাবতে চায় ভাবুক। কী তফাৎ হবে তাতে? যা-ই হোক, তোমার নাম তো পাঞ্চা, তাই না?'

'বেশ। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, তবে শুধু ভোর অব্দি। আর শুধু যদি তুমি কথা দাও আমার সঙ্গে আমুলায় যাবে, যাতে আমি বলতে পারি যে আমি সারারাত কাকুতি-মিনতি ক'রে তোমাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে রাজি করাবার জন্যেই কাটিয়েছি। তা নইলে আমি ব্যাপারটা সামলাবো কী ক'রে?'

'ঠিক আছে। তবে গোড়ায় তোমার ঠোঁটের ওপর থেকে ঐ চুলগুলো ছেঁটে ফ্যালো। আমি কাঁচি নিয়ে আসছি।'

'আমাকে নিয়ে তুমি কী যে মস্করা করছো, লুকাস লুকাতেরো! সারাটা জীবন তুমি শুধু আমার খুঁত ধ'রেই কাটালে। আমার গোঁফকে শান্তিতেই থাকতে দাও। তাহ'লে ওরা কোনো সন্দেহই করবে না।'

'ঠিক আছে, যদি তা-ই তোমার ইচ্ছে হয়।'

যখন অন্ধকার হ'লো, পাঞ্চা আমায় মুরগিগুলো খাঁচায় ঢোকাতে সাহায্য করলে আর যে-নুড়িপাথর আমি চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছিলাম সেগুলো একজায়গায় কুড়িয়ে আনতে সাহায্য করলে, আগে যেভাবে ছিলো, যে-কোণায়, সেখানেই তাদের স্তূপ ক'রে রাখা হ'লো।

তার কোনো ধারণাই নেই যে আনাক্লেতো মোরোনেসকে ওখানে গোর দেয়া হয়েছে। কিংবা সে যেদিন হাজত থেকে পালিয়ে, তার সম্পত্তি ফেরৎ চাইতে আমার কাছে এসেছিলো, সেদিনই সে মরেছিলো।

সে এসেছিলো এই ব'লে: 'সব বেচে দিয়ে টাকাটা আমায় দাও, কারণ আমায় উত্তরে চ'লে যেতে হবে। সেখান থেকে আমি তোমায় চিঠি লিখবো, আর আবার দুজনে মিলে কারবার ফেঁদে বসবো।'

'তোমার মেয়েকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও না কেন?' আমি তাকে বলেছিলাম। 'তোমার বলতে যা আছে সে তো শুধু ঐ মেয়েই এখন। তুমি এমনকী তোমার ফেরেব্বাজিতে আমাকেও ঠকিয়েছিলে।'

'তোমরা দুজনে পরে আমার কাছে যাবে, যখন সব শুলুকসন্ধান আমি জানাবো। সেখানে আমরা সব হিশেবনিকেশ করবো।'

'অনেক ভালো হয় যদি এখানে, এক্ষুনি, হিশেবনিকেশটা ক'রে-ফেলা যায়। যাতে আমাদের পরস্পরের কাছে কোনো দেনা না-থাকে।'

'এখন আর আমার খেলা করার ইচ্ছে নেই,' সে আমায় বলেছিলো, 'যা

আমার তা-ই আমাকে দিয়ে দাও। কত টাকা তুমি নিমকহারামি ক'রে জমিয়েছো?'

'কিছু আছে, তবে তোমাকে তা আমি দেবো না। তোমার ঐ বেহায়া মেয়েটিকে নিয়ে আমাকে জাহান্নামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ওকে যে আমি রেখেছি, তাইতেই সব দেনা চুকেবুকে গেছে ব'লে মনে ক'রে নাও।'

সে বেজায় রেগে গিয়েছিলো, দাপাদাপি করেছিলো, জোর দিয়ে বলেছিলো তাকে কেটে পড়তেই হবে।

'শান্তিতে বিশ্রাম কোরো যেন, আনাক্লেতো মোরোনেস!' তাকে গোর দেবার সময় আমি বলেছিলাম; নদীর পাড় থেকে প্রতিমার পাথর ব'য়ে এনে তার ওপর ছোঁড়বার সময় বলেছিলাম, 'তোমার সব ফন্দিফিকির কলাকৌশলেও তুমি আর এখান থেকে বেরুতে পারবে না হে!'

আর এখন পাঞ্চা আমায় সাহায্য করছে আবার তার ওপরে নুড়ি পাথরগুলো বেছাতে, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করছে না যে তলায় আছে আনাক্লেতো মোরোনেস, আর আমি পাথরগুলো বেছাচ্ছি এই ভয়ে যে যদি সে বেরিয়ে আসে কবর থেকে, আমাকে ফের ঝামেলায় ফেলবে। এত-সব কৌশল জানে সে, যে আমার কোনোই সন্দেহ নেই সে কোনো-একটা উপায় বার ক'রে ফেলবে কী ক'রে ওখান থেকে জ্যান্ত বেরিয়ে আসা যায়।

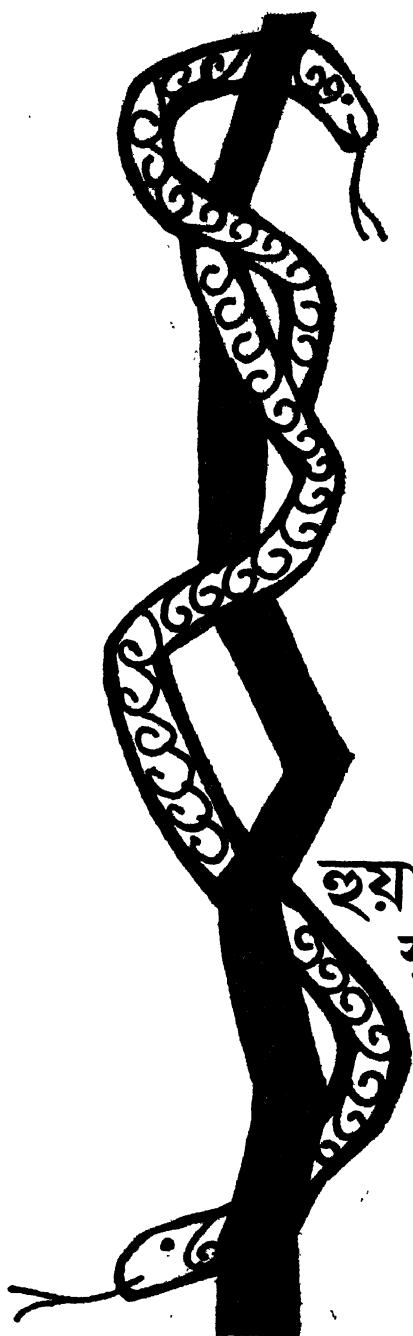
'আরো পাথর চাপাও, পাঞ্চা, এখানে এই একটা কোণায়, সারা উঠোনটায় নুড়িপাথর ছড়িয়ে প'ড়ে থাকতে দেখলে আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

...

পরে আমায় সে বললে, ততক্ষণে ভোর হ'য়ে গেছে, 'তুমি একটা হাড্ডি, লুকাস লুকাতেরো। মোটেই একটুও মায়া ছিলো না তোমার। জানো, সত্যি কে প্রেম করতে পারতো?'

'কে?'

'দিব্যশিশু আনাক্লেতো। সে জানতো কেমন ক'রে প্রেম করে।'



হুয়ান রুলফোর স্থাণুজগৎ

একটি ছোটো উপন্যাস, সোয়াশো পাতায় শেষ, 'পেদ্রো পারামো', (১৯৫৫), আর তার দু-বছর আগে ছোটোগল্পের একটি সংকলন, তারও আয়তন খুব বেশি নয়, তাতে সবশুদ্ধ পনেরোটি গল্প, 'জলন্ত প্রান্তর' (১৯৫৩)—হুয়ান রুলফোর সমগ্র সৃষ্টিশীল রচনা, সমগ্র কথাসাহিত্য, মাত্র এইটুকুই। পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে রুলফো, তারপর, ব'লে বেড়াতেন তিনি আরেকটি উপন্যাস নিয়ে কাজ ক'রে চলেছেন, 'শৈলশিরা', কিন্তু সে-বই কোনোদিনই বেরোয়নি, এবং আর বেরুবেও না, কেননা হুয়ান রুলফো আজ আর বেঁচে নেই। জনরবটা এইরকম : এই দুটি বইয়ের পৃথিবীজোড়া সাফল্যের পর কতলোক জানতে চেয়েছে তিনি কী লিখছেন, কী নিয়ে লিখছেন, কী হ'তে পারে তার রচনা-কৌশল, আর লোকেদের প্রশ্ন এড়াবার জন্যে রুলফো একেবারে আস্ত-একটা বইয়ের নাম ভেবে ফেলেছিলেন, কিন্তু বলতেন যে-রচনার কাজ চলছে, যা এখনও আঁতুড়ঘরে, সে-সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলতে চান না : লেখা শেষ হোক, তখন তো সবাই দেখতে পাবেই। শেষদিকে বলতেন, গল্পগুলোর মালমশলা, বলার ভঙ্গি, কথকতার রীতি সব নাকি তিনি পেয়েছেন দিদিমার কাছে, আর দিদিমা যেহেতু মারা গেছেন, অতএব, তাঁরও গল্পের ঝুলি ফতুর। নতুন-কোনো লেখার আর-কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তার মানে এই নয় যে তিনি আর-কিছু লেখেননি, সংগ্রহ করেছেন ইণ্ডিয়ানদের লোককথা, কিংবদন্তি, লিখেছেন আত্মজীবনীর খশড়া, কাজ করেছেন মেহিকোর সংস্কৃতি ও তথ্য দফতরে, এবং তার জন্যে লিখেছেন প্রতিবেদন, তৈরি করেছেন তথ্যপঞ্জি, লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে নিবন্ধ।

অর্থাৎ, এই একজন লেখকের সমগ্র কথাসাহিত্য বের করবার কথা ভাবতে গেলে কোনো প্রকাশককেই ভাবতে হয় না : মাত্র তো দুটি বই, তাও বই দুটি মিলিয়ে তিনশো পাতাও হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং বিস্তর অর্থ বিনিয়োগের কোনো ঝুঁকি বা ঝামেলা নেই। তাছাড়া বই দুটি যেহেতু এস্পানিওল জগতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়, অতএব বিক্রিও হবে—প্রতি বছরই। কিন্তু শুধু এস্পানিওল জগতেই নয়—তর্জমা মারফৎ হুয়ান রুলফো পাঠ্য পৃথিবীর অনেক

দেশেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের পাঠ্যতালিকায় হুয়ান রুলফোও অন্তর্ভূত।

কেউ-কেউ নাক শিঁটকে বলবেন, পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভূত হওয়া মানেই একজন লেখকের অবধারিত মৃত্যু—হয়তো সেই মৃত্যু দেখেই হুয়ান রুলফো আর কিছু লেখেননি, কেননা বারে-বারে মরণ তিনি চাননি—পণ্ডিতদের মিদাসের হাত, যাকেই ছোঁয় তাকেই মেরে ফ্যালে, সোনা কখনও করে কিনা কে জানে।

কেন তবু মেহিকোর এই লেখককে (যাঁর মাত্র দুটিই বই আখ্যানের) লাতিন আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য লেখকেরা গুরু ব'লে মানেন, সেটা হয়তো আমাদের কৌতূহল উশকে দেবে। হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি, কার্লোস ফুয়েন্তেস, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, মারিও ভার্গাস য়োসা—এমনি অনেক নাম পর-পর মনে প'ড়ে যায় আমাদের, যাঁরা বই লিখে, অথবা কোনো প্রবন্ধে, ঋণ স্বীকার করেছেন হুয়ান রুলফোর কাছে। রুলফোর মৃত্যুর পরে, কার্লোস ফুয়েন্তেস ও গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস যুগ্মভাবে তৈরি করেছেন 'পেদ্রো পারামো'র চলচ্চিত্র : গুরুর ঋণ সরাসরি শোধবার এও একটা নতুন—এবং সৃষ্টিশীল উপায়।

হুয়ান রুলফোর লেখা কেমন—তাঁর সারা জীবনের সৃজনশীল রচনার এই সংকলনই তার প্রমাণ। কিন্তু আলাদা-আলাদা ক'রেও কতগুলো আখ্যান আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্যে ধরা যাক। ছোট্ট একটি গল্প, "ভোর-বেলায়", সময়ের পরিসর মাত্রই চব্বিশ ঘণ্টা, এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় (এবং এই সূর্যোদয় নিতান্তই আক্ষরিক, তার কোনো সাহিত্যিক বা আলংকারিক অর্থ কোথাও নেই এই গল্পে)—অথচ সময় কেমন ক'রে যেন অন্তহীন বেড়েই যেতে থাকে, পটভূমি হ'য়ে ওঠে ফাঁদ—দারিদ্র্য, অজাচার, শোষণ, হিংস্রতা তৈরি ক'রে দেয় এমন-এক গোলকধাঁধা যা থেকে বেরুবার রাস্তাও কারু ঠিকঠাক জানা নেই, কোনো আরিয়াদ্নেও নেই যে গুলি থেকে সুতো ছেড়ে-ছেড়ে রাস্তা খোঁজবার উপায় বাৎলে দেবে। স্মৃতি—সে ধুরন্ধর, হাতসাফাই জানে, কী মনে রাখাবে, কী মনে থাকতে দেবে না, সেটা তার মারাত্মক কৌশলে বুড়ো এস্তেবানকে দ্বিধায় সংশয়ে সন্দেহে ঘুরপাক খাওয়ায়—সে জানে না, তার মনে নেই, তার মনেও পড়ে না সে সত্যি তার মালিক হুস্তো ব্রাম্‌বিলাকে খুন করেছিলো কিনা। আর ঘটনা—সে একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন স্তরে ঘ'টে চলে, একটার পাশাপাশি আরেকটা ঘটনা, একসঙ্গেই ঘটছে সব, আর আখ্যানের গতিও মন্থর, প্রায় যেন থমকে থেমে যায় মাঝে-মাঝে, আর এমন একটা বোধ

জাগিয়ে যায় আমাদের মধ্যে যেন আমরা কোনো স্থাণু, নিশ্চল, স্থাবর অনন্তের মধ্যে এসে পৌঁছেছি। যাকে আমরা 'গল্প' বলি, অত্যাচার, হিংসা, আঘাত সত্ত্বেও সেটা নেহাৎই নগণ্য, প্রায় ধর্তব্যেই আসে না — শুধু 'চরিত্র' ফুটে ওঠে 'গল্পের' ওপর, লোকে কী করে তার চাইতেও ব'ড়ো হ'য়ে ওঠে লোক নিজে, আর আছে সমাজ, যে এই লোককে তৈরি করেছে, আর আছেন গ্রন্থকার, লেখক — যিনি সময়ের জোড় খুলে ফেলে তাকে থামিয়ে দিয়েছেন।

অথচ হুয়ান রুলফোর আখ্যান নাটকীয়তায় ভরপুর, রুদ্ধশ্বাস, তুলকালাম। কেমন ক'রে ফাঁদতে হয় কোনো আখ্যান, কেমন ক'রে ছোট্ট নিরাভরণ বাক্যে তৈরি ক'রে দিতে হয় চালচলন, আখ্যানের লয়, সুরের টানাপোড়েন (বিন্দু-প্রতিবিন্দু) যা পাঠককে প্রথম থেকেই চুম্বকের মতো আটকে রাখবে, তা "ভোর-বেলায়" গল্পেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আমরা যে পরে গিয়ে পৌঁছুবো — যদি কোনো স্থাণু জগতে কোথাও যাওয়াও যায় — বুড়ো এস্তেবানের সেই আচ্ছন্ন, ধূসর, আবছায়া স্মৃতির ভেতর — সেটা কুয়াশা উঠি-উঠি করেও ওঠে না যখন ভোরবেলায়, তখন একটা আলাদা অনুপুঙ্খ তৈরি ক'রে আমাদের সজাগ ক'রে রাখে। আবহাওয়ায় সব সত্ত্বেও কেমন-একটা তাড়া আছে যেন, যেন আছে চাপা আততি, অধিজ্যতা, কেমন-একট দ্বন্দ্ব। চার্চের ঘণ্টা বাজে, দিন কুয়াশাকে সরাতে গিয়েও পারে না, গোরুর পিঠে ক'রে গাইগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে সারা রাত জাগার পর আদ্ধেক ঘুমের ঘোরে বুড়ো এস্তেবান — সব কেমন-একটা রহস্য, একটা কুহেলি, একটা অন্তর্ঘাতী ধ্বংসের আভাস নিয়ে আসে, আর চার্চে ঢং-ঢং ক'রে বাজে প্রহর, তখনও। কেমন-একটা ছমছমে অনিশ্চয়তা আখ্যানটিকে অনুক্ষণে আশঙ্কায় কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

আর সবচেয়ে ভয়ংকর হ'লো এই ধুয়ো — বুড়ো এস্তেবানের মনেই নেই সে তার মালিক হুস্তো ব্রাম্বিলাকে খুন করেছে কিনা! খুন ক'রে থাকলেও করতে পারে, নাও করতে পারে। তাকে যে খুনের দায়ে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো, তাতেও সে আশ্চর্য হয় না, বা খুন করেনি ব'লে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো চেষ্টাও করে না। হ্যাঁ, সে খুন করতেই পারতো। হয়তো করেওছে — না-হ'লে লোকে অভিযোগ করছে কেন। স্বাভাবিকই তো হ'তো, সে খুন করলে। আর এটাই সবচেয়ে হিংস্র, ভয়ংকর। না, ভয়ংকর নয়, — মারাত্মক অনুপুঙ্খ তৈরি ক'রে দিয়েছেন হুয়ান রুলফো তাঁর এই চরিত্রের একোক্তিতে, মনোলগে।

যেমন এই গল্পে, তেমনি আরো-কিছু গল্পেও, লেখক কতগুলো বাহুল্যবিহীন

চাঁছাছোলা বাক্যেই তৈরি ক'রে দেন প্রখর অন্তরঙ্গ নাটকীয়তা, গম্ভীর ধূসর রঙে --বাইরে থেকে প্রায় কোনো বর্ণনাই দেয়া হয় না চরিত্রের। জীবন দপদপ করছে, জীবন জঙ্গম, জীবন চলমান—অথচ আশ্চর্য দক্ষতায় হুয়ান রুলফো চরাচরকে থামিয়ে দেন, তৈরি ক'রে দেন নিশ্চলতার প্রতিভাস। এ-গল্পের বয়নের মধ্যে, আপাত-সরলতার আড়ালে, কতকিছুই যে আছে—সময় ফেটিয়ে, এদিক-ওদিক ক'রে, অনুক্রম ভেঙে দিয়ে, দৃষ্টিকোণ সরিয়ে না-সরিয়ে, অতীতের ঝিলিক ফেলে, দ্বৈতালাপে বা নিজের সঙ্গেই নিজের আলাপে সূক্ষ্ম এক জটিল টানাপোড়েন তৈরি হ'য়ে যায়। আমরা জানিই না হাজতে ব'সে-ব'সে বুড়ো এস্তেবান অন্য:কোনো কয়েদি বা জেলপাহারার সঙ্গে কথা বলছে কি না। না কি সে একা-একাই কথা সাজাচ্ছে, নিজেই বোঝবার জন্যে সত্যি কী হয়েছে; পুরোটাই কি তাহ'লে তার নিজের সঙ্গে আলাপ? কিন্তু না, তাও তো নয়। আর সবচেয়ে যেটা ভয়ংকর সেটা এই অনিশ্চয়—'ওরা বলে আমিই তাঁকে পাথর ঠুকে মেরেছি। জানি না। হ'বেও বা। মেরেও থাকতে পারি।' এই ধরনের কথার ভেতরকার চাপা বিদ্বেষ, আর নিজের অন্ধকার মানসের হিংস্রতার ইঙ্গিত শেষটায় আরো-একটি নাটকীয়তার আস্তর তৈরি ক'রে দেয়। আর এরই মধ্যে প্রায় নিরাসক্ত, গম্ভীর, নির্বিকার শ্লেষ যোগ ক'রে দেয় অন্য-এক মাত্রা।

রুলফোর স্বগতোক্তি বা দ্বৈতালাপের মধ্যে একটা সহজ, অনায়াস, স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিমা আছে, মনেই হয় না যে কোথাও একটা প্রখর শিল্পিতার বোধ কাজ ক'রে যাচ্ছে। কাটা-কাটা, চাঁছাছোলা ভাষা, বাস্তব হ'তে গিয়ে কখনও ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে না, অথচ কবিতার বিদ্যুতে থরথর ক'রে ফুলকি ছিটোচ্ছে—অনবরত।

আর গ্রাম—মেহিকোর দুঃস্থ, দুর্গম, রুক্ষ, ঊষর গ্রাম তার মাটিপাথর, ধুলো, হাওয়া, কুয়াশা, চাঁদ, কয়োটি, শকুন, হঠাৎ-বানভাসি-জল নিয়ে ফুটে ওঠে চাক্ষুষ, হ'য়ে ওঠে আখ্যানেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, কোথাও আলাদা ক'রে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া বর্ণনা সে নয়—হয় সে বোঝাতে চায় কীসের ব্যঞ্জনা তিনি তৈরি করতে চাচ্ছেন, আর নয়তো "ভোরবেলায়" গল্পের কুয়াশার পর্দার মতো হ'য়ে ওঠে আখ্যানেরই কেন্দ্রীয় চিত্রাভাস। আর ভেতর থেকে, গল্পের পর গল্পে, নিরন্তর খ'য়ে যাচ্ছে এই গ্রাম—নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত, মেহিকোর ইণ্ডিয়ান ও মেস্তিসোদের নাছোড় অদৃষ্টবাদে ম্রিয়মাণ।

অথচ কী চাক্ষুষ ও সজীব এই গ্রাম, তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পটভূমি; নগর থেকে তার অনতিক্রম্য দূরত্ব একই সঙ্গে আঞ্চলিক—কিন্তু তবু তা সারা মেহিকোরই অণুবিশ্ব। এত-সব দ্বৈতালাপ, স্বগতোক্তি, বহুতা ভাবনা তাঁর গল্পে, কিন্তু রুলফো কখনো আশ্রয় নেন না উপভাষায় বা আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গিতে: এমন-এক ভাষা তিনি তৈরি করেন যা স্থানীয়, ল্যাণ্ডস্কেপের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে অবিচ্ছেদ্যভাবে অকাট্যভাবে জড়ানো, আর স্বরের লয় ও অন্বয়ই তা তৈরি ক'রে দেয়—কোনো বিশেষ শব্দবন্ধ বা অভিধানের শব্দসংগ্রহ হ'য়ে ওঠে না। সারাক্ষণ আছে নাম না-করা, চিনিয়ে না-দেয়া একদল 'ওরা'—নৈর্ব্যক্তিক একগাদা ব্যক্তির ভিড়, ব্যক্তিগত কোনো সম্বন্ধের পরপারে তাদের অবস্থান। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র থেকে যেন আঁৎকে, রেগে, বিবমিষায় 'ওরা' স'রে এসেছে। কিন্তু রুলফোর শ্লেষের তীক্ষ্ণতা ও সাফল্য এইখানেই যে তারাও এই একই জগতের অধিবাসী—তারাও এই একই বিষম কাজ করতে পারতো। "মনে আছে" গল্পে যেমন কথক আরেকজন কাউকে (বা অন্য অনেককেই) উর্বানো গোমেসের কাহিনী ব'লে যাচ্ছে, আর বারে-বারে বলছে 'ওরা' বলতো 'ওরা' করতো এইসব, এমন-এক ভঙ্গিতে, যেন এই বিশাল শনাক্ত না-করা সর্বনামের সে অংশ নয়—অথচ আমরা, অভিভূত, আবিষ্কার করি যে তার অবস্থানও এই 'ওরা'র বাইরে হ'তে পারতো না। নিজেকে এভাবে সরিয়ে-আনার, বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবার চেষ্টাও এই উষর গ্রামগুলোয় বেঁচে থাকবার চেষ্টার মতো পণ্ডশ্রম। কথকের এই দীর্ঘ, একটানা, কখনো-ঝুলে-না-পড়া অন্তর্বচন যতক্ষণ ধ'রে চলে, নিজের অজান্তেই যখন সে নিজের সম্বন্ধে এমন খুঁটিনাটি ব'লে দেয় যা থেকে বোঝা যায় সেও অন্যদের চেয়ে আলাদা নয় মোটেই, অথচ তবু ততক্ষণ ধ'রেই নিজেকে সে অন্যভাবে অ ন্য র ক ম ভা বে উপস্থাপিত করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে যায়—কিন্তু তার কথা শেষ হ'তেই আমরা দেখতে পাই এক অতর্কিত হ্যাচকা টানেই রুলফো তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন, শুধু তারই নয়, সমূহেরই মুখোশ, কিন্তু এই সমূহ যেন সমূহের ভেতর যুযুধান আত্মরক্ষায় ব্যস্ত একজন ব্যক্তিমাত্র। আর হালিস্কোর জলন্ত প্রান্তরে এই দুঃস্থ ইণ্ডিয়ানরা যখন কঠোর শারীরিক পরিশ্রম ক'রে বেঁচে-থাকার চেষ্টায় হন্যে হ'য়ে যায় তখন তাদের অন্তর্জগৎ ভ'রে যায় তীব্র মানসিক বিক্ষেপে, অনিবারণীয় আতঙ্কে, শোকে ও বেদনায় ও আক্ষেপে ও গ্লানিতে অন্তহীনভাবে জর্জর। তারা সবাই যেন ম'রে গিয়েছে, ম'রে প'ড়ে আছে, এখনও জন্মায়নি, জন্মের আগেই মৃত্যুর দ্বারা লাঞ্ছিত।

অথচ তাদের নবজন্মের কথা (বা প্রতিশ্রুতি) ছিলো মেহিকোর অনেক বিপ্লবের অন্তত একটার পরে।

সাহিত্য আর আগুন

পেরুর ঔপন্যাসিক মারিও ভার্গাস য়োসা তাঁর 'শ্যামভবন' (লা কাসা ভের্দে, ১৯১৮) উপন্যাসের জন্যে যখন ১৯১৮-তে ভেনেজুয়েলার কারাকাসে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ও সম্মানিত সাহিত্য পুরস্কার রোমুলো গাইয়েগোস পুরস্কার পেয়েছিলেন, তখন সে-পুরস্কার গ্রহণ করার সময় তাঁর ছোট্ট ভাষণটিতে স্পষ্ট ক'রে এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন: 'সাহিত্য [হ'লো] আগুন'।

'আগুন'—কেননা সাহিত্যিকের আছে দুটি অঙ্গীকার: এক, তার শিল্পের কাছে, শিল্পিতার কাছে; আর দুই, মানুষের কাছে, সমাজের কাছে, দেশের কাছে। এক আগুন সারাক্ষণ স্বয়ং সাহিত্যিককেই পোড়ায়, কিন্তু অন্য আগুন পোড়ায় সমাজ ও রাজনীতির যত অন্যায়, যত জঞ্জাল। লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ কথাসাহিত্যিকেরই মত এটাই যে কোনো সত্যিকার লেখক নিছক কোনো উদাসীন, হিমশীতল, নীরক্ত, নাকউঁচু নন্দনতাত্ত্বিক নন; বরং হয়তো আফ্রিকার ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচিবির মতো কলাকৈবল্যবাদকে তাঁরা বর্ণনা করতে পারতেন 'ডিওডরাণ্ট ডগ-শিট' (গন্ধ মাখানো কুত্তার গু) ব'লে। এমন নয় যে নিছক অধ্যাত্মবাদী নন্দনতাত্ত্বিক লাতিন আমেরিকায় কেউ ছিলেন না—আরহেনতিনার হোর্হে লুইস বোর্হেসের নামই মনে প'ড়ে যাবে আমাদের, যাঁর শিল্পিতা লেখকদের কাছে ঈর্ষণীয় মনে হ'লেও যিনি তাঁর ফাসিস্ত মতবাদের জন্যে (তাঁর রচনার পরতে পরতে ভাঁজে-ভাঁজে মিশে আছে সে-মতবাদ; তিনিই বলেছিলেন ফ্রাঙ্কোর গুণ্ডারা ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকাকে অনেক আগেই কেন খুন করেনি!) শেষ পর্যন্ত তিনি কোথাও পৌঁছুতে পারেননি, বরং জীবদ্দশাতেই জাদুঘরের সামগ্রী হ'য়ে উঠেছিলেন।

অন্তত সূত্রাকারে হ'লেও এই চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় না-থাকলে আমরা লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশকেই বুঝতে পারবো না। উপরের আলোচনায় আমরা এটাই দেখাতে চাচ্ছিলাম কোন দুই আগুন—শিল্পের, আর জীবনদর্শনের—জলন্ত শিখা হুয়ান রুলফোর লেখায় দপদপ ক'রে জ্ব'লে উঠেছিলো। হুয়ান রুলফো (জন্ম ১৯১৮) এবং তাঁর রচনা সম্বন্ধে যে-কোনো

আলোচনার সূত্রপাতেই ভার্গাস য়োসার অগ্নিগর্ভ শর্তটিকে মনে রাখা একান্তই জরুরি। তবে হুয়ান রুলফো সম্বন্ধে কোনো আলোচনার সূত্রপাত করবার আগে, গোড়ায়, সংক্ষেপে আমাদের জেনে নেয়া উচিত মেহিকোকেই—নইলে বোঝাই যাবে না কেন তিনি তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পে দ্রো পা রা মো'র উপনাম দিয়েছিলেন 'মেহিকোর একটি উপন্যাস'।

বর্তমান মোহিকোর আয়তন (উত্তরের প্রতিবেশীটির দীর্ঘদিনের আগ্রাসনের পর) ১,৯৭২,৫৪৭ বর্গকিলোমিটার। ১৯১৮র শুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৭৮,৩৬৩,০০০, যার মধ্যে ১২,৭৩১,৮০০ জন থাকে রাজধানী মেহিকোনগরীতে। লোকে কথা কয় এস্পানিওল এবং বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান ভাষায়, তবে ইণ্ডিয়ান ভাষাগুলোর প্রভাবে এই এস্পানিওল এস্পানিয়ার, বিশেষত কাস্তিইয়ের, 'শুদ্ধ, সাধু, আধো-আধো, নাকউঁচু' বাচনভঙ্গির চাইতে বেশ-খানিকটা ভিন্ন উচ্চারণের বেলায়—এবং কিছু-কিছু শব্দের প্রয়োগের বেলাতেও। মেহিকোর জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগই মেস্তিসো (অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ ও ইণ্ডিয়ানদের বর্ণসংকর), শতকরা ১৫ ভাগ আমেরিণ্ডিয়ান, আর শতকরা ১০ ভাগ ইওরোপীয়। যদিও মেহিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপকে বিপুল পরিমাণে সুতি কাপড়, চিনি, কফি, গন্ধক, খনিজ তেল ও রুপো রপ্তানি করে, দেশের অধিকাংশ মানুষেরই দিন কাটে অসহ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে। আজ যাকে লোকে মেহিকো বলে সেখানে এস্পানিরা পৌঁছেছিলো ১৫১৭ সালে। তখন এই অঞ্চলে ছিলো আস্‌টেক সভ্যতার বিপুল প্রসার। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি হেরমান কোর্তেসের নেতৃত্বে কোন্‌কিস্তাদোরেরা শুধু যে সারা অঞ্চলটাই দখল ক'রে বসেছিলো তা-ই নয়, তাদের নির্বিচার জাতিহত্যা, অবাধ লুণ্ঠন ও আস্‌টেক সভ্যতার গরিমাময় নিদর্শনগুলোর নৃশংস ধ্বংসকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে এক চরম কলঙ্কের কাহিনী হ'য়ে আছে। ১৮২১ সালের আগে মেহিকো এস্পানিয়ার সুকঠিন শাসনজাল ছিন্ন ক'রে বেরুতে পারেনি। দেশটা এখন, প্রধানত, রোমান ক্যাথলিক।

১৮২১ সালের পর থেকে মেহিকোয় পর-পর অনেকগুলো বিপ্লব (বা অভ্যুত্থান) সংঘটিত হয়েছে, কেননা প্রত্যেক নতুন নেতাই ক্ষমতায় আসার পর নতুন স্বৈরাচারীর ভূমিকা নিয়েছেন—সাধারণ মানুষের অবস্থায় বদল হওয়া তো দূরের কথা, কোনো সুবিধেই হয়নি, বরং জীবনযাপন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে। দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ছাড়াও প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদের বদলে

এবার জাঁকিয়ে বসেছে পরোক্ষ (বা নয়া) উপনিবেশবাদ—দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় সবটাই উত্তরের দৈত্যাকৃতি প্রতিবেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে, আর কে না জানে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বহুজাতিক ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো চিরকালই পৃথিবীর দেশে-দেশে স্বৈরচারীদেরই মদত জুগিয়ে থাকে। আজ মেহিকোয় কাগজে-কলমে একদলীয় গণতন্ত্র বর্তমান (মজার বিষয়, পৃথিবীতে মেহিকোই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে শাসকদের দলের নাম বাংলা করলে দাঁড়ায়: 'প্রাতিষ্ঠানিক বিপ্লবী পরিষদ'), যদিও রাষ্ট্রপতির হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা। প্রতিটি বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থানের আগে স্বপ্ন আর আশাআকাঙ্ক্ষাউৎকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বসিত প্রকাশ, তারপরেই শোচনীয় মোহভঙ্গ ও ব্যর্থতার বোধ—বাস্তবের এই একান্তর সূত্রটিকে মনে না-রাখলে আমরা কখনোই, এবং কিছুতেই, বুঝতে পারবো না মেহিকোর সাহিত্য কেমন ক'রে এই বাস্তবতায় সাড়া দিয়েছে।

মেহিকোর বিপ্লব নিয়ে রচিত যে-সব আখ্যায়িকা—যেমন মারিয়ানো আসুয়েলার 'নিচের তলার যারা' (লোস্ দে আবাহো, ১৯১৬), 'কর্তাব্যক্তিরা' (লোস্ কাসিকেস, ১৯১৭) এবং 'মাছিরা' (লোস্ মেস্কাস, ১৯১৮); যেমন আগুস্তিন ইয়ানিয়েস-এর 'ঝড়ের কিনার' (১৯৪১); যেমন কার্লোস ফুয়েন্তেস-এর 'আর্তোমিও ক্রুসের মৃত্যু' (১৯১৮) বা 'বুড়ো গ্রিঙ্গো' (১৯৪১) এবং বেশকিছু ছোটো-বড়ো কাহিনী; যেমন রোসারিও কাস্তেইয়ানোসের কাহিনীপর্যায় অথবা হোর্হে ইবারগুয়েনগোতিয়ার 'অগস্টের বজ্র' (১৯৪১)—বিপ্লবের সব ছদ্মবেশই খুলে ফেলেছিলো—কেননা এখানে বিপ্লব ছিলো নিছকই বুলি, অলংকৃত বচন, অন্তঃসারশূন্য, ফোঁপরা—অর্থাৎ বিপ্লবের নাম ক'রে কোনো-কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বারে-বারেই তাদের আখের গুছিয়েছিলো। যাঁরাই জন রীডের 'ইনসার্জেণ্ট মেক্সিকো' পড়েছেন, তাঁরাই তাতে এইরকম একটি বিপ্লবের রক্তক্ষয়ী দিনগুলির সজীব ও চাক্ষুষ ছবি দেখেছেন।

মেহিকোর বহু বিপ্লব নিয়ে বিশ শতকের কথাসাহিত্যের এই-যে ধারা, হুয়ান রুলফোর স্থান তারই মধ্যে: সেই অর্থে তিনি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক লেখক: মাত্র দুটি কথাসাহিত্যের বই তাঁর, ছোটোগল্পের সংগ্রহ 'জ্বলন্ত প্রান্তর' (এল্ ইয়ানো এন্ ইয়ামাস, ১৯৫৩) এবং ক্ষুদ্রায়তন একটি উপন্যাস 'পেদ্রো পারামো' (১৯৫৫)। অনেকদিন ধ'রে তিনি পাঠকদের প্রত্যাশা জাগিয়ে রেখেছিলেন এই ব'লে যে তিনি আরেকটি উপন্যাস লিখছেন, 'শৈলশিরা' (লা কর্দিইয়েরা), কিন্তু সে-বই তিনি কোনোদিনই শেষ করেননি। তবে শুধুমাত্র দুটি সৃজনশীল

সাহিত্যের বই লিখেই (এখানে একসঙ্গে দুটি বই প্রকাশিত হ'লো) হুয়ান রুলফো এখন সমগ্র লাতিন আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য লেখকদের একজন ব'লে পরিচিত—এখনকার প্রায় সব প্রধান কথাসাহিত্যিকই তাঁকে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছেন।

হুয়ান রুলফো জন্মেছিলেন মেহিকোর হালিস্কোয়, ১৯১৮ সালে। বন্ধ্যা ফাঁকা ঊষর জমি, আর পরিত্যক্ত পোড়ো গ্রামে ভরা দেশ। তাঁর গল্প ও উপন্যাস দুয়েরই পটভূমি, কোমালা নামে একটি কাল্পনিক, প্রায় পৌরাণিক গ্রাম, লাতিন আমেরিকার কোথাও যার কোনো বাস্তব শরীরী উপস্থিতি নেই, যার অবস্থান বরং সত্যি-বলতে বাস্তব আর ফ্যানটাসির সীমান্তে কোনো রহস্যময় বিন্দুতে। কিন্তু তাঁর গল্পে-উপন্যাসে কোমালার যে-বর্ণনা বারে-বারে ফিরে আসে সে ঐ হালিস্কোর কথাই মনে করিয়ে দেয়। আর এই-যে কৌশল, কোনো কাল্পনিক 'রচিত' অঞ্চলকে নিয়ে কাহিনী ফাঁদা—আসলে যার মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে থাকবে লাতিন আমেরিকারই বাস্তব ও সত্যিকার পরিচয়—এই কৌশল অবশ্য হুয়ান রুলফো একাই ব্যবহার করেননি। কোমালা, মাকোন্দো, সান্তা মারিয়া, সান্ তোরোস্তোন—এ-সবই কাল্পনিক উদ্ভাবিত গ্রাম—কোনো নামহারা আরণ্য ঊষর পার্বত্যভূমিতে লুকোনো—কিন্তু এদেরই মধ্য দিয়ে আমরা চিনে নিতে পারি মেহিকো, কোলোম্বিয়া, উরুগুয়াই অথবা একুয়াদোরকে। এ-কৌশল ব্যবহার করেছেন উইলিয়াম ফকনারও, বা ভারতেও আর. কে. নারায়ণ।

কোমালার ভূদৃশ্য সবসময়েই এক, যদি-বা কখনও তার নাম লুভিনা হ'য়ে গল্পে আসে, তাহ'লেও তাই। খরায়-ফাটা এক বিশাল সমভূমি সে কখনো, কখনো হয়তো পাহাড়ের ওপরে বসানো, যেখানে কোনোদিন একফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না (দ্রষ্টব্য: "ওরা আমাদের জমি দিয়েছে," "লুভিনা" ইত্যাদি); তপ্ত ঝলসে-যাওয়া উপত্যকা, সুদূর উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী, আবছা দূরতর কতগুলো জনবসতি—যেখানে নিঃসঙ্গ লোকেরা নরকের হা-করা মুখটায় দিন কাটাচ্ছে গ্লানি, পাপবোধ, প্রতিহিংসার উৎকাঙ্ক্ষায় জর্জর; কেউ জন্ম থেকেই জড়বুদ্ধি, হাবা (যেমন "মাকারিও"), কেউ পাগল, কেউ বেশ্যা (কেউ তা হ'তে বাধ্য হয়, কারণ "আমরা ভারি গরিব"), কেউ ফালতু, আবর্জনার স্তূপ, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত—আর জীবন এখানে কখনোই বর্তমানে নেই, হয় অতীতের অন্তহীন রোমন্থনে নয়তো ভবিষ্যতের অনির্দেশ্য আকৃতিতে উদ্বেল, সবসময়েই

যেতে চাচ্ছে মরুভূমি পেরিয়ে অন্ত-কোথাও, নয়তো পাহাড় ডিঙিয়ে আরো দুর্গমে, ভবে, 'এখানে নয়, এখানে নয়, দূরে কোথাও, অন্ত কোনখানে'। মানুষ পালায়, হুড়মুড় সব দৌড়, বন্যার মতো গতি। কিন্তু সব প্রাণান্ত চেষ্টা সত্বেও নিস্তার নেই কোমালা থেকে—দিগন্ত অনবরত পেছিয়ে যায়, নয়ানজুলি গোলকধাঁধায় ছন্দে ঘুরিয়ে আবার ফিরিয়ে আনে, আর সময় তার ঘাড় চেপে ধ'রে বারে-বারে ছুঁড়ে ফ্যালে অতীতের মধ্যে যেখান থেকে কারু আর কোনো রেহাই নেই, কোনো বিকল্প বা ভবিষ্যৎ তাদের জন্যে উন্মুখ ব'সে থাকে না। আর এইসব ত্রস্ত, শপ্ত, অভিশপ্ত মানুষের নিঃসঙ্গতা গল্পগুলোয় গলগল বেরিয়ে আসে স্বগতোক্তিতে, প্রলাপে, মাতাল বুলিতে, বিকারের আচ্ছন্ন ঘোরে বলা কথায়—আর শ্রোতাও নেই কোথাও, যদি-না পাঠকই হ'য়ে ওঠে শ্রোতা বা অভিজ্ঞতার শরিক। হুয়ান রুলফোর লেখায় ল্যাণ্ডস্কেপ জীবন্ত—নিছক বিবরণ নয়, মানুষজন তাতে শারীরিকভাবে উপস্থিত, সারাক্ষণ কথা বলে, অথচ / কিন্তু গুছিয়ে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষমতাও তাদের নেই (যেমন "মাকারিও")—তাই কথাও, শেষ অব্দি, মূঢ় মূক ম্লান হ'য়ে থাকে। অনেকেই হুয়ান রুলফোকে তুলনা করেছেন হিয়েরোনিমুস বুশ, জর্জ রুয়ে আর মেহিকোর চিত্রকর হোসে ক্লেমেন্তে ওরোসকোর সঙ্গে (যিনি একসময় মারিয়ানো আসুয়েলার 'নিচের তলার যারা' উপন্যাসের জন্যে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন) এতই চাক্ষুষ, জর্জর, রহস্যময় তাঁর রচনা। আর এরই সঙ্গে মিশে আছে তাঁর শানদেয়া পরিহাসবোধ ও শ্লেষ, কৃষ্ণবর্ণ, ছায়াচ্ছন্ন, আতঙ্ক জাগানো।

কে এই হুয়ান রুলফো? কী তাঁর পটভূমি?

হুয়ান রুলফোর জীবন মেহিকোর অনেক বিপ্লবের একটিতে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গিয়েছিলো। যখন তাঁর মুখে ভালো ক'রে বুলিও ফোটেনি, প্রতিবিপ্লবীরা রক্ষণশীলরা তাঁর বাবাকে খুন করে। যদিও পরে তিনি গুয়াদালাহারায় স্কুলে যান, আর তরুণ বয়সেই সাহিত্য পত্রিকায় লেখা ছাপান (তাঁর প্রথম ছোটোগল্প বেরিয়েছিলো চারের দশকে, মফস্বল গুয়াদালাহারার ছোটো পত্রিকায়), তবু কোনোদিনই তিনি তাঁর কৈশোরের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে ভুলতে পারেননি। তাঁর কাকা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন কিছুদিন, কিন্তু সারাক্ষণ প্রতিবিপ্লবীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন; তাঁর ঠাকুমা চেয়েছিলেন লোকে যাতে তাঁকে চিনতে না-পারে সেইজন্যে তাঁকে 'পেরেস' পদবি নিতে, যেটা ইংরেজদের 'স্মিথ'-এর মতোই

নামগোত্রহীন, অজ্ঞাতকুলশীল। ঠাকুমার আরো ইচ্ছে ছিলো হুয়ান রুলফো যেন চার্চের পুরুৎ হয়। রুলফো দুই প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে আসেন মেহিকোনগরীতে। হালিস্কো থেকে গোড়ায় গুয়াদালাহারায়, তারপর মেহিকো-নগরীতে, রুলফো কিছুকাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে মধ্যপথেই সেটা তাঁকে বাদ দিতে হয়। কিছুদিন নানা ধরনের কায়িক শ্রমের কাজ করার পর তিনি একটি আপিশে খুদে কেরানির কাজ জুটিয়েছিলেন। পরে তিনি 'ন্যাশন্যাল ইন্‌ডিজেনিস্ট ইনস্টিটিউট'-এর সম্পাদকীয় দফতরে কাজ করেছিলেন, যেখানে ছেলেবেলার পর—এখন তাঁর চিন্তা অনেক পরিণত—ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, তাদের জীবন, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি আরো ভালো ক'রে বোঝবার চেষ্টা করেন তিনি।

হালিস্কোর চাষীদের তিনি এমনিতেই কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। এখন 'পরিণতবুদ্ধির রুলফো আরো ভালোভাবে তাদের জীবনের কৌণিকতা ধ'রে ফেলতে পারলেন : কিন্তু তাঁর জগৎ শেষ অব্দি থেকেই যায় খিন্ন, করুণ, অবক্ষীয়মাণ ও অভিভূত জন্মভূমি, যে তার সবরকম জঙ্গমতা হারিয়ে স্থাণু ও স্থাবর কোনো পরিবর্তনবিমুখ ছবি হ'য়ে পড়েছে যেন। সেই জন্যেই 'জলন্ত প্রান্তর' সংকলনে গরিব চাষীদের এত ভিড়, যারা ঘৃণা, আতঙ্ক, হিংসা, হত্যা, অজাচারে জড়িয়ে পড়েছে, যেমনভাবে পোকা ছটফট করে মাকড়শার জালে। সেখানে অনবরত হানা দেয় অতীতের প্রেত, আর জীবিতদের নষ্ট, ভ্রষ্ট, কিংমাকার-কিম্ভূত ক'রে যায়। এ এক এমন জগৎ মেহিকোর ব্যর্থ বিপ্লবগুলো যার সর্বনাশ সত্যনাশ ক'রে গেছে। তারা দিয়েছিলো প্রতিশ্রুতি, দেখিয়েছিলো স্বপ্ন, কিন্তু পরে যারা নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বহুজাতিক ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে, বিপ্লবী বুলি আর অলংকারগুলো সব ফাঁকা ও ফাঁপা আওয়াজ বৈ আর কিছুই হ'লো না, কেননা বিপ্লব শুধু কর্তাদের বদলেছে, কিন্তু ব্যবস্থা বদলায়নি, চরিত্র বদলায়নি, সাধারণ মানুষের জীবনে কোনোই বদল আনেনি। কিন্তু হুয়ান রুলফো শুধু যে বিপ্লবী বাগাড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্য-তাকেই ফোটাতে চাচ্ছিলেন তাঁর লেখায়, তা নয়—তিনি এমনকী নির্মোহ ও নিরাসক্তভাবে জনগোষ্ঠীর মুখোশও খুলে দিতে চাচ্ছিলেন। তারা যদি অংশ না-নিতো, তবে এ-সব রক্তাক্ত বিপ্লব হাজার চেষ্টা ক'রেও জেনারেলরা সংগঠিত ও সংঘটিত করতে পারতো না।

আবারও মনে ক'রে নেয়া জরুরি যে মেহিকোর বিপ্লব নিয়ে হুয়ান রুলফোর

আগে-পরে অনেকেই লিখেছেন ; মারিয়ানো আসুয়েলা লিখেছেন, 'মাছিরা' বা 'নিচের তলার যারা'। আগুস্তিন ইয়ানিয়েস লিখেছেন 'ঝড়ের কিনারে'। কার্লোস ফুয়েন্তেস লিখেছেন 'আর্তেমিও ক্রুসের মৃত্যু' বা 'বুড়ো গ্রিঙ্গো'। রোসারিও কাস্তেইয়ানোস তাঁর কাহিনীগুলোয় সেইসব বিক্ষুব্ধ দিনকেই ফুটিয়ে তুলেছেন বিশদ বিবরণে, আর হোর্হে ইবারগুয়েনগোইতিয়া 'অগস্টের বজ্র' উপন্যাসে দমফাটা শ্লেষের কশা হেনেছেন এইসব বিপ্লবের বোলচাল, ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থানের মহড়াকে। অর্থাৎ হুয়ান রুলফোই প্রথম বিপ্লব নিয়ে লেখেননি, অথবা রুলফোর পরেও বিপ্লব নিয়ে কাহিনী ফাঁদার ধারাটা শেষ হ'য়ে যায়নি। এই ধারার মধ্যেই, এই পটভূমিতেই, আমাদের মনে রাখতে হবে 'জ্বলন্ত প্রান্তর' ও 'পেদ্রো পারামো'র কথা। 'পেদ্রো পারামো'তে সরাসরি পাঞ্চো ভিইয়ার অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের কথা আছে, কেন সেটা ব্যর্থ হ'লো ইঙ্গিত আছে তারও। পেদ্রো পারামোর মতো কুলপতিরাই, প্যাট্রিয়ার্করাই, এইসব অভ্যুত্থান থেকে ফায়দা লুঠে নিয়েছিলো।

পেদ্রো পারামো কোমালার জমিদার। এটাও আগেই বলেছি যে এই 'কোমালা' একটি কাল্পনিক জায়গা, যেমন কাল্পনিক হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির সান্তা মারিয়া, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের মাকোন্দো, দেমেত্রিও আগিলেরা-মালতার সান তোরোস্তোন, বা আরো আগে উইলিয়াম ফকনারের ইয়কনোপোটোফাওয়া কাউন্টি। কিন্তু ধীরে-ধীরে রুলফোর কো মা লা হালিস্কোরই সরাসরি প্রতিচ্ছবি যদি না-হয়, হ'য়ে ওঠে মৃত্যুর পরে জন্মের আগে কোনো-এক মধ্যবর্তী নারকীয় ভূগোলে প্রতিষ্ঠিত ঊষর, বন্ধ্যা, রুক্ষ, ভৌতিক পোড়োজমি। পেদ্রো পারামো ছলে-বলে-কৌশলে তার জমি বাড়াতো। এই জমি বাড়াবার জন্যেই একদিন সে বিয়ে করেছিলো আখ্যানের 'আমি' (উত্তম-পুরুষ) হুয়ান প্রেসিয়াদোর মাকে—কিন্তু তার মার সব সম্পত্তি ও জমিজমা কুক্ষিগত হবার পরেই ছেলেসমেত তাকে তাড়িয়ে দেয়। হুয়ান প্রেসিয়াদো তার মায়ের মৃত্যুশয্যায় কথা দিয়েছিলো একদিন সে কোমালা এসে পেদ্রো পারামোর মুখোমুখি হ'য়ে সব শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণার শোধ নেবে। কিন্তু সে কোমালা এসে ছাখে সে এক ভুতুড়ে শহর এখন, ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি, দিনের বেলায় কেউ নেই অথচ রাত্তিরে জেগে ওঠে অশরীরী স্বর, মর্মরধ্বনি, ফিশফাশ, ছায়ামূর্তি ; এক বিদ্রোহী মড়াঘোড়া রাস্তের মাটি কাঁপিয়ে খ্যাপার মতো ছুটে যায় খটাখট, আর সে জানতে পায় পেদ্রো পারামোকে খুন করেছে তারই এক বৈমাত্রেয় ভাই,

এক জারজ ছেলে—যখন পেদ্রো পারামো জেদ ক'রে ঠিক করেছিলো সারা গাঁকেই না-খাইয়ে মারবে। অনুসন্ধান শুরু হবার আগেই গল্প শেষ। কিন্তু রচিত কাহিনীর মাঝামাঝি এসে আমরা আবিষ্কার করি, কাহিনীর কথক, কাহিনীর উত্তমপুরুষ, হুয়ান প্রেসিয়াদো—সেও কবেই ম'রে ভূত হ'য়ে গিয়েছে—এবং সে যাদের কাহিনীটা বলছে তারাও ভূত—অর্থাৎ আমরা যারা গল্পটা শুনছি আমরাও কবেই ম'রে গিয়েছি, নইলে এই ভুতুড়ে কাহিনী শুনছি কী ক'রে? যদি—অথবা—ম'রে ভূতই না হ'য়ে যেতাম, তাহ'লে মেহিকোর এই দশা, এই স্থাণু, স্থাবর, অপরিবর্তিত ধ্বংসস্তূপকে আমরা সহ্য করতাম কী ক'রে? সারা মেহিকোর এই বিভীষিকাকেই 'পেদ্রো পারামো' ফুটিয়ে তোলে তার অলংকার-বর্জিত তিক্ত নিরাভরণ শ্লেষেভরা ভাষায়।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন 'পেদ্রো পারামো' খুবই ছোটো উপন্যাস, কিন্তু প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সারা লাতিন আমেরিকায় এক ক্লাসিক ব'লে গণ্য করা হয়। গল্পের কাঠামো সন্ধানের, অন্বেষণের—সন্ধান শেকড়ের, আবার সন্ধান ভেনদেত্তারও; ছোটো-ছোটো টুকরো ঘটনার ভিড়, সময়ের গতি মোটেই রৈখিক নয়—না সরল, না-বা বক্র; বরং কাটাকুটি-করা, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, অথচ তাৎপর্যময়। আর তারই মধ্যে হুয়ান প্রেসিয়াদো—সে হয়তো নতুন-কোনো টেলিমেকাস, কোনো উলটপুরাণের চরিত্র—ফিরে এসেছে নিজের গ্রামে কোমালায়, তার বাবা পেদ্রো পারামোর খোঁজে।

...

আমি কোমালায় এসেছি, কেননা আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার বাবা, জনৈক পেদ্রো পারামো, ওখানেই থাকেন। আমার মা আমাকে এই কথা বলেছিলেন, আর আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম যে মা মারা গেলেই আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো। মায়ের হাত ধ'রে চাপ দিয়েছিলাম আমি, যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে আমি যাবোই। কিন্তু মা বসেছিলেন মারা যেতে, আর আমার মনের ভাব তখন এমন যে আমি তাঁকে যে-কোনো কথা দিতে পারতাম। 'ঠিক গিয়ে দেখা করিস কিন্তু,' মা বলেছিলেন, 'আমি জানি তোকে দেখলে উনি খুশি হবেন।' কাজেই আমি কেবল বারে-বারে এই কথাই বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে আমি যাবোই, যতক্ষণ-না শেষে তাঁর মরা আঙুলের মধ্য থেকে টেনে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম। তার আগে মা বলেছিলেন, 'ওঁর কাছে এমন-কিছু

চাইবি না যা আমাদের নয়। শুধু তা-ই চাইবি যা আমাকে ওঁর দেয়া উচিত ছিলো, কিন্তু দেননি। যেভাবে আমাদের উনি ভুলে গিয়েছেন, তার দাম উশুল ক'রে নিবি।'

'তা-ই হবে, মা।'

আমি কথা রাখতে চাইনি। কিন্তু তার পরেই মা আমাকে আরো কী-কী বলেছেন সব মনে প'ড়ে গেলো, শেষটায় ভাবনা আর থামাতে পারি না, এমনকী সে নিয়ে স্বপ্নও দেখতে শুরু ক'রে দিলাম—পেদ্রো পারামোকে ঘিরে আস্ত একটা জগৎই রচনা ক'রে বসলাম। সেইজন্যেই আমি কোমালা এসেছি।

কুকুর-পাগল-করা দিন সেটা, আগস্টের গরম হাওয়া সাপোনারিয়ার পচা গন্ধে বিষিয়েছিলো; রাস্তা গিয়েছিলো ঘুরে-ঘুরে, পেঁচিয়ে, কখনো ওপরে, কখনো নিচে। ওরা বলে রাস্তা চড়াই না উৎরাই তা বোঝা যায় যদি জানো তুমি ফিরে আসছো, না চ'লে যাচ্ছো। চ'লে যাবার সময় সেটা উৎরাই, ফেরার সময় চড়াই।

'দূরের ঐ গ্রামটার নাম কী?'

'কোমালা, সেনিওর।'

'ঠিক জানো ওটাই কোমালা?'

'হ্যাঁ, সেনিওর।'

'অমন মরা দেখাচ্ছে কেন?'

'ওদের ভারি দুঃসময় গেছে, সেনিওর।'

•••

ততক্ষণে যে শুধু দেরিই হ'য়ে গেছে তা-ই নয়, পেদ্রো পারামোর অন্য ছেলে যে তাকে খুন করেছে, তাও শুধু নয়, কাহিনী শুরুতেই ঢুকে পড়েছে অতীতের অনেকগুলো খাঁচায়। গোড়ায় আমরা সঠিক ধরতেও পারি না বিগত সময়ের ঠিক কোন খাঁচাটায় আমরা ঢুকছি, তবে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ব্যূহ ভেদ ক'রে আমরা অতীতে ঢুকছি বটে, তবে সেখান থেকে বেরুবার কোনো রাস্তা আমাদের জানা নেই।

হুয়ান রুলফো একসময়ে ভেবেছিলেন তাঁর আখ্যানের নাম দেবেন 'মর্মর ধ্বনি'। মৃতদের কণ্ঠস্বর, অস্ফুট আবছা ফিশফিশ, হাওয়ায় ভাসা, হাওয়ায় ঝুলে থাকা, যা সময়ের এক খাঁচা থেকে বেরিয়ে অন্য খাঁচায় গিয়ে হানা দিচ্ছে, তারই

দিকে প্রথম থেকেই ইঙ্গিত দেবেন। কিন্তু পরে যে 'পেদ্রো পারামো' নাম দিয়েছিলেন সেটা সূক্ষ্ম, অনির্ভর, বর্তমান সাহিত্যবোধেরই পরিচয় দেয়, কেননা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হুয়ান প্রেসিয়াদো নয়, তার বাবা: অ্যান্ত মানুষের চেয়েও বড়ো মাপের এক পরাক্রান্ত ফিউড্যাল প্রভু, যে চারপাশের সবাইকেই নির্বিকারভাবে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যায়, এমনকী যে-বিপ্লবের আয়োজন হয় তাকে উৎখাত করবার জন্যে তার মধ্য থেকেও সে আরো শক্তিশালী হ'য়ে বেরিয়ে আসে। তার নামটাই তাৎপর্যময়: পেদ্রো—সে এক অর্থে পিটার, খ্রীষ্টীয় চার্চের প্রতিষ্ঠাতা; সে পিতা; আবার পেদ্রো কথাটিরই ধ্বনিগত সাদৃশ্যে সে পিয়েদ্রাও, অর্থাৎ পাথর; আর পারামো—রুক্ষ, ঊষর, পোড়োজমি—অর্থাৎ যে-পিতা এই পোড়োজমির জন্ম দিয়েছে। অর্থাৎ পেদ্রো, পিটার, পেটার, প্রতিষ্ঠাতা, শিলাখণ্ড, অভিভাবক, পিতা, স্বর্গের চাবি যার হাতে—অথচ যে কিনা শেষ পর্যন্ত যা রচনা করেছে তা এক পোড়োজমি,—ভুতুড়ে, হানা-দেয়া, পরিত্যক্ত, বন্ধ্যা, নরকের সমান্তর। বিপ্লব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, স্বপ্ন দেখিয়েছিলো সার্থকতার, কিন্তু বিপ্লব তার কথা রাখেনি, মেহিকোকে পরিণত করেছে এইরকম এক আশ্বাসহীন ভবিষ্যৎবিহীন জন্মের-আশাহীন এক নিশ্চল, বদ্ধ, উদ্ধারবিহীন গোলকধাঁধায়। দেশ কিছুই পায়নি, সন্তানেরা অক্ষম, অশক্ত, মৃত। যে-কোনো সার্থক রচনাতেই সূচনাতেই উপস্থাপিত হয় প্রসঙ্গ, সমস্ত এষণা, মূল ধারণা। উপন্যাসের যে সূচনাটুকু আমরা উদ্ধৃত করেছি, সেই ছোট্ট টুকরোটি থেকেই বোঝা যাবে এই সরল, সবল, অনাড়ম্বর ভাষা কীভাবে আসলে মেহিকোর ট্রাজেডিকেই প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। প্রাপ্য যা ছিলো তা পায়নি, পেদ্রো পারামো (মাচো, মাচিস্মোর মূর্তিমান বিগ্রহ) কথা রাখেনি, পাত্তাই দেয়নি; প্রেসিয়াদো এখন চায় মুখোমুখি দেখা পেতে—জিগেশ করতে, দাবি জানাতে; কিন্তু কোমালা মৃত, পেদ্রো পারামোও নিহত। মেহিকোর বিপ্লব নিয়ে যত আখ্যায়িকা রচিত হয়েছে, হুয়ান রুলফোর এই কাহিনী সেখানে এক চমকপ্রদ সংযোজন। পরবর্তী-কালের অনেক লেখকই এই উপন্যাসের প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারেননি—ফুয়েন্তেস, গার্সিয়া মার্কেস বা ভার্গাস য়োসা, কেউই নয়।

প্রেসিয়াদো ফিরতে চেয়েছিলো প্রতিশ্রুত স্বর্গে, সেইজন্যেই সে মৃত—এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন মেহিকোর কবি ওক্তাভিয়ো পাস। তিনি বিশদ ক'রে জানান—আমরা কেবল মরবার পরেই ফিরতে পারি স্বর্গে, ইডেনে। কিন্তু প্রেসিয়াদো মরবার পরে ফিরে আসে কোন বাগানে? যে-বাগান জ্ব'লে-পুড়ে

১৯

ছারখার, সম্পূর্ণ ভস্মীভূত এক চণ্ড মরুভূমি। মরুভূমি—খরা, তৃষ্ণা, অপস্রিয়মাণ ছায়ামূর্তিদের শুষ্ক ফিশফিশ আর যোগাযোগের ব্যর্থতা। 'হুয়ান রুলফো'—গুস্তাভিয়ো পাস একবার বলেছিলেন—'মেহিকোর একমাত্র ঔপন্যাসিক, যিনি আমাদের একটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ চিত্রকল্প দিয়েছেন, নিছক বর্ণনা নয়—আমাদের চারপাশের কোনো ফোটোচিত্রের দলিল তিনি রচনা করেননি, অথবা কোনো ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবি। তিনি তাঁর অনুভূতি, স্বপ্ন আর ব্যক্তিগত আবেগকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন পাথরে, ধুলোয়, মরুভূমির বালির রাশিতে।'

'পেদ্রো পারামো' এতই চোখধাঁধানো, তার রচনাকৌশল এতই আধুনিক ও লক্ষ্যভেদী (কেননা পুরোনো আখ্যায়িকার সমস্ত প্রচলন এখানে লঙ্ঘন করেছেন হুয়ান রুলফো, আর হয়তো আলেহো কার্পেন্তিয়ের এবং মিগেল আনহেল আস্তুরিয়াসের সঙ্গে মিলে তৈরি ক'রে দিয়েছেন আশ্চর্য বাস্তবতার জগৎ) যে অনেক সময়েই তাঁর ছোটোগল্পগুলো পাঠকদের নজর এড়িয়ে যায়। অথচ কথাসাহিত্যিক হিশেবে সাফল্যের চূড়ান্ত কতগুলো শিখর তাঁর ছোটোগল্পেই জয় ক'রে যান রুলফো, যেখানে ছোট্ট একটি ঘটনা—কখনো কোনো ঘটনাই হয়তো নেই, শুধু আছে কোনো চরিত্রের অন্তর্জগৎ, অশান্ত অস্থির আবিষ্ট ও খিন্ন—আর তারই মারফৎ তিনি আবিষ্কার করেন তাৎপর্য, চূড়ান্ত মরীয়া হতাশার মুহূর্তে মানুষ কেমন ক'রে ভাঙে, ভেঙে প'ড়ে যায়।

জ ল ন্ত প্রা ন্ত রে র বৃ ত্তা ন্ত

আর 'জলন্ত প্রান্তর'ও তাই স্থাণু, যেখানে সময়ের জোড় খুলে গিয়েছে; ভোরবেলা সেখানে নতুন দিনের আশা জাগায় না—মৃত্যু হানে; মনে থাকে গরিবরা কেমন ক'রে জর্জর হ'য়ে থাকে দারিদ্র্যে, নিজেই বারা বেছে নেয় কোন গাছ থেকে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলবে। হুয়ান রুলফো বিশ্বাস করেন অবস্থা যদি-না আমরা ভালো ক'রে বুঝতে পারি, তাহ'লে তাকে বদলাবো কী ক'রে—আর এই বোঝার চেষ্টায়, অনুধাবনের উৎকাঙ্ক্ষায় তাঁর গল্পগুলো টান-টান হ'য়ে আছে। নিশ্চয়ই 'পেদ্রো পারামো'র সঙ্গে 'জলন্ত প্রান্তর'-এর গল্পগুলো পড়লে পাঠক নিজেই বুঝে নিতে পারবেন কেন লাতিন আমেরিকার এতজন লেখক তাঁকে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছেন, কেন মাত্র দুটি ছোটো বই লিখেই রুলফো আজ লাতিন আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য লেখকদের একজন। অবশ্য একটা পুনশ্চ আছে:

রুলফো তাঁর নিজের পটভূমিকে বোঝবার এবং বোঝাবার জন্যে ১৯৭৩-এ একটি বই লিখেছেন, 'আউতোবিয়োগ্রাফিয়া আর্মাদা,' যেখানে তিনি স্মৃতিচারণের ছলে খুলে বলেছেন কেন তাঁর হালিস্কোকে না-জানলে (না-বুঝতে পারলে) সারা মেহিকোর জ্বলন্ত সমস্যাগুলো বোঝা যাবে না। তবু আত্মজীবনীর এই হার্মাদরা যেহেতু কাহিনীর জগৎ সৃষ্টি করেনি, তাই এবার 'জ্বলন্ত প্রান্তর'-এর বৃত্তান্ততেই আবার একবার প্রবিষ্ট হওয়া যাক।

লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে অনেক তাকলাগানো কৃৎ-কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে; সত্যি-বলতে, আখ্যায়িকায় এত বিচিত্র ধরনের প্রকাশ লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যকে হয়তো সাম্প্রতিককালের সবচাইতে উত্তেজক সাহিত্যিক অভিজ্ঞতাতে পরিণত করেছে। হুয়ান রুলফোর এই একমাত্র ছোটোগল্পের সংগ্রহ 'জ্বলন্ত প্রান্তর' প্রথম পড়ার অভিজ্ঞতা প্রায় একটা রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের মতো। বাইরে থেকে দেখলে কোমালার (বা হালিস্কোর) এই ইণ্ডিয়ান সমাজকে মনে হয় আদিম, সময় যেখানে স্তম্ভিত ও অভিভূত হ'য়ে গিয়েছে, যেন স্থাণু নিশ্চল পরিবর্তনহীন এক অন্তহীন সময়, যার ভিতরে নিদারুণ ও অসহায় মর্মযন্ত্রণায় বেঁকে চুরে দুমড়ে যাচ্ছে মানুষ। সারাক্ষণ একটা থমথমে ছায়াচ্ছন্ন ভাব যার মধ্যে বোবা জন্তুর মতো পঙ্গু মানুষ হা ক'রে থাকে—সে জানেও না কী সে করতে পারতো, কী তার করণীয়। রক্তমাংসের অস্থির অস্ফুট কিন্তু প্রবল সব আন্দোলন, তার মধ্যে নিঃসঙ্গতা আর মৃত্যু এমনভাবে ওৎ পেতে আছে যেন তাকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায়। রুলফো আস্তরের পর আস্তর খুলে ফেলে মানুষের একেবারে ভেতরটাকে দেখিয়ে দিয়ে যান, কিন্তু মানুষের ভেতরটাও ল্যাণ্ডস্কেপের মতোই ছায়াচ্ছন্ন, ঝাপশা, মেঘাবৃত আর মৌন। কখনো তাদের পুরো মুখটা যেন চোখে পড়ে না, সবসময়েই পাশ থেকে বা কোণ থেকে আমরা তাদের দেখি—এমনকী যখন তাদের নিঃশব্দ মনের মধ্যে আমরা আটকা প'ড়ে গেছি, তখনও যেন পুরোপুরি অধিগম্য নয় তারা—যেমন দেখতে পাই "আমরা ভারি গরিব" গল্পে। শুধু যেটা স্পষ্ট, স্পর্শসহ, নিস্তারহীন, সে এক ধ্বংসের তাড়না—অনিবার্যভাবেই মৃত্যুর দিকে একটা চোরাটান বন্দী ক'রে রেখেছে তাদের, আর সেই চোরা আবর্ত থেকে উদ্ধারের উপায় কারুই ঠিক জানা নেই।

একটা অসাধারণ, আশ্চর্য, নৈপুণ্য আছে রুলফোর—বিমর্ষ ল্যাণ্ডস্কেপ ফুটে ওঠে দু-একটি সূক্ষ্ম আঁচড়ে, বন্যায় সে ভেসেই যাক, দূর-দূর পাহাড় পথই হোক, কিংবা খরায় ফাটা মাটিই হোক। যে-রূঢ় অনতিক্রম্য জগতে তার চরিত্ররা

বাস করে সেই নির্দয় জগতে কিছুই নড়ে না যেন, এমনকী গৃহিনীও না—যেমন দেখা যাবে "ওরা আমাদের জমি দিয়েছে" গল্পে। এই অভিভূত মাটিতে জীবন যেন থেমে গিয়েছে একেবারে, আর এই দমবন্ধ থেমে-থাকার ভাবটাই সবচেয়ে মারাত্মক। মস্ত-সব বড়ো-বড়ো সামাজিক ব্যাধিকে খুলে দেখান তিনি, নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে, শুধু ব্যক্তির আভ্যন্তর নাটকের উন্মোচন ঘটে পরতে-পরতে, আমরা দেখতে পাই কী হয়েছে, কী হ'তে চলেছে—পরিণাম জেনেও তাকে আটকাবার ক্ষমতা চরিত্রদের কারু নেই। লক্ষণগুলো প্রায় সব গল্পেই দেখা যাবে, অথচ গল্পগুলো প্রত্যেকটি—ভিন্ন-ভিন্ন কৌশলে রচিত। অতীত আর বর্তমান অবিন্যস্ত মিশে যায় পরস্পরের মধ্যে, আঁৎকে দেয় হঠাৎ-কোনো অনুষঙ্গের আবির্ভাব বা বিন্যাস, এমনকী বক্তার তোড়েও, রাস্তার চলাতেই, স্থাণু ক'রে দেয় ঘটনাস্রোত, সময়কে আটকে রাখে বর্তমানের চোরা আবর্তে।

একটা কৌশল স্বভাবতই স্বগতোক্তি, অনর্গল আভ্যন্তর কথা—স্মৃতি, অনুষঙ্গ, ভয়—এইসব দিয়ে জড়াজড়ি ক'রে কিমাকার একটা জট পাকিয়ে যায় তারা। যেখানে সংলাপ আছে, যেমন "কোনো কুকুর ডাকে না" গল্পে সেখানেও তা এক অর্থে কারু একা কথা বলা, নিজের সঙ্গে, মুমূর্ষু ছেলের সঙ্গে—অথবা অভিভূত ল্যাণ্ডস্কেপের সঙ্গে। রুলফো জানেন কত কম কথা দিয়ে কত বেশি কাজ করিয়ে নেয়া যায়। কিসের একটা তাড়া, একটা থমথমে ভাব, একটা ছন্দে রাতের জগৎ ছমছমে ক'রে রাখে, যখন বাবা আর ছেলের ছোট্ট কথা বলাবলিতে রহস্য, ধ্বংসের টান, এক অশুভ অমঙ্গলের পূর্বাভাস, আর দ্বিধা দোলাচল অনিশ্চয়তা কেমন বদ্ধ ডোবার মধ্যে আলোড়ন হ'লে যেমন গাঁজলা ওঠে সেইভাবে বিষাক্ত বুড়বুড়ি তুলে যাচ্ছে। নাটকীয়তায় টান-টান হ'য়ে থাকে সব, বিশেষ ক'রে সংলাপের ছোট্ট ছটফটে অস্থির দীর্ণ কথাগুলোয়, আর আখ্যায়িকার প্রধান ঘটনাই হ'য়ে ওঠে বাবার মুখের অসহায় অনর্গল কথা আর ছেলের 'মুখর' স্তব্ধতা। অনেক গল্পেই যেমন করেন রুলফো, মাত্র কয়েকটি পাতায় রচনা ক'রে যান প্রখর নাটক, তীব্র অন্তরঙ্গ রিক্ত ভাষায়, রং গাঢ় ঘন, উচ্চারণ গলাভাঙা ফ্যাশফেশে, অথচ বাইরে থেকে কোনো চেষ্টাই নেই চরিত্রদের দেখাবার, কোনো বর্ণনাই নেই। দপদপ করছে জীবন, জীবনের হুড়মুড় বেগ, অথচ অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে রুলফো ফুটিয়ে তুলেছেন স্থাণু দশা—যেন সব থেমে গিয়েছে, বুড়ো বাবার কাঁধে যে-মুহূর্তে তুলে বেঁধে দেয়া হয়েছে তার জখম, জোয়ান ছেলেকে।

সব গল্পের বুনোট এক নয়, অবশ্যই। কোনোটায় কালাহুক্রমিকতার আপাতসহজ ভঙ্গিমা বজায় আছে, কোথাও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির তুলকালাম সংঘর্ষ আর কোথাও সময়কে ফেটিয়ে উলটোপালটা ক'রে দেয়া, কোথাও তাল-গোলপাকানো জটপাকানো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, বিভিন্ন কথকের কথা—যেমন "লোকটা" গল্পে। অতীতের ঝিলিক, আভ্যন্তর স্বগতোক্তি আর সূক্ষ্ম থমথমে অস্ফুট সংলাপ, আর কচিৎ কখনো নিস্পৃহ নিরাসক্ত মন্তব্য—সব মিলে এমন-একটা ধারণা তৈরি ক'রে দেয় যে সব যেন একসঙ্গেই ঘটছে। সময় দোল খায়, ভির্মি খায় অতীত আব বর্তমানে, চবিত্রের তিক্ত, পরিত্রাণহীন, স্মৃতিতে, আর সজীব ও চাক্ষুষ ফুটে ওঠে অন্তহীন প্রায়শ্চিত্তেব মুহূর্ত। তাঁর সংলাপ ও স্বগতোক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা প্রতারক : বোঝাই যায় না কী কঠোর শ্রমে ঘ'ষে-ঘ'ষে অতিরিক্ত বোঝা ফেলে দিতে-দিতে এই উনকথনেব ভাষা তিনি আয়ত্ত কবেছেন। কোনো অলংকার নেই এমন-এক আপাতরিক্ত ভাষা, কাঁটা-ছেঁড়া-করা ছোট্ট বাক্য, ভয়ানক বাস্তব হ'য়ে উঠতে তার গা কাঁপে না, অথচ কবিত্বে তা বিদ্যুৎগর্ভ। তাঁব চিত্রকল্প স্থানিক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর : মাটি, পাথর, ধুলো, হাওয়া, চাদ—এবং জল, যখন বন্যা। কিন্তু চিত্রকল্প কখনো গায়ের জোরে আখ্যায়িকায় ঢুকে পড়ে না- সে হ'য়ে ওঠে ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনার অংশ, অথবা গল্পেরই একটি অঙ্গাঙ্গী অংশ হ'য়ে ওঠে। "আমরা ভারি গরিব" গল্পে কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প বানভাসি নদীর, যার ফুলে-ওঠা তীব্র জল নিয়ে এসেছে সর্বনাশ ও বিভীষিকা। সারা গল্পের মধ্যেই এই বন্যায় ফুলে-ওঠা নদীর খর-স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, রুলফো যেন আমাদের অনুভব করিয়ে দেন তার পাক-খাওয়া নোংরা জলকে, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই সে পেঁচিয়ে ছুটে যায়। আমরা তার ঢেউয়ের আওয়াজ শুনি, জল একটু স'রে যেতেই নাক টের পায় কী বিষম বোঁটকা পচা গন্ধ সে রেখে গেছে, আমরা দেখে শিউরে উঠি তাচার গালেব নোংরা চোখের জল, 'যেন নদীটাই তার ভেতরে ঢুকে গিয়েছে'। ঠাণ্ডা, মাপা, নিরাভবণ গদ্যে রুলফো যে জগৎ ফুটিয়ে তোলেন, অক্ষমতা হতাশা অবিশ্বাস ও গ্লানির এক দুর্বিষহ জগৎ, যেখানে গা ফোলানো হাওয়ায় মৃত্যু গরজায়, প্রান্তরের দমবন্ধ-করা ধুলোয় অথবা নদীর নোংরা পচা ঘোলা জলে সর্বনাশ পাক খেতে থাকে, যার মধ্যে ফুটে ওঠে অসহায় ইণ্ডিয়ানদের অদৃষ্টবাদ, আর ল্যাণ্ডস্কেপ ও মানুষ দুয়ে মিলে তৈরি ক'রে দেয় এক দুঃসহ সংলগ্নতা, এক মিথোজীবিতা, আর জলন্ত প্রান্তর কেবলই তেতে ওঠে, পুড়ে যেতে থাকে।